প্রতিচিন্তা

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬
পরিবেশক : প্রথমা প্রকাশন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

প্রতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

দ্বাদশ বর্ষ ● প্রথম সংখ্যা ● ঢাকা ● এপ্রিল-জুন ২০২২

প্রতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

এপ্রিল-জুন

সম্পাদক
মতিউর রহমান, সম্পাদক, *প্রথম আলো*

নির্বাহী সম্পাদক
ফারুক ওয়াসিফ

উপদেষ্টা পর্ষদ
নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা পর্ষদ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
আলী রীয়াজ, অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, *প্রথম আলো*

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

দাম : ১০০ টাকা
ISSN 2310-2403
ওয়েবসাইট : www.prothom-alo.com/protichinta, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
April-June Issue, 2022; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 100 Taka
Prothom Alo Bhaban, 19 Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81, 09613113366

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

সামাজিক অর্থনীতি

'বিপজ্জনক' শ্রেণি প্রিকারিয়েত : অনিশ্চয়তার মধ্যে কায়দা করে বেঁচে থাকা জীবন ৯
হেলাল মহিউদ্দীন

বিশ্বরাজনীতি

গণতন্ত্রের হেলে পড়া : পুনর্জাগরণ থেকে বিপন্নতায় ২৫
ল্যারি ডায়মন্ড

ইতিহাস

ভারতবর্ষের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মন ৪৩
জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক

বাংলাদেশে বৈশ্বিক ষাটের দশক : সেনা-এলিট প্রহরা ও নিম্নবর্গের প্রতিরোধ ৭১
শুভ বসু

ভাষা ও সংস্কৃতি

'পলিটিক্যাল পার্টিস ইন ইন্ডিয়া' এবং ভাষায় বিভাজিত সংস্কৃতি ৮১
ইফতেখারুল ইসলাম

মুক্তিযুদ্ধ

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে নদীর প্রতিশোধ ৯১
মোহাম্মদ এজাজ

'বাংলাদেশের প্রকৃতিই মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসী ও জোটবদ্ধ করে' ১০৫
সাক্ষাৎকার : আইনুন নিশাত

শিল্প-দর্শন

ঈশ্বর দর্শন : ভাষার গর্ভগৃহ থেকে পরমতার দিকে ১১৫
সাজ্জাদ শরিফ

বই আলোচনা

যুদ্ধ সংবাদদাতার চোখে একাত্তরের ভিতর-বাহির ১৩৩
সোহরাব হাসান

মাহমুদ মামদানির 'চিরস্থায়ী সংখ্যালঘু' ও জাতিরাষ্ট্রের অভিশাপ ১৪৩
ড. মো. আদনান আরিফ সালিম

লেখক পরিচিতি ১৫৩

তিনটি সংখ্যার বিরতির পর ফিরে এল ত্রৈমাসিক *প্রতিচিন্তা*। অবশ্যই নবায়িত ও নিয়মিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। পত্রিকাটি ১২ বছরে পা দিয়েছে। আর সবকিছুর মতো ভাবনাচিন্তারও ইতিহাস থাকে, সীমা-সরহদ্দ থাকে। *প্রতিচিন্তা* তার আওতায় সেই ইতিহাস, ভূগোল ও সীমাকে বুঝতে ও জানাতে চেয়েছে। এসবই উদ্দেশ্য। আর লক্ষ্য? তা তো এই দুরন্ত, জটিল আর পরিবর্তনশীল বর্তমান। কখনো লেখার গুণমানে, কখনো পরিমাণে সেই বর্তমানকে এই পত্রিকা ধরতে চেষ্টা করেছে। এ সময়ের গায়ে মহামারি, যুদ্ধ, অসন্তোষের ক্ষত। দেশে দেশে একরোখা শাসন, বাড়ছে বৈষম্য, বাড়ছে জাতি-সম্প্রদায়-শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মধ্যে দূরত্ব। দূরত্ব বাড়াচ্ছে বিরোধ ও সংঘাত। পালাবদলের নাটকীয়তাও এখন অনেক বেশি।

এসবের ভেতর নতুন এক অর্থনৈতিক শ্রেণি সরবে হাজির। এঁদের বলা হচ্ছে 'প্রিক্যারিয়েত'। প্রথম শিল্পবিপ্লব তৈরি করেছিল প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারা শ্রেণি। বাজারভিত্তিক বিশ্বায়ন যখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের মুখে, তখন সংখ্যায় ও বঞ্চনায় 'প্রিক্যারিয়েত'ই বেশি। বাংলায় একে বলা যায়, শহুরে শিক্ষিত নাজুক দশার নিম্নবর্গ। কখনো বেকার, কখনো কল সেন্টার, তথ্যপ্রযুক্তি, গণমাধ্যম ও সেবা খাতে এঁদেরই পদচারণ। মার্কিন অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট ও 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলনে, মিসরের তাহরির বা লেবাননের তাকসিম চত্বরে অথবা বাংলাদেশের চাকরির কোটা সংস্কার আন্দোলনের মূল চরিত্রও এঁরা। ক্ষমতাশালীদের চোখে এঁরা 'বিপজ্জনক শ্রেণি'। অস্থির 'প্রিক্যারিয়েত' নিয়ে আগে ছোট আকারে আলোচনা হয়েছে। অধ্যাপক হেলাল মহিউদ্দীন এখানে বড় পরিসরে তাঁদের রূপরেখা এঁকেছেন।

সামাজিক অস্থিরতার অপর পিঠে চলছে গণতন্ত্রের রুদ্ধশ্বাস দশা। মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ফুকোয়ামা বলেছিলেন, সমাজতন্ত্রের ধসের মধ্য দিয়ে 'ইতিহাসের মৃত্যু' হয়েছে, উদারতাবাদী গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদই ইতিহাসের শেষ কথা। কিন্তু সেই পূর্বাভাস

সত্য হয়নি। দেশে দেশে একনায়কের ভাবমূর্তির ছায়াতলে কর্তৃত্ববাদী শাসন কায়েম হচ্ছে। জাতি, সম্প্রদায় ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়িয়ে অসংখ্য মানুষকে তাঁরা মাতিয়ে রাখছেন। যুক্তরাষ্ট্রের *জার্নাল অব ডেমোক্রেসির* দীর্ঘদিনের সম্পাদক ল্যারি ডায়ামন্ড গণতন্ত্রের এই দীর্ঘ যাত্রার চড়াই-উতরাই থেকে আগামীর আভাস দিয়েছেন। প্রবন্ধটিকে রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের পটভূমিতেও পড়া যেতে পারে।

এই সংখ্যার বিশেষ উপহার ঢাকার বিদ্বানমহলের কিংবদন্তি জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের (১৯১৪-১৯৯৯) *মাইন্ড অব দি এডুকেটেড মিডলক্লাস ইন ইন্ডিয়া* প্রবন্ধের অনুবাদ। ১৯৫০ দশকের শুরুতে নামজাদা ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড লাস্কির (১৯১৪-১৯৯৯) তদারকিতে রচিত তাঁর অসমাপ্ত পিএইচডি সন্দর্ভের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এটি। হালে ঢাকার ইউপিএল প্রকাশনা সংস্থা রাজ্জাকের সেই অগোচরে থাকা বইটি *পলিটিক্যাল পার্টিস ইন ইন্ডিয়া* নামে প্রকাশ করেছে। সে সুবাদেই 'ভারতীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মন' প্রবন্ধটি অনুবাদের সুযোগ পাওয়া গেল। এই লগ্নে আমরা বইটির সম্পাদক আহরার আহমদ এবং ইউপিএল-এর কর্ণধার মাহরুখ মহিউদ্দীনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আব্দুর রাজ্জাকের বইটি যদি গত শতকের ষাটের দশকেও প্রকাশিত হতো, বিনা সন্দেহে বলা যায়, উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোচনা আরও পরিণতই হতো। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে শুধু না, পাশ্চাত্যের বিদ্যাজগতেও ব্রিটিশ-ভারতের উনিশ শতক দারুণভাবে আলোচিত বিষয়। জাতীয় অধ্যাপক রাজ্জাকের রচনাটি এই ধারার এক উজ্জ্বল উদ্ভাসনই বটে। ভারতবর্ষের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন কী করে ধর্মীয় পুনর্জাগরণ ঘটিয়ে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাতে গড়া অখণ্ডতাকে ভেঙে ফেলল, কেন রাজনৈতিক আধুনিকতা ও সেক্যুলার শিক্ষা শেষ পর্যন্ত গোষ্ঠীবাদী আত্মপরিচয়ের খাতে ঢলে পড়ল, হিন্দু-মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অবিবেচক চিন্তাধারা কীভাবে শতকোটি মানুষের জীবনে বিপর্যয়ের বীজ বুনে দিল; আব্দুর রাজ্জাক গভীর অভিনিবেশে তা খুলে দেখিয়েছেন এ প্রবন্ধে। পাঠক লেখাটি পড়ার সময় যদি নিজেকে গত শতকের ষাটের দশকে বসাতে পারেন, বুঝতে পারবেন সময়মতো প্রকাশিত হলে বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে এটা কতটা প্রভাবশালী অবদান রাখতে পারত।

উপমহাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ভাষা হয়ে ছিল সম্প্রদায়গত রাজনৈতিক হাতিয়ার। আমাদের কালেও সাহিত্য ও ভাষাচর্চার খাত বিভাজিত হয়ে পড়ছে। তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন সাংস্কৃতিক ঘরানা। জাতিগত ও ধর্মগত সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদও ফেনিয়ে উঠতে দেখা যায়। ঐতিহাসিক একচোখা চিন্তার সমাধান কি পাল্টা একরোখামি দিয়ে করা সম্ভব? আব্দুর রাজ্জাকের চিন্তা ধরে এই প্রশ্ন রেখেছেন ইফতেখারুল ইসলাম।

কবির গদ্যরসের স্বাদ আলাদা হয়। আর তা যদি হয় শিল্পদর্শনের আলোচনা, তাতে এসে পড়ে চিন্তার ঋজুতা ও গভীরতা। কবি ও সাংবাদিক সাজ্জাদ শরিফের 'ঈশ্বর

দর্শন : ভাষার গর্ভগৃহ থেকে পরমতার দিকে' প্রবন্ধটির আস্বাদন সে রকমই। দেখা, বলা, আঁকা, লেখাসহ যত রকম মানুষি প্রকাশ আছে, সেসবে আসলে কী ঘটে, কীভাবে ঘটে, তা কেবল নন্দনতত্ত্বের আলোচনা না, দর্শনেরও বিষয়। কী সম্পর্ক শিল্পের সঙ্গে মানুষের? বা জানা ভাষার বাইরেও অজানার ইশারা কী রূপ ধরে প্রকাশিত হয় সাহিত্য, চিত্রকলা ও চলচ্চিত্রের ভাষায়? সাজ্জাদ শরিফের লেখাটিতে অধরাকে ভাষায় ধরার সেই সাধনা লক্ষ করা যায়।

চলতি সংখ্যায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসচর্চায় কম আলোচিত দুটি দিকে নজর ফেলা গেল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইকোলজি অর্থাৎ নদী ও জলাভূমিময় বাস্তুসংস্থান মুক্তিসেনাদের সমরকৌশলে কতটা ভূমিকা নিয়েছিল, তা কমই খুঁজে দেখা হয়েছে। যাকে বলে নদীর প্রতিশোধ, তা-ই দেখা গেছে একাত্তরের ৯ মাসে। ইতিহাসচর্চার এই লাকুনা বা বেখেয়ালের দাম চুকানোর প্রয়াস এই সংখ্যার মোহাম্মদ এজাজের প্রবন্ধ ও নদী বিশেষজ্ঞ আইনুন নিশাতের সাক্ষাৎকার। অন্য দিকটি হলো, বাঙালিদের প্রতিরোধ আন্দোলনের শীর্ষে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানকে সে সময়ে দুনিয়াজুড়ে চলা তারুণ্যের বিদ্রোহের আলোকে দেখা। আগ্রাসী সামরিক-এলিট পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গীয় (প্রিক্যারিয়াস) তরুণদের ক্রোধ ও আবেগের গতিসূত্র ধরার চেষ্টা করেছেন ইতিহাসবিদ শুভ বসু। ডেভিড লুডেনের *ফরগটেন হিরোস* বা বিস্মৃত বীরেরা নামের রচনার পরের আকর্ষণীয় লেখা হিসেবে দেখা যায় এ লেখাটিকে।

ভারতীয় সাংবাদিক মানস ঘোষ মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সংবাদদাতা ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব, ভারতীয় রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব এবং মুক্তিযুদ্ধের ভেতরকার যোদ্ধা ও জনগণের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। মানস ঘোষের সদ্য প্রকাশিত *রিপোর্ট ফ্রম গ্রাউন্ড জিরো* বইটির পর্যালোচনায় এর বিশিষ্টতা তুলে এনেছেন কবি ও সাংবাদিক সোহরাব হাসান।

শুধু ভারতবর্ষ নয়, উপনিবেশবাদের বৈশ্বিক অভিযানেও জনসমাজকে ভাগ করা ও শাসন করার বিস্তর নজির রয়েছে। উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিক এডওয়ার্ড সাঈদের পরে উপনিবেশবাদের কলাকৌশলের নতুন খতিয়ান দিচ্ছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত উগান্ডার তাত্ত্বিক মাহমুদ মামদানি। মামদানি দেখাচ্ছেন, 'ভাগ করো, শাসন করো' নীতির আগে এসেছিল 'নাম দাও, শাসন করো' নীতি। ইউরোপীয় জাতিরাষ্ট্র গড়নের সময়ই এক জাতি, এক ধর্ম, এক রাষ্ট্র মডেল হাজির হয়েছিল। জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে বৃহৎ 'স্বজাতি' তৈরি করে বাকিদের বিজাতীয়-বিধর্মীয় ইত্যাদি বলে দাগিয়ে দেওয়া হলো। তাতে দুর্বলেরা চিহ্নিত হলো 'স্থায়ী সংখ্যালঘু' হিসেবে। মামদানির সর্বশেষ গ্রন্থ *নাইদার সেটলার নর নেটিভ : দ্য মেকিং অ্যান্ড আনমেকিং অব পারমান্যান্ট মাইনোরিটিজ* বইটির ময়নাতদন্ত চালিয়েছেন মো. আদনান আরিফ সালিম ।

সামাজিক অর্থনীতি

‘বিপজ্জনক’ শ্রেণি প্রিকারিয়েত : অনিশ্চয়তার মধ্যে কায়দা করে বেঁচে থাকা জীবন

হেলাল মহিউদ্দীন

সারকথা

প্রিকারিয়েত কারা? সাধারণ যুবজনতা। শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদে শ্রমিক ও পেশাজীবীর জীবনে শোষণ থাকলেও নির্দিষ্ট পেশায় নির্দিষ্ট স্থানে বাঁধাধরা জীবনের নিশ্চয়তা ছিল। ভবিষ্যতের রূপরেখা ছিল। এদের বলা হতো প্রলেতারিয়েত। রূপান্তরিত পুঁজিবাদের বাজার অর্থনীতিতে বিপুলসংখ্যক মানুষের কাজ-বসবাস ও জীবনধারা আর নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আটকে নেই, নেই চাকরি ও কাজের স্থায়িত্ব। আশা-নিরাশার দোলাচল এদের নিত্যসঙ্গী। অস্থিতিশীলতার জীবনে গতির চাইতে দুর্গতি বেশি। যখন সমাজে হতাশা, অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা, রাজনীতিতে অমানবিকতা, তখন ভবিষ্যতের ভরসাও নাগালের বাইরে। ইতালিতে পরিচিতি দুস্থজনের সাধু প্রিকারিয়েতের নামে সমাজবিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন প্রিকারিয়েত। এরা বিপন্ন আবার বিপজ্জনকও। নতুন পাওয়া শিক্ষা ও ফেসবুক-টুইটার-হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে এরা দ্রুত জমায়েত হওয়া শিখছে। অস্থায়ী চাকরি, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তাদের মধ্যে যে ক্রোধ তৈরি করে, বৈরী সরকারের বিরুদ্ধে সেটাই তারা উগরে দেয়। এরাই অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন করে, তাহরির থেকে তাকসিম স্কয়ারে ঘটায় গণবিদ্রোহ। কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী একে বলছেন বিপজ্জনক শ্রেণি।

ভূমিকা

কার্ল মার্ক্সের ‘প্রলেতারিয়েত’ ধারণাটির সঙ্গে আমরা কমবেশি পরিচিত। শিল্পসমাজে ‘প্রলেতারিয়েত’ হলো বিত্তহীন বা স্বল্পবিত্ত শ্রম বিক্রেতা শ্রেণি। শিল্পসমাজে কারখানাকে কর্মস্থল ধরে যে বঞ্চিত ও শোষিত শ্রেণিকে মার্ক্স ‘সর্বহারা’ নাম দেন, তারা বস্তুগত অর্থে ততটা সর্বহারা নয়। উৎপাদনযন্ত্রের

মালিকানায় কোনো শরিকানা নেই বলে ন্যায্য পাওনাটুকু চাইতে না পারার অক্ষমতাই মূলত সর্বহারার লক্ষণ। মজুরির নিয়ন্তা মজুরিদাতা মালিক; তিনিই ঠিক করেন মজুরির পরিমাণ। মজুরিকে সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্কের অপরিহার্য অংশ গণ্য না করে নিছক বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত করতে পারার ক্ষমতাই পুঁজিবাদের মূল শক্তি।[১]

প্রলেতারিয়েত ব্যাখ্যার এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে প্রিকারিয়েতাইজেশন বা প্রিকারিয়েতকরণ ভালো বোঝা যায়। বাজার অর্থনীতিতে এ রকম 'প্রিকারিয়াস' বা চূড়ান্ত অনিশ্চিত শ্রম বিক্রেতা গোষ্ঠীই আসল সর্বহারা বা মুলামুলির ক্ষমতাহীন শ্রেণি। ইংরেজিতে যাকে বলে 'বার্গেনিং পাওয়ার', তা থেকে এই শ্রেণি বঞ্চিত বিধায় তারা অবদমিত ও শোষিত। এই অবস্থা বোঝাতেই 'প্রিকারিয়েত' বা 'প্রিকারিয়াস প্রলেতারিয়েত' ধারণাটির উদ্ভব।[২]

ইংরেজি 'প্রিকারিয়াস' শব্দের জুতসই বাংলা প্রতিশব্দ নেই। ভেঙে বললে 'অনিশ্চিত', 'অনির্ভরযোগ্য', অনিয়ন্ত্রণযোগ্য, অনিয়মশীল, অপরিণতিশীল, অপরিকল্পনাযোগ্য, এবড়োখেবড়ো, এলোপাতাড়ি, এলোমেলো ইত্যাদি ভাবের মিশেল বলা যেতে পারে। মূলত জীবিকাদায়ী খাটুনির প্রেক্ষিতেই শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। ইংরেজিতে 'প্রিকারিয়াস জব', 'প্রিকারিয়াস ওয়ার্ক অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট' শব্দগুচ্ছের ব্যবহার তো নিয়মিতই নজরে আসে। ভারত ও বাংলাদেশের বড় শহরগুলোতে সকালবেলা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে ঝাঁকা, কোদালসহ একদল মানুষ দিনচুক্তিতে ঠিকা কাজ পাওয়ার জন্য জড়ো হন। শ্রম ছাড়া তাঁদের আর কিছুই বিক্রয়যোগ্য নয়। কাজ পেলে কোনোভাবে কষ্টেসৃষ্টে বেঁচেবর্তে থাকা। না পেলে উপোস করা। কাজ পেলেও দিনের মাঝপথে 'কাজ ভালো হচ্ছে না' অজুহাতে ঠিকাদারকর্তা কাজ থেকে সরিয়ে দিতে পারেন।[৩] এ রকম পরিযায়ী দিনমজুরদের সচরাচর কোনো সংগঠন বা সমিতি হয় না। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কোনো রাজনৈতিক দল তাদের হয়ে কথা বলতে এগিয়ে এলেও ব্যর্থতাই হয়ে ওঠে পরিণতি। কারণ, তাঁরা হরদম অভিবাসনমুখী। কাজের খোঁজে ছুটতে থাকেন এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায়। অস্থায়ী বসবাস আর অস্থায়ী কর্মস্থানের জন্য তাঁদের সমবায় সংগঠন কার্যকর থাকে না। তাঁদের সময়ই-বা কোথায় অধিকারের জন্য সংঘবদ্ধ হওয়ার! যখন যেখানে দুকড়ি দুমুঠি যা-ই জোটানো সম্ভব, সেখানেই তাঁদের ধ্যান-জ্ঞান-অভিনিবেশ।[৪] পরিযায়ী শ্রমিকদের বাস্তবতা আমলে নিলে 'প্রিকারিয়েত' ধারণাটি পরিষ্কার হতে পারে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 'প্রিকারিয়েত' কিংবা 'প্রিকারিয়েতাইজেশন' ধারণাটি এখনো খুব একটা পরিচিত নয়। এ বিষয়ে আমাদের দেশে সংবাদপত্রের কলাম ছাড়া[৫] বিশেষ কোনো গবেষণার সন্ধান মেলেনি। গবেষণা কিছু হয়েছে মূলত পশ্চিমে। তাই আগে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট থেকে জানাশোনা ও উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। তারপর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তুলনামূলক আলোচনা করার দরকার হবে।

প্রিকারিয়েত ও প্রিকারিয়েতাইজেশন

গত ২০০ বছরে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক দ্রুত বদলেছে। সবচেয়ে বেশি বদলেছে গত পাঁচ দশকে। তথ্যপ্রযুক্তি, মুক্তবাজার অর্থনীতি, পণ্য ও সেবার বিশ্বময় অবাধ চলাচল এবং বাজারজাতকরণের পুঁজিবাদী আয়োজন সত্তরের দশক থেকে দ্রুত বলীয়ান হয়েছে। বর্তমান সময়ের বাণিজ্যের ধরন ষাটের দশকের চেয়ে একেবারে আলাদা। শিল্পোৎপাদনের জন্য ভূমি-শ্রম-মূলধন-সংগঠনের ধ্রুপদি নিয়ম আর মানার প্রয়োজন নেই। সহজ উদাহরণ নাইকি, টমি হিলফিগার, র‍্যাংলার, অ্যাডিডাস ইত্যাদি বহুজাতিকের মূল যে দেশ; সেখানে কোনো কারখানার প্রয়োজন নেই। একটি বা কয়েকটি ঘর নিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কয়েকটি কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ এবং কয়েকজন বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ থাকলেই চলে। এ হেন কোম্পানির জন্য পোশাক, জুতা বা অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদন করে দেবে অন্যান্য দেশ। যেমন বাংলাদেশ, ভারত, চীন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, মেক্সিকো, ব্রাজিল, হন্ডুরাস, হাইতি, নাইজেরিয়া ইত্যাদি। সোজা কথা, একসময়ের তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষুধা কাজে লাগানো সহজ। তাদের দিয়েই, তাদের ভূমি-শ্রম-সংগঠন ব্যবহার করেই আকাশছোঁয়া মুনাফা কামানো সম্ভব। শুধু পুঁজি ও আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা থাকলেই চলে। এই পদ্ধতির ইংরেজি নাম 'আউটসোর্সিং'। মূল কথা, অন্যদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার অর্থনীতি। বলা হয় প্রিকারিয়েতরা শহরকেন্দ্রিক; কিন্তু এখন গ্রামগঞ্জেও প্রিকারিয়াতের দেখা মিলছে।

প্রিকারিয়েত কারা? শিল্পসমাজ বা পুঁজিবাদী সমাজে ভূমি, শ্রম ও পুঁজি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে। সেখানে আমরা পুঁজি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা—এই চারটি দিক দেখি। পাশাপাশি দেখি একটা 'ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ' ও 'ফরওয়ার্ড লিংকেজ'। ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজের দিকে থাকে অনেক

কিছু। যেমন একটা জুতা তৈরির ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ অনেক বড়। যাঁরা গরু পালছেন, গরু বা ছাগল যাঁরা বাজারে নিয়ে যাচ্ছেন, ফড়িয়া, যাঁরা লবণ দিয়ে চামড়াটা প্রক্রিয়াজাত করছেন, ট্যানারিতে আবার যাঁরা প্রক্রিয়াজাত করছেন, তারপর সেটা যাচ্ছে ফ্যাক্টরিতে। এসবই ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজের মধ্যে পড়ে। ফ্যাক্টরিতে পণ্যটা তৈরি হওয়ার পর সেখানেও বিশাল একটা শ্রমিকসারি আছে। পণ্যের প্যাকেজিং, কাভার্ড ভ্যানে করে পণ্য সরবরাহ—এসবে অনেক লোক কাজ করছেন। এই পুরো প্রক্রিয়া একটা সামাজিক যোগাযোগ, একে শুধু অর্থনৈতিক যোগাযোগ হিসেবে ধরলে বিরাট ভুল-বোঝাবুঝি হবে। এই প্রক্রিয়া যখন কোনো শিল্পকারখানার মধ্য দিয়ে যায়, তখন সেখানে অনেক মানুষ জড়িত থাকেন। তাঁদের চাকরি থাকতে পারে, তাঁরা বেতন পেতে পারেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক বড় কোম্পানিগুলো আমাদের মতো দেশ থেকে আউটসোর্সিং করছে কেন? যাতে ভূমি বন্দোবস্ত, শ্রম ভাড়া করা ও পুঁজির নিরাপত্তা-ঝুঁকিটা তাদের নিতে না হয়। তারা এই ঝুঁকি থেকে রেয়াত পাচ্ছে আবার প্রচুর মুনাফাও অর্জন করছে।

সাধারণ ধারণা হলো, প্রিকারিয়েতদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুঁজি না থাকা (অর্থকড়ির টানাটানি ছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদীক্ষাহীনতা, যোগাযোগের সক্ষমতা না থাকা, বৃহত্তর বহির্বিশ্ব সম্পর্কে ধারণা না থাকা, সম্পর্কের গণ্ডি সীমিত থাকা) তাদের প্রিকারিয়েত হতে বাধ্য করে। তবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুঁজিধারী প্রিকারিয়েতদের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। শিক্ষিতদের যাঁরাই বিদেশে গিয়ে বেঁচে থাকার খাতিরে নাগালের মধ্যে যে কাজই করতে ছোটেন—তাঁরাও প্রিকারিয়েত। অনিঃশেষ অনিশ্চয়তায় তাঁরাও ভোগেন। অনেকেই ছিটকে পড়েন মানবিক জীবনবোধ ও বেঁচে থাকার সহজ আনন্দ থেকে। গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন, কেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও ট্যাক্সি বা স্কুটি ড্রাইভিং, পিৎজা ডেলিভারি, কুরিয়ার সার্ভিসের পোস্টম্যান, রেস্তোরাঁর বেয়ারা, দূরযাত্রার বাস-ট্রেনের কন্ডাক্টর বা কল সেন্টার ও টেলিমার্কেটিং এবং ফ্রিল্যান্সিং ধরনের সাময়িক পেশা গ্রহণের চক্রে আটকা পড়তে বাধ্য হচ্ছেন। নৃবিজ্ঞানী ডেভিড গ্রেবার নিছক জীবিকার্জনের জন্য দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের বাইরে নিরানন্দময়, অপ্রচলিত, অপছন্দনীয়, অর্থহীন ও মনঃসংযোগ-বিবর্জিত ক্লান্তিকর কাজের নাম দিয়েছেন 'বুলশিট জবস' বা বাজে কাজ (গ্রেবার, ডেভিড ২০১৮)। এসবের প্রতিক্রিয়া হিসেবে কী রকম সামাজিক বিপর্যয় আসন্ন এবং কেন আমাদের এখনই সতর্ক হওয়া

প্রয়োজন, তা নিয়ে আলোচনাও করেছেন। 'কাজের বা উপার্জনের ছোট-বড় নেই, সম্মান-অসম্মানের বিষয় নেই'—এই মরমি ভাষ্যের আড়ালে চাপা পড়ে থাকে বৈষম্যের বাস্তবতা। অসংখ্য শিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমশক্তির প্রিকারিয়াস উপার্জনে বাধ্য হওয়ার কার্যকারণের আলোচনা থেকে এভাবে সরে থাকা অনুচিত।

গাই স্ট্যান্ডিং এই শ্রমজীবী বর্গটিকে সরাসরি 'আ ডেঞ্জারাস ক্লাস' বা 'বিপজ্জনক শ্রেণি' নাম দিয়ে আলোচনায় আনলেন। লোরনা ফক্স ও'মাহনি এবং তাঁর কয়েকজন সহযোগী গবেষক নৈতিক ও মানসিক উত্থান-পতন-চড়াই-উতরাইয়ে বিধ্বস্ত এই শ্রেণির নাম দিলেন 'দ্য ভালনেরাবল ডিমন্‌স' বা 'বিপন্ন দানবকুল'। ক্রাইনেট মার্কেটিং সলিউশনের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা সের্গেই গলুবেভ বরং প্রিকারিয়ান বা প্রিকারিয়েতদের দেখছেন 'মানবসম্পদের জন্য নব্য হুমকি' হিসেবে।[৬]

প্রিকারিয়েত ভাবনার সাম্প্রতিকতম পরিপ্রেক্ষিত

২০১১ একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। এ বছর গাই স্ট্যান্ডিং লিখলেন প্রান্তিক শ্রম-সম্পর্কের সামাজিক ব্যবচ্ছেদমূলক গ্রন্থ *দ্য প্রিকারিয়েত : আ ডেঞ্জারাস ক্লাস* (গাই স্ট্যান্ডিং, ২০১১)। বইটি প্রকাশিত হওয়ার আগে আগে মে মাসে *ভ্যানিটি ফেয়ার* ম্যাগাজিনে ছাপা হলো নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিৎজের 'অব দ্য ওয়ান পারসেন্ট, বাই দ্য ওয়ান পারসেন্ট, ফর দ্য ওয়ান পারসেন্ট ধারণাটি (স্টিগলিৎজ, জে. ২০১১)। এতে জানানো হলো, নব্য উদারবাদী শ্রমব্যবস্থা মাত্র ১ ভাগ মানুষকেই সর্বময় ক্ষমতাশালী করে তুলছে। মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সমন্বয় করে সব শ্রমজীবীর আয়বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে বটে, তবে বণ্টনের বৈষম্য অস্বাভাবিকভাবে ১%-কেই সব সুবিধার অধিকারী করে তুলছে। একই বছরে সামাজিক সাম্যমুখী *অ্যাডবাস্টার* ম্যাগাজিন 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন'-এর ডাক দেয়। আন্দোলনটির মূল স্লোগান ছিল, 'আমরাই ৯৯ ভাগ'। *অ্যাডবাস্টার*-এর বক্তব্য ছিল : বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার নীতিমালা যুক্তরাষ্ট্রে সম্পদ পুনর্বণ্টনের বৈষম্যকে সর্বকালের নিকৃষ্টতম পর্যায়ে নিয়ে গেছে। শোষকের কালিমা নিয়ে মাত্র ১ ভাগ মানুষ বিত্তে ফুলেফেঁপে উঠেছে।

উল্লেখ্য, ১৯৮০ সালেই সামাজিক ইতিহাসবিদ হাওয়ার্ড জিন তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ *আ পিপলস হিস্টরি অব দি ইউনাইটেড স্টেটস* (২০১৫)-এ 'দ্য কামিং রিভোল্টস অব দ্য গার্ডস' প্রত্যয়টি ব্যবহারের মাধ্যমে ৯৯% মানুষকে 'দ্য পিপল' বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন যে টালমাটাল সময় আসন্ন,

যখন ৯৯% জনগণ একই মানসিকতায় চলে আসবে। ২০০৫ সালে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ পল ক্রুগম্যানও মার্কিন কংগ্রেসের অর্থ ব্যবস্থাপনা নথি পর্যালোচনা করে *নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকায় লেখেন যে ১৯৭৯ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যম আয়ের জনতার আয় বেড়েছে ২১%, কিন্তু অতিধনীদের মাত্র ০.১%-এর আয় বেড়েছে ৪০০% (ক্রুগম্যান, পি. ২০০৫)। ২০১১ সালে নিউইয়র্কের বাণিজ্যকেন্দ্রের পাশে জুকোট্টি পার্কের অকুপাই আন্দোলনের সমাবেশ পুলিশ ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তখন সিদ্ধান্ত হয় ব্যাংক, বিমাসহ সব ধরনের বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থার দপ্তরের সামনে সামাজিক সাম্যবাদী কর্মীরা লাগাতার সমাবেশ করে যাবেন। সে সময়ও ক্রুগম্যান 'আমরা ৯৯%' ধারণাটিকে সঠিক বলে ঘোষণা দেন এবং আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে পত্রপত্রিকায় মতামত কলাম লেখেন।

'অকুপাই' আন্দোলনটি অভাবিত সাফল্য পেয়ে যায়। বিশ্বের দেশে দেশে 'অকুপাই টুগেদার মুভমেন্ট' দানা বাঁধে। মার্কিন কংগ্রেসেও আন্দোলনটি আলোচনায় আসে। সাম্যবাদী কর্মিবাহিনীর পিটিশনগুলো গৃহীতও হয়। আন্দোলনটির বিশ্বময় জনপ্রিয়তার পেছনে মূল অবদান ছিল বিপুলসংখ্যক প্রিকারিয়াতের অংশগ্রহণের। সম্ভবত হাওয়ার্ড জিন কথিত সমরূপ ভাবনা একই সময়ে প্রকাশিত হওয়ার সুফল ছিল এটি। একই বছরে কাছাকাছি সময়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) একটি সিম্পোজিয়াম আয়োজন করে। প্রিকারিয়েত শ্রমজীবীরা সিম্পোজিয়ামে অংশ নেন। বিষয়ও নির্ধারিত হয় 'ফ্রম প্রিকারিয়াস ওয়ার্ক টু ডিসেন্ট ওয়ার্ক'। শিরোনামই বলে দেয়, অমানবিক 'প্রিকারিয়াস শ্রম' 'পরিচ্ছন্ন শ্রম' নয়। সাম্প্রতিক শহুরে শ্রমিকও এই অনির্ভরযোগ্য ও অনিশ্চিত বাধ্যতামূলক শ্রমব্যবস্থার নিগড় থেকে মুক্তিপ্রত্যাশী।

আইএলওর সিম্পোজিয়ামে দেখা গেল, অংশগ্রহণকারীরা 'অকুপাই টুগেদার' আন্দোলনের দাবিনামাকেই তাঁদের ধ্যানজ্ঞান বলে বিবেচনা করছেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল প্রিকারিয়েতরা নব্য উদারবাদী অর্থনীতির শিকার। তাঁরা এক সুবিশাল শ্রমজীবী বর্গ, যে বর্গে প্রতিদিনই দলে দলে নতুন প্রিকারিয়েত যোগ দিচ্ছেন। কিন্তু জীবনযাত্রার ঘানি টানতে তাঁদের প্রাণপাত করতে হচ্ছে। ২০১২ সালে সিম্পোজিয়ামের প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, আউটকাম ডকুমেন্ট টু দি ওয়ার্কার্স' (সিম্পোজিয়াম অন পলিটিকস অ্যান্ড রেগুলেশনস টু কমব্যাট প্রিকারিয়াস এমপ্লয়মেন্ট (আইএলও ২০১১)। প্রতিবেদনটিতে শ্রমজীবী মানুষের দেওয়া পরামর্শের আলোকে বেশ কিছু মানবিক নীতিমালা ও আইনি প্রস্তাব

রাখা হয়েছিল। সেগুলো বাস্তবায়ন অবশ্য এখনো তেমন এগোয়নি। কারণ সেই একই, প্রিকারিয়েতদের সংগঠিত করার ও সংগঠিত রাখার কাজটি খুবই কঠিন। ব্রিটিশ সামাজিক অর্থনীতিবিদ গাই স্ট্যান্ডিং 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র আদলে প্রথম 'প্রিকারিয়েত ম্যানিফেস্টো' ধারণাটি নির্মাণ করলেন। তিনি যথাযথভাবেই এই নতুন সামাজিক বর্গের চরিত্র এঁকেছেন। তাঁর মতে, প্রিকারিয়াস অনিশ্চয়তা-তাড়িত বর্গ। তারা বিপ্লবের উপযোগী নয়! কারণ, শ্রেণি-সচেতনতা ও সংগঠনের অভাব। প্রিকারিয়েতদের রাজনৈতিক বোধশূন্যতা, দুর্বলতা, সংগঠনহীনতা ও দর্শনহীনতার ষোলো আনা সুযোগ নেয় মুনাফা-ক্ষুধার্ত পুঁজিপতিরা।

প্রিকারিয়েতায়নের হালচাল

এক. আউটসোর্সিং, পুটিং আউট সিস্টেম বা সাব-কন্ট্রাক্টিং : বিশ্বায়ন, নব্য উদারবাদী অর্থব্যবস্থা ও মুক্তবাজার অর্থনীতি চিরাচরিত শ্রমনির্ভর জীবন-জীবিকার খোলনলচে বদলে দিয়েছে। 'আউটসোর্সিং' হয়ে উঠেছে আধুনিক পুঁজিবাদের অন্যতম প্রধান ধমনি। এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো, উন্নয়নশীল দেশের সস্তা মজুরির সুযোগ নিয়ে মুনাফাঘন অর্থকরি ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়ে নেওয়া।[৭] গত চার দশকে বৈশ্বিক বাজার অর্থনীতির নিয়ন্তাদের প্রয়োজনে ভারতে ব্যাঙের ছাতার মতো কয়েক লাখ কল সেন্টার গজিয়ে ওঠে। 'টেলিমার্কেটিং' ধারণাটির সঙ্গে পৃথিবী পরিচিত হতে শুরু করে। বড় বড় বহুজাতিক, ব্যাংক, বিমা, লগ্নি প্রতিষ্ঠানসহ সেবাদাতা অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ভারতের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের মাধ্যমে ভোক্তাদের কাছে পণ্য ও সেবার বিজ্ঞাপন প্রচারের বাজার তৈরি করে। ফোনে বেচাকেনাসহ ক্রেতা-ভোক্তাদের সমস্যা সমাধানও এই কার্যক্রমের অংশ হয়ে ওঠে।[৮] বাংলাদেশের ফুডপান্ডার খাবার ঘরে পৌঁছে দেওয়া কর্মীরা, বিভিন্ন সদাইপাতি প্রতিষ্ঠানের গৃহসেবা—পণ্য ঘরে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাকারী শ্রমগোষ্ঠী, হোটেল-রেস্তোরাঁর সেবাদানকারী বাহিনী, সেলস গার্ল, দূরপাল্লার-স্বল্পপাল্লার যানবাহনের হেল্পার-কন্ডাক্টরসহ নানা রকম সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিরাও আসলে প্রিকারিয়েত। কার্ল মার্ক্স কথিত 'লুম্পেন প্রলেতারিয়েত' তাঁরা নন, তবে ফ্রাঞ্জ ফানোঁর বলা 'আন্ডার ক্লাস' ধারণাটি তাঁদের বেলায় প্রযোজ্য। কথা উঠতে পারে, বিশাল গার্মেন্টস শ্রমজীবীরাও কি প্রিকারিয়েত? হ্যাঁ, তাঁদের শিল্প সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মিবাহিনী মনে করা হলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রিকারিয়েত ছাড়া অন্য কিছুই নন। কেন নন, সে আলাপে পরে ফিরব।

সহজে মুনাফার পাহাড় গড়ে দিতে দারুণ সহায়ক প্রিকারিয়েতায়ন। এই ব্যবস্থায় ধনী দেশের বহুজাতিকদের নিজ দেশে শিল্পায়নের ঝক্কি পোহাতে হয় না অথচ খরচ বাঁচিয়ে মুনাফা করা যায় স্বাভাবিকের তুলনায় বহুগুণ বেশি। এই ব্যবস্থার প্রশ্রয়েই সফটওয়্যার-শিল্পের আকাশচুম্বী খরচও পাই পয়সায় নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।[৯] মার্কিন মুলুকে একটি ব্যাংক পরিচালনা সফটওয়্যার বানানোর যে খরচ, তার ১০ বা ২০ ভাগের ১ ভাগ খরচে ভারত বা বাংলাদেশ থেকে তা করিয়ে নেওয়া সম্ভব। বাংলাদেশের গার্মেন্টস ব্যবসাও শিল্পায়ন নয়। এটা হলো বিশ্ববাজারের ক্রেতাদের জন্য সস্তা শ্রমভিত্তিক, শ্রমঘন, যন্ত্রনির্ভর বিরাট দরজিঘর মাত্র। বেলুনের মতো ফুলে ওঠা এই পদ্ধতিকে কখনো 'পুটিং আউট' সিস্টেম কখনো সাব-কন্ট্রাক্টিং বলা হয়। লাতিন আমেরিকার প্রায় সব দেশে, ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং আফ্রিকার প্রায় সব উন্নয়নশীল দেশে সস্তা শ্রমিকের জোগান অফুরান। ফলে শ্রমিক ঠকিয়ে কাঁচা টাকার পাহাড় গড়ার লোভে এসব দেশেও পশ্চিমা বিশ্বের বহুজাতিকদের সেবাদানকারী এক মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়াতন্ত্র গজিয়ে উঠেছে।[১০] এ রকম বিকাশমান অর্থনীতির পোশাকি ও কেতাবি নাম 'উদ্যোক্তা সৃজন' ও 'কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজার বিকাশ' প্রকল্প। তাতে বিশ্বময় কোটি কোটি তরুণ-তরুণীর বেকারত্ব সমস্যার সুরাহা হয়েছে বটে, তবে বেশির ভাগই ন্যায্য মজুরি বঞ্চনার আধার হয়ে উঠেছে, পেশা হয়ে ওঠেনি।

দুই. ভাষার পুঁজীকরণ ও লাভের গুড়ে ভাগ বসানো : কল সেন্টার-বাণিজ্যের মূল পুঁজি ইংরেজি বুঝতে ও বলতে পারা। প্রিকারিয়ান কাজেও ভাষার পুঁজিতে রূপান্তর হওয়ার ঘটনা নতুন অর্থনৈতিক ধারণা। সত্তরের দশকের আগে পর্যন্ত এটা ততটা গুরুত্ব পায়নি। আশির দশকের পর থেকে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক উপনিবেশে কল সেন্টার অর্থনীতি বিরাটাকার হয়ে ওঠে। কল সেন্টারের সংখ্যার দিক থেকে ভারতের পরই ফিলিপাইনের স্থান।[১১] উদ্দেশ্য, সাবেক উপনিবেশের শিক্ষিত অংশের ইংরেজি ভাষায় যোগাযোগের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে মুনাফা অর্জন। অসামান্য লাভের গুড়ের লোভে প্রিকারিয়েত খাতটি ধনী দেশে ফেরতও আসতে শুরু করে। যেমন ইংরেজিতে যোগাযোগ দক্ষতারও রকমফের আছে। ভিনদেশের কল সেন্টারকর্মীদের উচ্চারণ মার্কিন বা ব্রিটিশ নাগরিকদের উচ্চারণের মতো হওয়ার কথা নয়। সে কারণে বিদেশি সেন্টারগুলোর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ব্রিটেনের ভেতরেই অজস্র কল

সেন্টার গড়ে উঠেছে। এসব কল সেন্টারে স্থানীয় আসল ইংরেজিভাষীরা নিয়োগ পেলেও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নশীল দেশগুলোর কল সেন্টারের মতোই। মজুরিও তেমন বেশি নয়। বরং সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরিকাঠামোর কাছাকাছি। অর্থাৎ প্রিকারিয়েতায়ন শুধু ভিনদেশেই শ্রম শোষণের হাতিয়ার নয়, ধনী দেশের বাজারেও প্রিকারিয়াতের সংখ্যা বাড়ছে। মার্কিন কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠান জিপ্লিয়া টেলিমার্কেটার ডেমোগ্রাফিকস অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ইন দি ইউএস শিরোনামের ২০২০ সালের একটি গবেষণাপত্রে উল্লেখ করে যে ২০১৯ সাল নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রে কল সেন্টারের কর্মিসংখ্যা ছিল ১ লাখ ১৯ হাজার ২২০ জন। শ্রমিকদের ৬২ শতাংশ নারী এবং তাঁদের আয়-রোজগার সব শ্রমিকের আয়ের ৯৪ শতাংশ। ৩৭ বছর বয়সের বেশি বয়সী কেউই এই পেশায় নেই। কর্মীদের ৬০ শতাংশ শ্বেতকায়।[১২] অর্থাৎ খোদ যুক্তরাষ্ট্রসহ ধনী দেশগুলোতেও প্রিকারিয়েত বর্গটি কলেবরে বাড়ছে। যুবা বয়সীরাই প্রিকারিয়ান রোজগেরে কর্মকাণ্ড ব্যবস্থাপকদের মোক্ষম টার্গেট।

তিন. কল সেন্টার-নির্ভর পাঁচ ধরনের নব্য সামাজিক পুঁজিব্যবস্থা : ২০০২ থেকে ২০০৪ সালে কল সেন্টারের 'আউটসোর্সিং' বাজার সম্পর্কে পঠনপাঠনে বুঝতে সক্ষম হই যে শ্রম-সম্পর্ক বিবেচনায় বিশ্ব বাণিজ্যমহল কমপক্ষে পাঁচ ধরনের নব্য সামাজিক পুঁজিব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে। প্রথম পুঁজি যৌবন ও তারুণ্য। দ্বিতীয় পুঁজি নারীত্ব। তৃতীয় পুঁজি ইংরেজিতে যোগাযোগ সক্ষমতা। চতুর্থ পুঁজি মুখ বুজে ২৪ ঘণ্টার কর্মব্যস্ততা। পঞ্চম পুঁজি সস্তা শ্রম। বিশ্ব বাণিজ্যমহলের প্রণোদনায় 'উদ্যোক্তা'—আসলে ফড়িয়া মধ্যস্বত্ব-ব্যবস্থা—এতটাই অর্থনীতির অংশ হয়ে ওঠে যে সারা বিশ্বেই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে 'টেলিমার্কেটিং'-এ যুক্ত হয়েছেন জীবিকাপ্রত্যাশী অগণিত মানুষ। সংক্ষেপে বলা চলে, প্রিকারিয়ান জীবিকা হলেও এই ব্যবসায় সুললিত কণ্ঠের অধিকারী সুশ্রী তরুণীদের প্রয়োজন। আরও দরকার তাঁদের, যাঁরা দিবারাত্র ২৪ ঘণ্টা চলমান কাজের যেকোনো শিফটে কাজ করতে আগ্রহী। তারা চোখে চোখ রেখে কথা বলবে না, বশে থাকবে, অন্যায্য অপেশাদার আচরণের প্রতিবাদ করবে না।

প্রিকারিয়াস উপার্জনের নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে না। সংসার-বিশ্রাম-আনন্দ-বিনোদন, প্রিয়জনের সান্নিধ্য, সামাজিকতা, পেশাগত দক্ষতা অর্জনের সুযোগ ও সক্ষমতা প্রায় ক্ষেত্রে প্রিকারিয়েতদের জন্য কল্পনা বিলাস। স্বাস্থ্যহানি, যৌনস্বাস্থ্যের অবনতি, শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্থায়ী ক্ষতি, অনিদ্রা, ক্লান্তি, স্মৃতিশক্তি হ্রাস,

সংসারে ভাঙন, দৃষ্টিহানি, তরুণী বয়সেই প্রজনন অঙ্গের সংক্রমণের (আরটিআই) কারণে প্রজননস্বাস্থ্য বিপর্যয়, অতিরিক্ত শর্করা গ্রহণ, রিপিটিটিভ স্ট্রেইন ইনজুরির (আরএসআই) কারণে নানা রকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, রোগবালাই, ডায়াবেটিস, স্থূলত্ব—কী নেই সেই তালিকায়! প্রিকারিয়ান শ্রমজীবীদের নিয়মিতই বরণ করে নিতে হয় দুরারোগ্য শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা ও ক্ষয়। ভারতে কল সেন্টারের কর্মীদের মনোদৈহিক অভিঘাত বিষয়ে তালিকার পর তালিকা হয়েছে। গবেষণারও কমতি নেই। ২০০৭ সালে সঞ্জীব হিমাচলি[১৩] কল সেন্টার এবং বিজনেস প্রসেসিং আউটসোর্সিংয়ের (সংক্ষেপে বিপিও) ব্যবস্থাপকদের জন্য হিউম্যান ইস্যুজ ইন কলসেন্টারস অ্যান্ড বিপিও ইন্ডাস্ট্রি শিরোনামে যে প্রতিবেদন তৈরি করেন, তাতে একমাত্র পরামর্শ ছিল শ্রমজীবীদের মনোদৈহিক রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিটি কর্মস্থলে পূর্ণাঙ্গ মনঃসেবাকেন্দ্র স্থাপন করা। প্রিকারিয়ান কর্মস্থলে এসব পরামর্শ খুব কমই মানা হয়। বিশ্ববাজারের ক্রেতাদের চাপে বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতের কোথাও কোথাও কিছু সেবাকেন্দ্র চালু হলেও বেশির ভাগ কারখানাই সেই পুরোনো অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতেই চলছে।

চার. 'নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও' দর্শন : বিশ্বায়ন বা মুক্তবাজার অর্থনীতি ক্ষমতাবানদের জন্য উন্মুক্ত বাজার সৃষ্টি করলেও সামাজিক ন্যায্যতানির্ভর শ্রম ব্যবস্থাপনাকে এড়িয়ে চলে। 'নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও', 'বাকির খাতা শূন্য থাক'; এ-জাতীয় দর্শন প্রিকারিয়েতদের কাঁচা অর্থ উপার্জনের চিন্তায় মাতিয়ে রাখে। যেমন দারাজের একজন ডেলিভারি বয়ের কথা বলা যায়। তাঁকে হয়তো পাঁচ-সাতটা ভিন্ন চাকরির চিন্তা মাথায় রাখতে হয়। তিনি জানেন না কাল কী হবে। আজ চাকরি আছে, আগামীকালই বলা হতে পারে, তোমার চাকরিটি আর নেই। তিনি তখন হয়তো কোনো একটা চায়নিজ রেস্তোরাঁয় ওয়েটারের চাকরি নেবেন। এ রকম চায়নিজ রেস্তোরাঁয় যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। জিজ্ঞেস করেছিলাম, কত বেতন পান? তাঁরা জানালেন যে ধরাবাঁধা কোনো বেতন নেই। প্রশ্ন করেছিলাম, তাহলে কাজ করেন কেন? তাঁদের উত্তর ছিল, বকশিশের জন্য। অর্থাৎ তাঁদের জীবিকার উপায় এতটাই সংকীর্ণ যে তাৎক্ষণিক ছিটেফোঁটা আয়ই তাঁদের প্রত্যাশা ও ভরসা। বকশিশনির্ভরতা টেকসই উপার্জনপদ্ধতি নয়। বেতনভুক্তই যে হতে হবে, এমনটাও নয়। কেউ ব্যবসায়ী হবেন, কেউবা উদ্যোক্তা। তবে পেশা

যা-ই হোক না কেন, ভবিষ্যৎ জীবনধারণের নিশ্চয়তা প্রয়োজন। একজন ছোট সরকারি কর্মচারীও মাতৃত্বকালীন ছুটি, অসুস্থতার ছুটি ও ভাতাগুলো পাওয়ার অধিকার রাখেন। অবসর-সুবিধা, গ্রাচ্যুইটি, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ইত্যাদি অধিকার থাকার কারণে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কমবেশি সুযোগ তাঁর থাকে। তাঁর পারিবারিক খরচের বাজেট তখন গুছিয়ে করা যায়। কিন্তু অনিশ্চয়তার কারণে প্রিকারিয়াতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সুযোগ থাকে না বললেই চলে।

প্রিকারিয়াতায়নে বিশ্বায়নের দায়

প্রিকারিয়াতায়নের পেছনে বিশ্বায়ন কতটা দায়ী? আশি-নব্বইয়ের দশকে এ জন্য বিশ্বায়নকে দায়ী করা হচ্ছিল না। সে সময় অ্যাডাম স্মিথের নব্য অনুরাগীরা নানাভাবে প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন যে বাজারব্যবস্থার 'অদৃশ্য হাত' যেকোনো অসাম্যকে জবরদস্তি বা অযাচিত হস্তক্ষেপ ছাড়াই সমতার পথে নিয়ে যাবে এবং বাজার নিজস্ব পদ্ধতিতেই ত্রুটিবিচ্যুতি শুধরে নেবে। কার্ল পপারের দর্শনালোকে মিল্টন ফ্রিডম্যান বা কৌশিক বসুর মতো অর্থনীতিবিদেরা বিশ্ব অর্থনীতির ভবিষ্যৎ বিকাশধারাকেও ধ্রুপদি অর্থশাস্ত্রের আলোকে বিশ্লেষণ করেছিলেন বলেই সম্ভবত এই বিপত্তি।[১৪] 'আউটসোর্সিং' বা অন্যদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার পুঁজিবাদ যে মহাশক্তিধর মুনাফা বর্ধনযন্ত্রের রূপ নেবে, তাঁরা হয়তো তেমনটি ভাবেননি। নইলে 'প্রথম দিকে যদি প্রবৃদ্ধি বাড়ে, বিভিন্ন বর্গে বৈষম্য বাড়লেও বাজার তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি দিয়ে সেটিকে সমন্বয় করে নেবে এবং ভারসাম্য ফিরিয়ে আনবে' জাতীয় বিশ্লেষণটি বেঠিক প্রমাণিত হতো না। বাস্তবে রাষ্ট্রগুলোর প্রবৃদ্ধি বেড়েছে কিন্তু আয়বৈষম্য ও বণ্টনবৈষম্য কমেনি। মেক্সিকোর ম্যাকিলাদোরা শ্রমঘন কারখানাসহ বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাত—কোনোটিই প্রকৃত অর্থে শিল্প নয়। পশ্চাৎ সংযোগ বা অগ্র-সংযোগবিহীন (ব্যাকওয়ার্ড ও ফরোয়ার্ড লিংকেজ) সাব-কন্ট্রাক্ট বা 'পুটিং আউট' ব্যবস্থা হওয়ায় উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রচলিত 'শ্রমিক'-এর চেয়ে প্রিকারিয়াতের সংখ্যা বহুগুণে বাড়ছে।[১৫]

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ টমাস পিকেটি তাঁর *একবিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদ* বইয়ে[১৬] দেখালেন যে বৈষম্য আগের তুলনায় অনেকাংশে বেড়েছে। ১ শতাংশ মানুষের সম্পদ জ্যামিতিক হারে বাড়ছে আর ৯৯ শতাংশ মানুষ সম্পদ হারাচ্ছেন। তিনি বলেছেন, বাজারের ওপর সবকিছু ছেড়ে দেওয়া যাবে না, সেখানে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ দরকার। পিকেটিও দেখালেন, যে ১ শতাংশের কাছে সম্পদ যাচ্ছে, তাঁদের ১ শতাংশ আবার অকল্পনীয় হারে সম্পদ পুঞ্জীভূত

করছে। জাতীয় অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি এবং বহুজাতিক পুঁজির বিনিয়োগ ও মুনাফার সঞ্চয়নে উল্লম্ফনে তারতম্য স্পষ্ট। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে অর্থনৈতিক সমন্বয়ব্যবস্থা থাকলে অসাম্য কমিয়ে আনা যেত। কিন্তু মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সাম্য ও সমতাবিধানের পদ্ধতিও নির্ধারণ করা হয়েছে বিশ্বায়িত বাণিজ্য-সম্পর্কের ভিত্তিতে। টমাস পিকেটির মতে, অর্থনীতির জোয়াল সম্পূর্ণরূপে বাজারের হাতে সঁপে দিয়ে রাষ্ট্রের দায়মুক্ত থাকার বিষয়টি আকস্মিকভাবে হয়ে যায়নি। এমনটিও নয় যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বা মুক্তবাজারের রাশ টেনে সংশোধনের পথে যাওয়ার আর কোনো সুযোগও নেই। এটা সুপরিকল্পিত এবং এটা আসলে পুঁজিবাদেরই বৈশিষ্ট্য।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নৃবিজ্ঞানী অর্জুন আপ্পাদুরাই যে পাঁচ ধরনের বিশ্বায়নের পটভূমি () বর্ণনা করেছেন, তার আলোকে বিশ্বায়নের দায় বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রথমত, আমরা বিশ্বায়ন বলতে কী বুঝছি, বিশ্বায়নের যুগসন্ধিক্ষণে কী কী ঘটনা ঘটছে? এক, 'এথনোস্কেপ' একটি বৈশিষ্ট্য, যা মানুষের ব্যাপক হারে স্থানান্তর এবং নানা দেশের নানা মতের ও ভাষার গণমাধ্যমের নজরে এনেছে। ফলে মানবসমাজ জাতিগত পরিচয়ের গণ্ডির ওপরে উঠে বৈশ্বিক বলয়ের অংশে পরিণত হচ্ছে। পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে পর্যটক, অভিবাসী, শরণার্থী, নির্বাসিত ব্যক্তি কিংবা অতিথি শ্রমিকদের স্থানান্তর অনেক বেড়েছে। তাঁরা যেকোনো দেশে যেতে পারছেন। দুই, 'টেকনোস্কেপ'। বিশ্বনাগরিক যান্ত্রিক বা তথ্যগত প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহের সমরূপ ভোক্তায় পরিণত হচ্ছে। যেমন স্মার্টফোনে ধনী দেশ, গরিব দেশ—সব দেশের মানুষের জন্য একই সুযোগ তৈরি হয়েছে। 'ব্র্যান্ড ফেটিশিজম' বা পণ্য-মোহবিষ্টতা বাড়ছে। নামীদামি ব্র্যান্ডের জামা-জুতা-ঘড়ি-ফোন-টিভি-ফ্রিজসহ সব ভোগ্যপণ্য সবার জন্য ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠছে। তিন, 'আইডিওস্কেপ'। চিন্তা বা ভাবাদর্শের অবাধ প্রবাহে ভাবনার ভিন্নতা ঘুচছে। আদর্শগত বা চিন্তাচেতনার জগতে সমরূপতা বাড়ছে। ভাবধারার বিশ্বায়ন ঘটছে। যেমন 'সন্ত্রাসবাদ' শব্দটি বিশ্বনাগরিকদের মধ্যে একই রকম অর্থ ও ভাব তৈরি করছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্বায়নের ক্ষতি কী? ক্ষতি এই যে ভোগের ক্ষেত্রে হোমোজেনেটি বা সমরূপিতা তৈরি হলেও উৎপাদন এবং আয় ও সম্পদ বণ্টনে অসমরূপিতাই বাড়ছে। প্রিকারিয়েতদের একক কোনো শ্রেণিতে পরিণত হওয়ার সুযোগই নেই। ভোক্তা হিসেবে প্রিকারিয়েতও গ্লোবাল বা বৈশ্বিক পর্যায়ের ভোক্তা। কিন্তু আয়-উপার্জন ও সর্বহারা বৈশিষ্ট্যে তারা একান্তই লোকাল বা স্থানীয়।

আপ্পাদুরাই বৈশ্বিকতা ও স্থানীয়তার এই অসম মিশেলের নাম দিয়েছেন 'গ্লোকালাইজেশন'। প্রিকারিয়েত বিশ্বায়নের অংশ হওয়ার বদলে গ্লোবালাইজেশনের পাঁকে আটকা পড়ে যাচ্ছে। 'ম্যাকডোনাল্ড' ফাস্ট ফুড চেইন পৃথিবীর অন্যতম বড় প্রিকারিয়েত তৈরির কারখানা, যেখানে স্থায়ী চাকরি বলে কিছু নেই। বার্গার কিং, কেএফসি হালাল খাবার চালু করেছে। স্থানীয় ও বৈশ্বিক বাস্তবতার সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ঘটছে। কিন্তু অর্থ ব্যবস্থাপনার নৈতিকতায় সমন্বয় ঘটছে না।

প্রিকারিয়েত চাকুরেরা ঘণ্টাভিত্তিক মজুরি পান। তাঁদের চাকরি স্থায়ী নয়। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সেবামূলক কর্মক্ষেত্রেও স্থায়ী চাকুরের বদলে অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্তদের সংখ্যা বাড়ছে। পশ্চিমা বলয়েও উচ্চশিক্ষিতরা চাকরি হারাচ্ছেন। অনেকেই একাধিক উপার্জনমুখী কাজে যুক্ত হতে বাধ্য হচ্ছেন। ঢাকায় একদল চাকরিজীবী অফিস শেষে পাঠাও মোটর-সাইকেল চালিয়ে খানিকটা অতিরিক্ত উপার্জনে নামেন। আর্থিক সচ্ছলতা আনার যজ্ঞে বিসর্জন দেন বিশ্রাম, সন্তানসন্ততি ও প্রিয়জনের জন্য বরাদ্দ করা সময়। পশ্চিমেও একদল একদিন ট্যাক্সিক্যাব চালাচ্ছেন, পরদিন উবার চালাচ্ছেন। এই অবস্থা সৃষ্টির পেছনে বিশ্বায়নের দায় রয়েছে। বিশ্বায়ন ভোক্তামানস তৈরি করে দিলেও ভোগবাদী জীবনযাপনের সামর্থ্য তৈরি করেনি। উল্টো সেই সম্ভাবনাকে সুদূরপরাহত করেছে। 'অন কল' কাজ বাড়ছে। সারা বিশ্বেই 'অন কল' কর্মীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। গাই স্ট্যান্ডিং এ জন্য তাঁদের বলেছেন 'নিউ ডেঞ্জারাস ক্লাস'। তাঁদের সামাজিক প্রতিক্রিয়া পশ্চাৎবাদী। 'আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম' ধরনের ভাবালুতা এবং বর্তমান জীবনযাত্রার প্রতি অসন্তোষ-অতৃপ্তি নিয়েই তাঁদের দিন কাটে। সময়-সময় তারা ফেটে পড়ে বিদ্রোহে।

গাই স্ট্যান্ডিং অভিবাসী, সংখ্যালঘু, স্থানচ্যুত, বাস্তুচ্যুত এবং ভাসমান মানুষদেরও বিবেচনায় আনলেন। যেমন, আমরা রোহিঙ্গাদের বাস্তবতা বিবেচনায় নিতে পারি। রোহিঙ্গারা যে কাজই পাবে, বাছবিচার ছাড়াই তাতে লেগে যাবে। উপায়হীনতা প্রিকারিয়াতায়নের অন্যতম বড় কারণ। গাই স্ট্যান্ডিং দেখিয়েছেন, উপায়হীনতা তাদের 'অ্যাটাভিস্ট' (পশ্চাৎপন্থী) ও 'রোমা' (যাযাবর) দলভুক্ত হতে বাধ্য করে। পশ্চাৎপন্থী, রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রিকারিয়েত আশ্রয় খোঁজে প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের পেছনে। এভাবে ডোনাল্ড ট্রাম্প বা দুতার্তের মতো জনতুষ্টিবাদী নেতার উত্থান ঘটে। গাই স্ট্যান্ডিং দেখালেন, একদল প্রিকারিয়েত যেমন পশ্চাৎপন্থী ও যাযাবর ধরনের রক্ষণশীলতার ছায়াতলে আশ্রয় নেয়, তৃতীয় একটি শিক্ষিত দল বেছে নেয় বিপরীত পথ। যেমন আমেরিকার বার্নি

স্যান্ডার্স বা ব্রিটেনের জেরেমি করবিন ধরনের প্রগতিশীল নেতৃত্বের মধ্যে তাঁরা আশা খোঁজার চেষ্টা করেন। তাঁরা বিক্ষোভ-বিদ্রোহের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্নও দেখে থাকেন। ভবিষ্যতে বিত্তবান ও প্রিকারিয়েতদের মধ্যে একধরনের সংঘাতের সম্ভাবনা টের পাওয়া যায়। তবে সময়ই বলে দেবে, প্রিকারিয়েতরা কখনো রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন 'শ্রেণি' হয়ে উঠবে কি না!

● **হেলাল মহিউদ্দীন** অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।

পাঠনির্দেশ

Zinn, Howard 2015. *A People's History of the United States*. US : Harper Perennial Modern Classics; Reissue edition

BBC. 2011. Are call centres the factories of the 21st Century? http ://www.bbc.co.uk/news/magazine-12691704 (retrieved 17 March 2022);

Cowie, Claire. 2007. The accents of outsourcing : The meanings of 'neutral' in the Indian call centre industry. *World Englishes* 26(3).316-30.

Forey, Gail, and Jane Lockwood (eds.) 2010. *Globalisation, communication and the workplace*. London : Continuum.

Friginal, Eric. 2008. *The language of outsourced call centres : A corpus-based study of cross-cultural interaction.*, Flagstaff, AZ : Northern Arizona University PhD thesis;

Standing, Guy. 2014. The Precariat. [Excerpt of the book with same title] Contexts 13 : 10. American Sociological Association. Also available at http ://ctx.sagepub.com/content/13/4/10]

Standing, Guy. 2011. *The Precariat-The New Dangerous Class*. Policy Network.

David Graeber 2018. *Bullshit Jobs : A Theory*. UK : Simon & Schuster.

Fox O'Mahony, Lorna, David O'Mahony and Robin Hickey (eds), *Moral Rhetoric and the Criminalisation of Squatting : Vulnerable Demons?* (London : Routledge, 2014).

Krugman, Paul 2011. "We Are the 99.9%". *The New York Times* (November 24).

Stiglitz, Joseph 2011. "Of the 1%, by the 1%, for the 1%". *Vanity Fair*. (May)

তথ্যসূত্র

১. [Gottheil, Fred M. 1962. "Increasing Misery of the Proletariat : An Analysis of Marx's Wage and Employment Theory". *The Canadian Journal of Economics and Political Science*. Canadian Economics Association. pp. 103-113.]

২. [Standing, Guy. 2014. The Precariat. [Excerpt of the book with same title] *Contexts* 13 : 10]

৩. [দেখুন https ://dw.com/bn/আমাদের-কোনো-উপায়-নেই/a-58155722]

৪. [দেখুন Singh, Sushant and Aanchal M. 2020. "Indian migrants, across India". *Indian Express*, April 29, এবং Chishti, Seema 2020. "How many migrant workers displaced? A range of estimates". *Indian Express*, June 8.]

৫. ফারুক ওয়াসিফ, প্রিক্যারিয়েত : সবচেয়ে 'বিপজ্জনক' শ্রেণি। দেখুন : tinyurl.com/2cd6fv8f

৬. [দেখুন Golubev, Sergei 2021. https ://pulse/precariat-new-threat-human-capital-sergey-golubev]

৭. [দেখুন Andreff. Wladimir 2009. Outsourcing in the new strategy of multinational companies : foreigninvestment, international subcontracting and production relocation. *Papeles de Europa 18*, pp. 5-34]

৮. [দেখুন 1) McIvor, R 2000. A practical framework for understanding the outsource process. *Supply chain management* 5 : 22-36; 2) Bahrami, B. 2009. A look at outsourcing offshore. *Competiveness Review : An international buisness journal incorporating journal of global competiveness* 19 : 212-223; 3) Jones, WO 2009. Outsourcing in China : Opportunities, challenges and lessons learned. *Industry insight. Strategic Outsourcing : An International Journal* 2 : 187-203.]

৯. [দেখুন Ringshaw, Grant. 2003. Call centres take the passage to India. *Sunday Telegraph*, May 25, 8; 2; 2) Taylor, Phil, and Peter Bain. 2005. 'India calling to the far away towns' : The call centre labour process and globalization. *Work, Employment and Society* 19(2).261-82.]।

১০. [দেখুন 1) Piore, M. 1997. The economics of the sweatshop. In A. Ross (ed.) *No Sweat : Fashion, Free Trade, and the Rights of Garment Workers*. New York : Verso; 2) Robbins, R. H. 1999. *Global Problems and the Culture of Capitalism*. Boston : Allyn & Bacon; 3) Ross, A. 1997 (ed.) *No Sweat : Fashion, Free Trade, and the Rights of Garment Workers*.

New York : Verso; 4) Seabrook, J. 1996. *In the Cities of the South : Scenes from a Developing World*. London and New York : Verso.]

১১. [দেখুন 1) Bolton, Kingsley. 2010. 'Thank you for calling' : Asian Englishes and 'native-like' performance in Andy Kirkpatrick eds "Asian call centres". *The Routledge handbook of world Englishes*, ed. by, 550-64. London : Routledge; 2) Lockwood, Jane, Gail Forey, and Helen Price. 2008. English in the Philippine call centers and BPO operations : Issues, opportunities and research. *Philippine English : Linguistic and literary perspectives*, ed. by M. Lourdes S. Bautista and Kingsley Bolton, 219-41. Hong Kong : Hong Kong University Press.]

১২. (দেখুন https ://www.zippia.com/telemarketer-jobs/demographics/) ।

১৩. (Himachali, Sanjeev 2007, https ://www.citehr.com)

১৪. [Strauss, Bob. 2021. "How the "Invisible Hand" of the Market Does, and Does Not, Work." ThoughtCo, Sep. 3. thoughtco.com/invisible-hand-definition-4147674.].

১৫. [Standing, Guy 2017.*The Corruption of Capitalism : Why Rentiers Thrive and Work Does Not Pay*, London : Biteback].

১৬. [Piketti, Thomas 2017. Capitalism in the Twenty-First Century. US : Belknap Press, an imprint of Harvard University Press edition]

বিশ্বরাজনীতি

গণতন্ত্রের হেলে পড়া : পুনর্জাগরণ থেকে বিপন্নতায়

ল্যারি ডায়মন্ড

সারকথা

১৯৯০-এ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনকে পশ্চিমা দুনিয়ায় গণতন্ত্রের জয় হিসেবে দেখা শুরু হয়েছিল। সেই বছরই যুক্তরাষ্ট্র থেকেই প্রকাশিত হতে শুরু করে *জার্নাল অব ডেমক্রেসি* পত্রিকা। গণতন্ত্রপ্রেমী ও রাষ্ট্রচিন্তকদের মধ্যে বিপুল আশাবাদের জোয়ার দেখা যাচ্ছিল। দেশে দেশে স্বৈরশাসকেরা আত্মরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত। মনে হচ্ছিল গণতন্ত্রই হতে চলেছে বিশ্বের একমাত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা। পাশাপাশি নব্য গণতান্ত্রিক দেশগুলোর নামকাওয়াস্তে গণতান্ত্রিক চর্চা দেখে পণ্ডিতেরা এদের ভবিষ্যৎ নিয়েও সন্দিহান হয়ে উঠছিলেন। পরে খোদ যুক্তরাষ্ট্রেও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অগভীরতা, ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো কর্তৃত্ববাদী নেতার বিজয় গণতন্ত্রের নাজুকতাকে সামনে নিয়ে আসে। ভারত, ব্রাজিল, রাশিয়াসহ নব্বইয়ের দশকে হাজির হওয়া নতুন গণতন্ত্রগুলোতেও কর্তৃত্ববাদী নেতারা ক্ষমতাসীন হতে থাকেন। এই প্রবন্ধের লেখক নিজে *জার্নাল অব ডেমোক্রেসি*র সম্পাদক হিসেবে বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রের উত্থান ও ধারাবাহিক পতনের সাক্ষ্য দিচ্ছেন এই রচনায়। রচনাটি *ডেমোক্রেসি ফর জার্নাল*-এর চলতি সংখ্যার মূল প্রবন্ধ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের সংকটের বিবরণ দেওয়ার পাশাপাশি চীনের উত্থান এবং ইউক্রেন সংকটে রাশিয়ার ভূমিকার পটভূমি এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

‘আমাদের ইতিহাসের আরম্ভ থেকেই স্বৈরতন্ত্র বনাম স্বাধীনতার সেই প্রাচীনতম ও একমাত্র হেতুটি ছাড়া, রাজনীতির ন্যূনতম অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার বাস্তব কোনো কারণই আর অবশিষ্ট নেই।’

হানা আরেন্ট, অন রেভল্যুশন, ১৯৬৩

● অনুবাদ : **ধ্রুব সাদিক**

মার্ক প্ল্যাটনার ও আমি ১৯৮৯ সালের শুরুর দিকে যখন এই জার্নাল প্রকাশের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছিলাম, জোরালোভাবে না হলেও গণতন্ত্র তখন বিশ্বজুড়ে পুনরুত্থিত হয়েছিল। স্যামুয়েল পি হান্টিংটন অচিরেই যাকে 'গণতন্ত্রের তৃতীয় তরঙ্গ' নাম দেবেন, তত দিনে তা দক্ষিণ ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা ও এশিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা ১৯৭৪ সালের এক-চতুর্থাংশ থেকে ১৯৮৮ সালের শেষে বেড়ে হয়েছিল ৪০ শতাংশ। বিশ্বের বিদ্বজ্জন, শিক্ষার্থী, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মী এবং নীতিনির্ধারকদের চিন্তার খোরাক জোগানোর মতো নতুন প্রকাশনা চালু করতে গিয়ে ভেবেছিলাম, আমরা বিশ্বকে বদলে দেওয়ার মতো এক ঐতিহাসিক তরঙ্গে আরোহণ করেছি। কিন্তু এটা যে অনিবার্য হয়ে উঠেছে, তা আমরা টের পাইনি। এবং রাজনৈতিক রূপান্তর যে গতি ও বিস্তার নিয়ে আসন্ন হয়ে উঠেছিল, আমরা তা কল্পনাও করিনি।

১৯৮৯ সালের শেষের দিকে আমাদের প্রথম সংখ্যাটি ছাপাখানায় গেল। বার্লিন প্রাচীর কয়েক দশক ধরে যাদের আটকে রেখেছিল, তারা তখন তা ভেঙে ফেলেছিল। সোভিয়েত ব্লকও ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যাচ্ছিল। মিখাইল গর্বাচেভের অধীনে অনর্গল পাঁচ বছরের পর, জরাজীর্ণ সোভিয়েত ইউনিয়ন অনিশ্চিত এক যুগে প্রবেশ করেছিল। ১৯৯১ সালের শেষ দিকে এর পতন হয়। সে সময়ে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের বেশির ভাগ দেশে গণতন্ত্রের ভালো রকম উত্তরণ ঘটে চলছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলা মুক্তি পান। বেনিনের সুশীল সমাজ একনায়কতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে ফেলে এবং আফ্রিকার অন্য সব দীর্ঘস্থায়ী স্বৈরতন্ত্রও আত্মরক্ষামূলক হয়ে পড়ে। অচিরেই জাম্বিয়া, কেনিয়া ও মালাউয়ির দুর্ধর্ষ-রকম একনায়কদেরও পতন ঘটে। ১৯৯৪ সাল নাগাদ, আধা দশকের মধ্যে প্রায় ৪০টি দেশ গণতন্ত্রে উত্তরিত হয়।

সবই ছিল আশাপ্রদ—এবং মাঝে মাঝে রোমাঞ্চকরও। *জার্নাল অব ডেমোক্রেসি*-এর গোড়ার বছরগুলোতে মনে হতো উদার গণতন্ত্রই 'একমাত্র সত্যিকারের এবং সম্পূর্ণ আধুনিক সমাজ'। গণতন্ত্রের অভিযাত্রা কেবল বাস্তবের মাটিতে এবং ভোটের বাক্সেই চলছিল না, গুণগত ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেও তা এগিয়ে যাচ্ছিল। বাম ও ডানপন্থী উভয়েই, নাইজেরিয়ার ক্লড এইকে ও পেরুর মারিও ভার্গাস ইয়োসার মতো বুদ্ধিজীবীরাও গণতন্ত্রকে ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজনীয় সরকারপদ্ধতি বলে প্রমাণ করে দেখান। ১৯৯৯ সালে ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রনায়ক লি কুয়ান ইউর তত্ত্বকে অকাট্যভাবে খণ্ডন করে দেখান যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার জন্য কর্তৃত্ববাদ কোনো কার্যকরী

ব্যবস্থা নয়। সেনের যুক্তি হলো, প্রবৃত্তিগতভাবে রাজনীতিতে মানুষের শরিকানা প্রতিষ্ঠা এবং মুক্তির প্রতি মৌলিক আকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্যই গণতন্ত্র এত গুরুত্বপূর্ণ। প্রায়োগিক দিক থেকে, দরিদ্রসহ এটা জনগণকে কথা বলার এবং তা শোনানোর সক্ষমতা দেয়।

একনায়কতন্ত্রী শাসন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অশ্রুপাতের দাগ রেখে গেছে: নৃশংস মানবাধিকার লঙ্ঘন, আতঙ্কের বিস্তার, ব্যাপক দুর্নীতি এবং মাঝে মাঝে অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও পতন। লাতিন আমেরিকার একনায়কতন্ত্র নাগরিক ও রাজনীতিবিদ উভয়কেই বশ করে রেখেছিল। প্রতিক্রিয়ায় (বিশেষত বামপন্থীদের মধ্যে) 'গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে গণতন্ত্র আরও বেশি মহিমান্বিত হয়। গণতন্ত্রকে গণতন্ত্রেরই জন্য এবং বাস্তবের স্বার্থে সুরক্ষিত করা প্রয়োজন' বলে মনে করেন হুয়ান লিঞ্জ ও আলফ্রেড স্তেফান। মুক্তির জোয়ারে অনুপ্রাণিত, কর্তৃত্ববাদী শাসনের নিষ্ঠুরতায় তাড়িত, এবং কিছু দেশে (বিশেষত পূর্ব এশিয়ায়) বাড়তে থাকা আয়, শিক্ষা ও পাশ্চাত্যের সঙ্গে মেলামেশার ফলে রূপান্তর ঘটছিল। এসব কারণে দুনিয়াজুড়েই গণতন্ত্রকে সেরা সরকারব্যবস্থা হিসেবে ভাবার পক্ষে জনমত তৈরি হয়। ১৯৯৫ সালের মধ্যে বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই গণতন্ত্রে পরিণত হয়। ধীরগতিতে হলেও পরের কয়েকটি দশকে গণতন্ত্র সারা বিশ্বে প্রসারিত হয়।

তাহলেও, বিপরীত বাতাসে গণতন্ত্রের উড়ালের চলতি অবস্থারও কয়েক বছর আগে আমি গণতান্ত্রের অগভীরতা ও মেকিপনার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হতে শুরু করছিলাম। এর কিছুটা এসেছে লাতিন আমেরিকার গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা এবং গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব বিষয়ে আমার বাড়তে থাকা উদ্বেগ থেকে। তাদের আগেকার গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভৌগোলিক নৈকট্য, গণতান্ত্রিক সুরক্ষার জন্য আঞ্চলিক কাঠামো এবং নিম্নমধ্যম পর্যায়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুবাদে, শুরুর দিকে লাতিন গণতন্ত্রকে সুবিধাপ্রাপ্তই মনে হচ্ছিল। অনেক বছর আগের একটি স্মৃতি আমার মনে রয়ে গেছে। ১৯৮৬ সালের শেষের দিকে আমেরিকার কার্টার সেন্টার আয়োজিত গণতন্ত্র সম্মেলনে গুয়াতেমালার প্রেসিডেন্ট ভিনিসিও সেরেজো ঘোষণা করেছিলেন, 'আমার দেশে ক্ষমতার ১০ শতাংশ আমার হাতে রয়েছে'। এটা শুনে আমার এক কঠিন বোধোদয় ঘটেছিল। বাকি ক্ষমতা, তিনি বলেছিলেন, সেনাবাহিনী ও বিভিন্ন গুপ্ত সংস্থা এবং ধনী এলিটদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। গণতন্ত্রের বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলো কতটা বাস্তব ও কার্যকর হতে পারে, যখন সেসব আড়ালের শক্তি, যেমন সামরিক ক্ষমতার 'সংরক্ষিত এলাকা', আঞ্চলিক মাফিয়া ও কর্তাদের 'জমিদারি ছিটমহল'-এর বশে থাকে? ১৯৯৩ সালে, লাতিন

আমেরিকার আইনি রাষ্ট্রব্যবস্থার সীমিত এখতিয়ারের বিষয়ে গুইলারমো ও'ডোনেল সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কেননা, এর বাইরে রয়েছে বিস্তীর্ণ 'ধূসর এলাকা', যা আইনবহির্ভূত কিন্তু 'পরিবারতন্ত্র', 'রাজকীয়' কিংবা নিছক 'গুন্ডা ধরনের' শক্তির দ্বারা বেশ কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এসব হলো 'চরম সহিংস' এবং মাৎস্যন্যায়ের জগৎ। এই জগৎ এমন এক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সহাবস্থান করে টিকে থাকে, জাতীয় রাজনৈতিক কেন্দ্রে যে ব্যবস্থা চেহারায় অন্তত গণতান্ত্রিক।' ১৯৯০-এর দশকে লাতিন আমেরিকার গণতন্ত্র সম্পর্কে আমার যে মূল্যায়ন, তা থেকে এই অঞ্চলের 'গণতন্ত্রের অনুদার চরিত্র' আমাকে একই রকমভাবে ভাবিয়ে তোলে। আমি বলেছিলাম, অগভীর গণতন্ত্র একটি দেশের সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ভাঙনের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। এ ছাড়া গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না থাকলে, এবং প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সামাল দিতে না পারলে সেই গণতন্ত্র নিরাপদ হতে পারে না। এরপরে, লাতিন আমেরিকার কিছু দেশ এগিয়ে গেলেও অন্যরা পিছিয়ে গেছে। কিন্তু গণতন্ত্র থেকে গেছে খণ্ডিত, সমস্যাগ্রস্ত ও বৈরী বাস্তবতায়, সম্প্রতি আরও বেশি করে তা উন্মোচিত হচ্ছে।

যখন অনাচারের রাজত্ব চলে, দুর্নীতি প্রবল আর রাষ্ট্র দুর্বল হয়, গণতন্ত্রকে সুসংহত করা তখন অসম্ভব। ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, সুশাসন—আগ্রাসী শাসনের বিপরীতে সুশীল শাসন—গণতন্ত্রের দীর্ঘমেয়াদি বিকাশের চাবিকাঠি। খারাপ ও গলদভরা গণতন্ত্র হলো ঘটবার অপেক্ষায় থাকা দুর্ঘটনা। একপর্যায়ে, সেখানে কোনো সংকট বা গণতন্ত্রবিরোধী শক্তি—যেমন সেনাবাহিনী বা কোনো বিদ্রোহী আন্দোলন অথবা ভ্লাদিমির পুতিন বা হুগো শাভেজের মতো বক্তৃতাবাজ দাপুটে নেতার আবির্ভাব ঘটে এবং তারা গণতন্ত্রকে পরাস্ত করে। গণতান্ত্রিক উন্নয়নের জন্য যদি কোনো পবিত্র পাত্র (Holy Grail) থেকে থাকে, আমার দৃষ্টিতে সেটা হলো সুশাসন।

কিন্তু দুর্বল আইন, আদালত, আমলাতন্ত্র এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিস্থিতি থেকে কীভাবে সুশাসনের বিকাশ হয়? এটা একমাত্র সম্ভব নেতৃত্ব, সংগঠন ও সংস্কারবাদী জোটের সচেতন প্রয়াস এবং কখনো কখনো অন্যান্য রাষ্ট্র ও বাইরের প্রতিষ্ঠানের সহায়তার মাধ্যমে। রাজনৈতিক ও নাগরিক সংস্থা, কৌশল ও বাছাই—অথবা রাজনীতি বিজ্ঞানের অধুনা বিরল শব্দ 'নেতৃত্ব' আসলেই গুরুত্বপূর্ণ। বেশির ভাগ সাফল্যের গল্পগুলো সাধিত হয়েছে সেই সব নেতার দ্বারা (তাঁরা হয়তো নিষ্কলুষ নন), যাঁরা দক্ষ

ও নিবেদিত এবং যাঁরা গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধ, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। জোট গঠন ও তাকে প্রসারিত করা এবং প্রতিষ্ঠানকে ধীরে ধীরে শক্তিশালী করার বিষয়ে তাঁরা সচেতন। অনেক পণ্ডিতই জোরের সঙ্গে বলে থাকেন যে রাজনৈতিক 'প্রতিনিধিত্বের' সুযোগ অনেক সময়ই কাঠামোগত অবস্থা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা দ্বারা কঠোরভাবে সীমিত। কিন্তু গণতন্ত্রের টিকে থাকায় সহায়ক এই সব প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলোই (প্রতিনিধিত্বমূলক দল, উপযুক্ত নির্বাচনী ব্যবস্থা, অন্তর্ভুক্তিমূলক নিয়ম, সক্ষম রাষ্ট্র, স্বাধীন আদালত) ছিল আশু অতীতের সরকার ও সুশীল সমাজের নেতাদের রাজনৈতিক নৈপুণ্যের ঐতিহাসিক ফসল।

তা সত্ত্বেও, গণতন্ত্রের উত্থান অথবা পতন বৈশ্বিক শূন্যতার মধ্যে ঘটে না। হান্টিংটনের ১৯৯১ সালের সাড়াজাগানো বইয়ের নাম *দ্য থার্ড ওয়েভ*। বইটির মূল অবদানের একটি হলো, প্রচলিত রীতিনীতি, ধ্যানধারণা, মডেল ও প্রবণতা এবং শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশের নীতি ও পদক্ষেপের পেছনে ক্রিয়াশীল আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের গুরুতর প্রভাব দেখানো এবং স্বৈরতন্ত্রের তুলনায় সেগুলোর শক্তিমত্তা স্পষ্ট করা। মুক্তির ধারণার বৈশ্বিক নিয়তি ঠিক হয়েছে এসবের মাধ্যমেই। তৃতীয় তরঙ্গের সময়ে, কোনো অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের চাপ, কূটনৈতিক সম্পর্ক ও সমর্থন সফল গণতান্ত্রিক রূপান্তরের দিকে (অথবা গণতন্ত্রের বিলয় ঠেকাতে) ভারসাম্য বজায় রেখেছিল। পরবর্তীকালের একটি তুলনামূলক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যেসব দেশে সফল গণতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটেছিল, সেসব দেশে পশ্চিমা প্রাযুক্তিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ, বুদ্ধিবৃত্তিক যোগাযোগ, কূটনৈতিক চাপ এবং স্বাধীন মিডিয়া ও এনজিওগুলোকে দেওয়া আর্থিক সহায়তা বড় ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু যেখানে এসব অনুঘটকের ভূমিকা দুর্বল ছিল, সেখানে রূপান্তর ব্যর্থ হয়েছে।

এজেন্সি বা মধ্যস্থতার ভূমিকা বুঝলে গণতন্ত্রের পরিণতি নিয়ে এই ফাঁকা আশাবাদ আসে না যে একবার 'সংহত' হয়ে গেলে গণতন্ত্র টিকবেই। ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে, যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কয়েকটি পশ্চিমা গণতন্ত্রে রাজনৈতিক অবক্ষয়, অবিশ্বাস এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার অবনতি দেখা যায়। ১৯৯৫ সালে রবার্ট পুটনাম 'Bowling Alone' শিরোনামে প্রবন্ধ লিখে এই সমস্যার একটা বিশেষ দিকে দৃষ্টিপাতের ডাক দেন। তা হলো, আমেরিকার ক্ষয়িষ্ণু সামাজিক পুঁজি। আমাদের *জার্নাল অব ডেমোক্রেসি* পত্রিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি পঠিত নিবন্ধগুলোর একটি হলো এই লেখা। একই বছর হুয়ান

লিঞ্জ, সেম্যুর মার্টিন লিপসেট এবং আমি হুঁশিয়ারি জানাই :

সংহতকরণকে এককালীন অপরিবর্তনীয় প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা বিপজ্জনক ভ্রান্তি। গণতন্ত্র আসে ও যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা বৈধ, প্রাতিষ্ঠানিক এবং দৃঢ় হতে পারে। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর যেহেতু পতন হয় এবং গণতান্ত্রিক বিশ্বাস ও চর্চা ক্ষয় পায়, সেহেতু এসব নেতিবাচক প্রবণতাও কিন্তু সংহত হয়ে যেতে পারে...এমনকি প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রেও এমন বুলিবাজ নেতা থাকতে পারেন, সমাজের ব্যর্থতার জন্য যাঁরা খোদ গণতন্ত্রকেই দায়ী করেন। গুরুতর সামাজিক সংকট এবং সরকারের দীর্ঘস্থায়ী অকার্যকারিতা ও দুর্নীতির প্রেক্ষাপটে এই বুলিবাজরা বিপুলসংখ্যক অনুসারী পাবেন না, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই।

গণতন্ত্রের দ্রুততর পশ্চাদপসরণ

১৯৯৬ সালে আমি একটি সম্ভাবনার কথা তুলেছিলাম যে ভোটের হারের নিম্ন দশা এবং বাদবাকি উদারনৈতিক অংশের মধ্যে বাড়তে থাকা ব্যবধানের কারণে গণতন্ত্রের তৃতীয় তরঙ্গ স্থবির বা পশ্চাৎমুখী হয়ে যেতে পারে। তৃতীয় তরঙ্গের অনেক গণতন্ত্রই (অথবা পাকিস্তানের মতো নামকাওয়াস্তে গণতান্ত্রিক বলে চিহ্নিত) সাংবিধানিক রীতিনীতির ওপর এলিটদের আঘাতে ভুগতে ভুগতে উপরিস্তরেই থমকে গিয়েছিল অথবা তাদের 'তিলে তিলে মৃত্যু ঘটছিল'। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গভীর ও শক্তিশালী করা না হলে অনেক দেশের গণতন্ত্রই ব্যর্থ হয়। আমি তখন যুক্তি দিয়েছিলাম (এবং এখনো দিই) যে প্রতিষ্ঠিত উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো 'বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রের উন্নয়ন চালিয়ে যাওয়ার' পাশাপাশি 'গণতন্ত্রকে চাঙা রাখা, সংস্কার চালানো এবং সুশাসনের' ক্ষেত্রে তাদের ধারাবাহিক সামর্থ্যের পরিচয় না দিলে গণতন্ত্র গভীরে পৌঁছাবে না।

আমার অনেক বাজে আশঙ্কা ফলে গেছে দেখে আমি খুশি হচ্ছি না। পাকিস্তানের নাজুক 'গণতন্ত্র' ১৯৯৯ সালের সামরিক অভ্যুত্থানে পতিত হয়েছে। সে সময় যেসব গুরুত্বপূর্ণ গণতন্ত্র নিয়ে চিন্তা হতো, সেগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ও তুরস্ক পরিষ্কারভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এর বাইরে রয়েছে দোদুল্যমান দেশ, যেমন শ্রীলঙ্কা। অথবা কিছু ক্ষেত্রে তাদের শাসনের চারিত্রিক অস্পষ্টতা প্রবেশ করেছে 'ধূসর এলাকায়' (যেমন ফিলিপাইন)। ১৯৯৯-এর দিকে যে ৩০টি দোদুল্যমান রাষ্ট্রকে আমি চিহ্নিত করেছিলাম, সেগুলোর মধ্যে কেবল তাইওয়ান ও চেক প্রজাতন্ত্র উচ্চস্তরের উদার গণতন্ত্র বজায় রেখেছে অথবা মূলগতভাবে সেই

লক্ষ্যের দিকে এগিয়েছে। কোনো না কোনোভাবে দক্ষিণ কোরিয়া এবং বুলিবাগীশ জনতুষ্টিবাদী ও রক্ষণশীল নেতা ও দলের হাতে পড়ে ভারত, ব্রাজিল ও পোল্যান্ডের গণতন্ত্র গুরুতরভাবে পিছিয়ে গেছে। বাংলাদেশ ও তুরস্ক ছাড়াও রাশিয়া ও থাইল্যান্ডে গণতন্ত্র চূর্ণ হয়েছে। পাশাপাশি চিলিতে তীব্র রাজনৈতিক মেরুকরণ, দক্ষিণ আফ্রিকায় দুর্বল সুশাসন এবং রাশিয়ার হস্তক্ষেপ ও আগ্রাসনের কারণে ইউক্রেনীয় গণতন্ত্র আবার হুমকির মুখে পড়েছে।

এই ঘটনাগুলো গণতন্ত্রের বিপর্যয়ের আংশিক তালিকা দেয় মাত্র। সামগ্রিকভাবে, আসলে ২০০৬ সালের আগে বৈশ্বিক গণতান্ত্রিক মন্দা শুরু হয়নি। তারপর থেকে, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মাত্রা লাগাতারভাবে পাতলা হয়ে এসেছে। অল্প কিছু দেশ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিণত হলেও, অধিকাংশ দেশেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা (প্রায় সবই উদারপন্থী) ভেঙে গেছে। বেশ কয়েকটি উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের গুণমান হ্রাস পেলেও হাঙ্গেরিতে গণতন্ত্র একদম পর্যুদস্ত হয়েছে। এ ছাড়া পেরুর মতো বেশ কয়েকটি নির্বাচনী গণতন্ত্রও সুতোর ওপরে ঝুলে আছে। আরবের একমাত্র গণতন্ত্র তিউনিসিয়া নির্বাহী অভ্যুত্থানের শিকার হয়েছে। এবং আফ্রিকার সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঘানা ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি ও অসন্তোষের ভারে অবনত। কম্বোডিয়া, নিকারাগুয়া ও উগান্ডার মতো বেশ কিছু প্রতিযোগিতামূলক কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার কোনো লেশমাত্র আর নেই। চীন ও রাশিয়ার মতো শক্তিশালী কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার পাশাপাশি মিসর, ইরান ও সৌদি আরবও এখন মেরুকরণ আর অবক্ষয়ের দিকে পিছল গতিতে ধাবিত হচ্ছে। পরিশেষে যুক্তরাষ্ট্রের মতো কিছু নেতৃস্থানীয় উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি ও আস্থা টিকিয়ে রাখার বদলে, উদ্বেগজনকভাবে রাজনৈতিক মেরুকরণ ও ক্ষয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে।

গণতান্ত্রিক মন্দা এক দশক ধরে এতটাই সূক্ষ্ম, ধীর ও মিশ্র ছিল যে এটি আদৌ ঘটছে কি না, তা নিয়ে বিতর্ক করা যৌক্তিকই ছিল। কিন্তু সময় পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা বাদ দেওয়া কঠিনতর হয়ে উঠেছে। স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী প্রথম ১৫ বছরের দৃষ্টান্তগুলোর উল্টা দিকে ফিরে তাকালে আমরা দেখতে পাই, গত ১৫ বছরের প্রতিবছরে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অর্জনের বদলে অনেক দেশে তা হ্রাস পেয়েছে। আমার হিসাবে যেসব রাষ্ট্রে গণতন্ত্র ছিল (১ মিলিয়নের বেশি জনসংখ্যার দেশগুলোতে) ২০০৬ সাল নাগাদ তা সর্বোচ্চ ৫৭ শতাংশে পৌঁছেছিল এবং এর পর থেকে ক্রমাগত তা হ্রাস পেয়েছে (১৯৯৩ সালের পর ২০১৯ সালে প্রথমবারের মতো তা ৪৮ শতাংশে নেমে যায়)।

এখন প্রতিটি বার্ষিক বৈশ্বিক মূল্যায়ন গুরুতর নিম্নগামী দশার ব্যাপারে আমাদের সাবধান করে। যেমন সাম্প্রতিক সময়ে ফ্রিডম হাউস সমীক্ষার শিরোনাম হলো, 'অবরোধে গণতন্ত্র'। ভ্যারাইটিজ অব ডেমোক্রেসি (ভি-ডেম) প্রতিবেদনের শিরোনাম, 'মহামারি আকারে স্বৈরাচারায়ণ'। ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের ২০২০ সালের গণতন্ত্র সূচকে দেখা গেছে, কোভিড-১৯ মহামারির চাপে প্রায় ৭০ শতাংশ দেশে গণতন্ত্রের মাত্রা হ্রাস পেয়েছে। ২০০৬ সাল থেকে চলে আসা এই সূচকের ইতিহাসে বৈশ্বিক গড় এই প্রথম সর্বনিম্ন স্তরে নেমে আসে।

সম্প্রতি আমরা যখন গণতন্ত্রের অধোগতির আরও একটা আশঙ্কাজনক পর্বে প্রবেশ করেছি, তখন হান্টিংটন কথিত উল্টা তরঙ্গের কথাও আমাদের মনে পড়ে। গড় পরিসংখ্যানের চেয়ে সমস্যাটা দেখা দিয়েছে গুণগত প্রবণতায়। সেগুলো কোথায় হচ্ছে, সেটাও দেখার বিষয়। বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল গণতন্ত্র ভারতে উদার গণতন্ত্রের আদর্শিক ও সাংবিধানিক ভিত্তিগুলো, যেমন রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বহুত্ববাদ; জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি সহনশীলতা; বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আমলাতান্ত্রিক পেশাদারত্ব এবং গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের স্বাধীনতা ব্যাপক আক্রমণের মুখে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার এমন এক পথ অনুসরণ করছে, যার সঙ্গে আতঙ্কজনক মিল তুরস্কের মতো দেশের, যেখানে গণতন্ত্র ক্রমেই লোপ পাচ্ছে। উদীয়মান বিরাট বাজার এবং চীনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো কৌশলগত গুরুত্বধারী হওয়ার কারণে মুখ্য কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই ভারতকে হুঁশিয়ার করতে চায় না। বৈশ্বিক দক্ষিণের অন্যান্য বৃহৎ ও প্রভাবশালী গণতন্ত্রও একই সঙ্গে কর্তৃত্ববাদী ও জনতুষ্টিবাদী নেতাদের কারণে বিপদাপন্ন (ব্রাজিল ও মেক্সিকোতে)। দুর্বল প্রতিষ্ঠান এবং ক্রমবর্ধমান সামাজিক চাপের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশও সমস্যাকবলিত। ফিলিপাইন সম্ভবত আগামী বছরের নির্বাচনে দেশটির শেষ স্বৈরশাসক ফার্দিনান্দ মার্কোসের পুত্রকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করবে। সম্ভবত এর মাধ্যমেই দেশটি আবার স্বৈরতন্ত্রের চক্রে ফিরে যাবে।

বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের এই পিছু হঠাকে আরও ইন্ধন জোগাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্রের ধীর কিন্তু মর্মান্তিক অধঃপতন। ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট একে বলেছে 'ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র'। একই ধরনের চাপ যেমন টলায়মান অর্থনীতি, ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, অভিবাসনের তোড়, পরিচয় বিভাজন এবং সোশ্যাল

মিডিয়ায় এসবের ফেটে পড়া প্রতিক্রিয়ার খপ্পরে পড়ে মার্কিন গণতন্ত্রও ভিন্নভাবে ক্ষয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিদলীয় মেরুকরণ, বক্তৃতাবাজ শক্তির চাতুরীতে পড়ে হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, তুরস্ক ও ভেনেজুয়েলার মতো একই বিষাক্ত পতনের পথ অনুসরণ করছে। জেনিফার ম্যাককয় ও মারাট যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, বিভক্তকারী সামাজিক শক্তি ও রাজনৈতিক কৌশলাদি গভীর সামাজিক ফাটল তৈরি করে। তৈরি হয় 'আমরা বনাম তারা' ধরনের আন্তগোষ্ঠীয় যুক্তি। এভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যকার সামাজিক বন্ধন নষ্ট হয়; সেমুর মার্টিন লিপসেটসহ ও অন্য পণ্ডিতেরা যে বন্ধনকে গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। নিজ নিজ গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য ও আদান-প্রদানের চৌহদ্দি যত মজবুত হয়, তত গভীরভাবে বিভাজিত রাজনৈতিক শিবিরগুলোর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার জায়গা নেয় অবিশ্বাস, বাঁধা বুলি, পক্ষপাত ও শত্রুতা। প্রতিটি পক্ষ একে অপরকে অস্তিত্বের হুমকি হিসেবে দেখে, চাপ বোধ করে এবং তা থেকে নষ্ট হয়ে যায় গণতান্ত্রিক নিয়ম ও রীতিনীতি। উইলিয়াম গ্যালস্টন দেখান, উদার গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থাকা গভীর টানাপোড়েন জাতীয়তাবাদ ও ঐতিহ্যবাদের ফিরে আসার কারণে আরও নাজুক হয়ে যায়। ব্যক্তিবাদের প্রতিক্রিয়ায় তৈরি হয়েছে আরও নিবিড় সমাজের আকাঙ্ক্ষা। কল্যাণবাদ মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। বৈচিত্র্য একতার চাহিদার জন্ম দিচ্ছে; চলছে দৃঢ় নেতৃত্বের জন্য ক্লান্তিকর দর-কষাকষি।

কেবল রাজনৈতিক আচরণই যুক্তরাষ্ট্রকে সাংবিধানিক সংকটের কিনারে নিয়ে গেছে, তা নয়। দুই দলের রাজনৈতিক শিবিরের মধ্যে এমন মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির লোকের অনুপাত এতটাই বেড়ে যাচ্ছে, তা হয়ে উঠেছে গণতন্ত্র ধ্বংসের বিপৎসংকেত। উভয়ের মধ্যে কোনো সাধারণ রাজনৈতিক ভূমি আর নেই। পিউ রিসার্চ সেন্টারের করা অক্টোবর ২০২০ জরিপে দেখা গেছে, 'উভয় দলের দশের মধ্যে আটজন নিবন্ধিত ভোটার বলেছেন যে অন্য পক্ষের সঙ্গে তাদের ভিন্নমত মূলত মৌলিক আমেরিকান মূল্যবোধের ব্যাপারে। উভয় দলের দশজনের মধ্যে নয়জনই আবার চিন্তিত যে প্রতিপক্ষের বিজয় যুক্তরাষ্ট্রকে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতির দিকে নিয়ে যাবে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারির একটি সমীক্ষায় সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে গভীর পক্ষপাতমূলক বিভাজন নথিভুক্ত হয়েছে। সমীক্ষাটিতে বেশির ভাগ রিপাবলিকান ব্যাপক ভোট জালিয়াতির সন্দেহ প্রকাশ করলেও খুব কম ডেমোক্র্যাটই তা বিশ্বাস করেন। এমনকি নির্বাচিত নেতারা 'আমেরিকাকে রক্ষা করতে' ব্যর্থ হলে ১০ জন

আমেরিকানের মধ্যে প্রায় ৩ জন (২৯ শতাংশ) এবং ৩৯ শতাংশ রিপাবলিকানই 'জনগণের দ্বারা সহিংস কর্মকাণ্ড' সমর্থন করার জন্য প্রস্তুত।

যুক্তরাষ্ট্রে বিপুলসংখ্যক রাজনীতিবিদ এবং নির্বাচিত কর্মকর্তা ক্ষমতা অর্জন বা ধরে রাখার চেষ্টায় গণতান্ত্রিক নিয়মকানুন অমান্য বা খর্ব করতে রাজি অবস্থায় আছেন। ক্ষমতা ধরে রাখার বেলায় এবং ক্ষমতাসীন দলের চারপাশে ব্যারিকেড তৈরি করাকে তাঁরা তাঁদের স্থায়ী অধিকার মনে করেন। এ জন্য ভোটদানের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা, নির্বাচনী প্রশাসনের রাজনীতিকরণ এবং উত্তরোত্তর বেশি হারে নির্বাচনের ফল বদলে দেওয়ার উপযোগী হঠকারী ও বৈজ্ঞানিক কূটকৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটলে ৬ জানুয়ারির বিদ্রোহের পরও বেশির ভাগ আমেরিকান এখনো বুঝতে সক্ষম হয়নি যে গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে ন্যূনতম আদর্শিক ও আচরণগত সমঝোতা জরুরি, তার থেকে দেশ কতটা দূরে সরে গেছে। রবার্ট এ ডাহল একে 'পারস্পরিক নিরাপত্তাব্যবস্থা' বলে অভিহিত করেছেন, যেখানে প্রতিযোগী রাজনৈতিক শক্তিরা পরস্পরকে সহ্য করতে এবং নিয়ম অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে গণতন্ত্রের খেলায় অংশ নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গণতন্ত্রের সব বিশেষজ্ঞই প্রতিযোগীদের জন্য গণতন্ত্রের মৌলিক প্রয়োজনীয় দিকগুলো চিহ্নিত করেছেন, সেগুলো হলো : ১) রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বৈধতা স্বীকার করা এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার নিশ্চিত করা; ২) বিশ্বাস করাতে হবে যে প্রতিদ্বন্দ্বীরা ক্ষমতাসীন হয়ে তাদের নির্মূল করবে না; এবং ৩) সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত নির্বাচনের ফল মেনে নেওয়া। স্টিভেন লেভিটস্কি ও ড্যানিয়েল জিব্ল্যাটের ভাষায়, এসবের জন্য 'শুধু পরমতসহিষ্ণুতা' থাকলেই হবে না, বরং দরকার রাজনৈতিক 'সহনশীলতা'—ক্ষমতা প্রয়োগে সংযম, সহিংসতা প্রত্যাখ্যান এবং গণতন্ত্রের অলিখিত নিয়ম ও পরিসরগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা। এই প্রধান দুটি রীতি শিথিল হয়ে যাওয়ায়, গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রের সংহতি দুর্বল হতে শুরু করেছে এবং পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তা ভেঙে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

পুনরুত্থিত কর্তৃত্ববাদ

আমার দীর্ঘকালীন সহসম্পাদক মার্ক প্ল্যাটনার পত্রিকার ত্রিশতম বার্ষিকী সংখ্যায় তাঁর পর্যবেক্ষণ জানাচ্ছেন, 'আমরা পুনরায় সেই পাঠটি শিখছি যে গণতন্ত্রের ভাগ্যের জন্য ভূরাজনীতি গভীরভাবে গুরুত্বপূর্ণ।' চার্লস ক্রাউথ্যামার যাকে 'একক মেরুর মুহূর্ত' বলে অভিহিত করেছিলেন, গণতান্ত্রিক সম্প্রসারণের

সেই তুমুল '৯০-এর দশকটিও কোনো কাকতালীয় ঘটনা ছিল না। কেননা, যুক্তরাষ্ট্র তার পশ্চিমা মিত্রদের সহায়তায় 'বিশ্বশক্তির কেন্দ্রে' 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তি' হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। ইতিমধ্যে ১৯৭০ দশকে, বিশেষ করে ১৯৮০ দশকে যুক্তরাষ্ট্র তার শক্তি ও সদিচ্ছা নিয়ে মানবাধিকার রক্ষা ও গণতন্ত্র বিস্তারের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। এ ঘটনা গণতান্ত্রিক রূপান্তরের আন্দোলনে আশা জাগিয়েছিল এবং স্বৈরশাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। এরপর, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং অন্যান্য শক্তিশালী স্বৈরতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় মিত্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন অদৃষ্টপূর্ব মাত্রায় গণতন্ত্র বিস্তারে সাহায্য ও সমর্থন জুগিয়ে যায়। দুনিয়াজুড়েই গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ জোরদার, নৈতিকভাবে বন্দিত এবং বস্তুগতভাবে মদদপুষ্ট হয়। বাইরের সাহায্য ও কূটনৈতিক সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল স্বৈরশাসকেরা গণতন্ত্রায়ণের অপ্রতিরোধ্য চাপে পড়ে বিদায়ের পরিকল্পনা নিতে অথবা নির্বাচনে হেরে গেলে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়।

ক্রাউথ্যামার ভেবেছিলেন, ওই 'এককেন্দ্রিক মুহূর্ত' দশকের পর দশকজুড়ে চলবে। অথচ এটা এক দশকের সামান্য বেশি দিন টিকেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক গণতান্ত্রিক আধিপত্য প্রথম মারাত্মক আঘাত খায় ২০০৩ সালে ইরাক আগ্রাসনের পরে। এটা ছিল খামখেয়ালিভাবে ক্ষমতার অতি বিস্তারের ফল। এই ঘটনায় গণতন্ত্র রপ্তানির ধারণা মার খায়। দ্বিতীয় আঘাত ছিল ঋণ-বন্ধকি কারবারিদের লোভ এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার নীতিকৌশলের ভুলের পরিণতিতে সৃষ্টি হওয়া ২০০৮ সালের আর্থিক সংকট। যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সংকট বৈশ্বিক অভিঘাত ফেলায়, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী গণতন্ত্রের সুনাম আরও নষ্ট হলো। আর্থিক সংকটে জেরবার অবস্থা এবং মানবাধিকারের প্রতি গভীর দার্শনিক অঙ্গীকার ও সহজাত বাস্তববোধের মধ্যে টানাটানির মধ্যে পড়ে সেসময়কার মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা একটা মধ্যপন্থা নিলেন। তাতে গণতন্ত্রে উত্তরণের মার্কিন নীতির 'আংশিক পুনরুজ্জীবন' হলো মাত্র। ওবামা যদিও গণতান্ত্রিক সহায়তা চালিয়ে গেলেন, গণতন্ত্রের পিছু হটা নিরুৎসাহিত করায় কাজ করলেন এবং মাঝেমধ্যে গণতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটাতে চাপও দিলেন, তারপরও যুক্তরাষ্ট্র আর স্বৈরতন্ত্রের গণতন্ত্রায়ণের মুখ্য শক্তি রইল না। দুনিয়াকে আরও গণতান্ত্রিক করে তোলায় মার্কিন নেতৃত্বের সোনালি যুগ প্রায় শেষের কাছে চলে এল।

দুটি কাঠামোগত কারণ ওবামার নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র ও গণতন্ত্রকে এগিয়ে নেওয়ার বাধা হয়ে উঠেছিল। একটি ছিল মার্কিন রাজনীতির গভীর মেরুকরণ;

তা পরে গণতন্ত্রের মডেল হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের আবেদন আরও কমিয়ে দেয় (এবং আগামী বছরগুলোতে আরও নাটকীয়ভাবে এই আবেদন কমতে থাকবে)। আর দ্বিতীয়টি ছিল স্বৈরতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী পুনরুত্থান : যেমন চীনের বর্ধিত শক্তি, আক্রমণাত্মক ও বিদ্বেষী রাশিয়ার প্রত্যাবর্তন, বিভিন্ন দেশের স্বৈরাচারী শাসকদের চতুর কায়দায় অভিযোজনের কৌশল শিখে যাওয়া, বিভিন্ন যৌথ নেটওয়ার্কে নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান চালানো এবং নিয়ম-বিরুদ্ধ উদ্যোগ নেওয়া।

ক্ষমতা ও বৈধতা

একুশ শতকের কোনো পরিবর্তনই গণতন্ত্রের বৈশ্বিক অবস্থানের অতটা ক্ষতি করেনি, যতটা করেছে বিশ্বের পরবর্তী পরাশক্তি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের আবির্ভাব। চীনের রয়েছে বিশ্বের মধ্যে দ্রুতবর্ধনশীল সেনাবাহিনী, বৈশ্বিক প্রচারণা যন্ত্র, বৈশ্বিক অবকাঠামো উন্নয়নের কর্মসূচি—বেল্ট অ্যান্ড রোড। বেল্ট অ্যান্ড রোডে মহাসড়ক, রেলপথ, বন্দর, জ্বালানি পাইপলাইন এবং ষাটটি দেশে বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে জড়ানো এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ২০০ বিলিয়ন ডলার।

চীন এখন আমেরিকাকে ছাড়িয়ে গিয়ে ইউরোপ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকারর বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার হয়ে উঠেছে। চীন রাশিয়াসহ আরও কয়েকটি কর্তৃত্ববাদী দেশের সঙ্গে মিলে জাতিসংঘের ১৫টি বিশেষ সংস্থার ৪টিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তারা এসবের মাধ্যমে বর্তমান মানবাধিকারকেন্দ্রিক নীতিমালার অবনমনে জোরের সঙ্গে কাজ করার পাশাপাশি বর্তমান বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে, যেমন জাতিসংঘ ও এর মানবাধিকার পরিষদে সুশীল সমাজের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ কঠিন করে তুলছে। এসবের মাধ্যমে তারা বর্তমান আন্তর্জাতিক আইনকে এমনভাবে বদলে দিতে চাইছে, যাতে করে স্বৈরতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং ডিজিটাল নিপীড়নকে নিরাপদ করা যায়। চীন এখন পৃথিবীর প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল মুদ্রা তৈরিতে নেমেছে, যাতে করে ডলারের একাধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করা যায় এবং এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইনভঙ্গকারীদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবরোধ চাপানোর ক্ষমতা কমজোরি হয়ে যায়।

ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব ও সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চীন সাবেকি কমিউনিস্টদের 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের কৌশলে গণতন্ত্রের উপরিকাঠামোয়—বিশ্ববিদ্যালয়, থিঙ্কট্যাংক, গবেষণা কেন্দ্র, সংবাদমাধ্যম, শিল্পকলা, করপোরেশন, সামাজিক সংস্থা,

রাজনৈতিক দল ও স্থানীয় সরকার—প্রভাব খাটাতে চাইছে। তাদের এই কার্যক্রমের তিনটি প্রধান লক্ষ্য হলো : ১) বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও সামরিক আধিপত্য কায়েমের লক্ষ্যে পশ্চিমা প্রযুক্তি চুরি এবং সেসবকে নিজেদের সঙ্গে মানানসই করে নেওয়া; ২) স্বদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং বহির্বিশ্বে যুধ্যমান কার্যক্রমকে সেন্সর ও ভয় দেখিয়ে চাপা দিয়ে চীন সম্পর্কে বয়ান নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি নিজেদের মহান ভাবমূর্তি তুলে ধরা; এবং ৩) বিনিময় অংশীদার এবং যুক্তফ্রন্ট মিত্রদের (জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে) চীনের আধিপত্যবাদী প্রবণতাকে আলিঙ্গন করার জন্য চালিত করা এবং বৈশ্বিক ক্ষমতার আমূল পালাবদলের পক্ষে যায়, এমন নীতির জন্য তাদের সরকারের কাছে তদবির করা।

'আপন শক্তি লুকাও এবং নিজের সময়টা কাটাও' চীনা রাষ্ট্রনায়ক দেং জিয়াও পিংয়ের এই ঐতিহাসিক নির্দেশনা উপেক্ষা করে, চীনের স্বৈরাচারী নেতা সি চিন পিং নিজ অঞ্চলে এবং তার বাইরেও উদ্ধত ও যুদ্ধংদেহী আচরণ চালিয়ে যাচ্ছেন। চীন কার্যত সম্পদ-সমৃদ্ধ এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সমগ্র দক্ষিণ চীন সাগরের ওপর সার্বভৌমত্ব দাবি করছে। সেখানে নতুন দ্বীপ গঠন ও সামরিকীকরণ এবং তাইওয়ানের বিরুদ্ধে সামরিক অনুসন্ধান চালিয়ে এই দাবি বাস্তবায়ন করছে। এ ধরনের ক্রিয়াকলাপ, এবং এই অঞ্চলে ও বিশ্বব্যাপী চীনের তীক্ষ্ণ শক্তি* বিস্তারের প্রতিক্রিয়া আছে। যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও জাপানের মধ্যে চতুর্ভুজ কৌশলগত সংলাপের মাধ্যমে সমন্বিত ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। এবং বিশেষ করে জাপান ও অস্ট্রেলিয়া তাদের প্রতিরক্ষা ভঙ্গি ও নজরদারি বাড়াচ্ছে।...কর্তৃত্ববাদ ও লুটেরাতন্ত্র একে অপরের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হয়ে বিশ্বব্যাপী সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন, জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন, আইনের শাসন উচ্ছেদ ও বিরোধী দল দমন করছে। অবৈধ সম্পদ পাচারের মাধ্যমে উন্নত গণতন্ত্রকে দুর্বল করছে। লুটেরাদের দুর্নামের ওপর চুনকাম চালিয়ে তাদের কুকীর্তি আড়াল করছে। অজস্র পশ্চিমা করপোরেশন, পরামর্শক, আইনি সংস্থা, ব্যক্তিগত গোয়েন্দা ও নজরদারি ঠিকাদারেরা এই দূষিত বিশ্ব বাণিজ্যে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছে। এসবের ফলে বিশ্বের স্বৈরাচারীদের দমনমূলক ক্ষমতা, প্রতিশোধের

* (জার্নাল অব ডেমোক্রেসি পত্রিকা 'শার্প পাওয়ার' বা 'তীক্ষ্ণ শক্তি' বলতে চীন ও রাশিয়ার মতো সরকারের আন্তর্জাতিক স্তরে প্রভাব বিস্তারের কৌশলকে বুঝিয়ে থাকে। এসব কৌশলের মধ্যে রয়েছে গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে বাক্‌স্বাধীনতাকে সীমিত করা, সংশয় ছড়িয়ে দেওয়া, গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট করা। এটা করা হয় সেন্সরশিপ এবং কৌশলে বশে আনার মাধ্যমে—সম্পাদক)

নাগাল ও আত্মবিশ্বাস ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও বৈশ্বিক ক্ষমতা লক্ষণীয়ভাবে আলাদা হলেও চীন ও রাশিয়ার শাসকদের মধ্যে চরিত্রগত ও স্বার্থগত গুরুত্বপূর্ণ মিল রয়েছে। উভয়ই নাটকীয়ভাবে গত এক দশকে আরও বেশি নিপীড়ক হয়ে উঠেছে। চীন নব্য-সর্বগ্রাসী নজরদারিমূলক রাষ্ট্রে পরিণত হতে চলেছে আর রাশিয়া রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও ভিন্নমতাবলম্বীদের নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি দিচ্ছে। দুটি ব্যবস্থাই ক্রমেই এক ব্যক্তির শাসনে পরিণত হচ্ছে, যিনি আবার ক্ষমতা হারানোর ভয়ে আরও বেশি করে দমন চালাচ্ছেন, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে উসকে দিচ্ছেন জাতীয়তাবাদ। দুটি ব্যবস্থাই প্রতিবেশী গণতন্ত্রকে হুমকি বলে মনে করে—চীনের বেলায় তাইওয়ান, রাশিয়ার বেলায় ইউক্রেন। উভয়ের বেলাতেই 'সমস্যাজনক' প্রতিবেশীর সঙ্গে তাদের রয়েছে ব্যাপক সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত মিল। তাদের ভয়, এই মিলের কারণে নিজ দেশের মানুষও প্রতিবেশীদের মডেল অনুসরণে গণতন্ত্রী ও বহুত্ববাদী হয়ে পড়বে। উভয় স্বৈরতন্ত্রেরই লক্ষ্য প্রতিবেশীদের আগেই তাদের ওপর অন্তর্ঘাত চালানো। উভয় নেতা—এবং তাঁদের শাসন ব্যবস্থা—পাশ্চাত্যকে প্রচণ্ড ঘৃণা করেন এবং তাঁদের অপছন্দের এই উদারনৈতিক বিশ্বব্যবস্থাকে উল্টে দিতে চান। উভয়ই বিশ্বাস করেন যে আমেরিকান গণতন্ত্র এবং আরও বড় আকারে পশ্চিমা গণতন্ত্র হলো দুর্বল ও অসংহত। সুতরাং এদের বাঁকানো, চ্যালেঞ্জে ফেলা এবং একদিন সফলভাবে পরাস্ত করা সম্ভব। একসঙ্গে এবং আলাদা আলাদাভাবে চীন ও রাশিয়া কর্তৃত্ববাদী শাসকদের আঁতাতমূলক নেটওয়ার্ক লালন করে। উভয়ই বৈশ্বিক ক্ষমতার ভারসাম্য নিজেদের পক্ষে আনার অভিলাষী।

এসব কারণে তাইওয়ান ও ইউক্রেন হয়ে পড়েছে বৈশ্বিক স্বাধীনতা রক্ষার সমররেখা। শক্তিশালী প্রতিবেশীর আগ্রাসনের মাধ্যমে দুই গণতন্ত্রের যেকোনোটির পতন হবে ইতিহাসের মোড় ফেরানো ঘটনা। শীতল যুদ্ধের ছায়া-লড়াই নয়; এর সঙ্গে তুলনীয় কেবল চেকোস্লোভাকিয়ায় নাৎসি বাহিনীর আগ্রাসন। গত কয়েক দশকজুড়ে আমরা গণতন্ত্রের সংগ্রামকে নিছক রাজনৈতিক ও বেসামরিক ভাবায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, ১৯৩০ দশকের মতোই, বর্তমান বিপদের মধ্যে লক্ষণীয় সামরিক হুমকির উপাদান রয়েছে। এই হুমকি মোকাবিলার জন্য ওই দুটি গণতান্ত্রিক রণক্ষেত্র—দেশ কিংবা বিশ্বের সবচেয়ে উদার গণতন্ত্রগুলো মনস্তাত্ত্বিকভাবে, সামরিকভাবে এবং সরবরাহ লাইনের নিরাপত্তার দিক থেকে যথেষ্টভাবে প্রস্তুত নয়।

ক্ষমতা ও বৈধতা

বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের পুঞ্জীভূত সংকটের মোক্ষম সমাধান হতে পারে এর মূল দুই প্রতিপক্ষ রাশিয়া এবং বিশেষ করে চীনকে যদি গণতন্ত্রী করে তোলা যায়। ১৯৯০-এর দশকে রাশিয়ার উঠতি গণতন্ত্রের ব্যর্থতা আসলে পূর্বনির্ধারিত ছিল না। সম্প্রতি মাইকেল ম্যাকফাউল ব্যাখ্যা করেছেন যে জরাজীর্ণ বরিস ইয়েলৎসিনের উত্তরসূরি বাছাই করা ছিল মূলত সাক্ষাৎ বিপদ এড়ানোর ব্যবস্থা। বৈশ্বিক আর্থিক মন্দা এবং সংস্কারপন্থী উপপ্রধানমন্ত্রী বরিস নেমৎসভের নেতৃত্বে মুক্তবাজারীকরণের কারণে ১৯৯৮ সালের আগস্টে রাশিয়ার ভঙ্গুর অর্থনীতিতে ধস নামে। যদি এসব না ঘটত, তাহলে হয়তো একটা ভিন্ন পরিস্থিতি কল্পনা করা যেত। নেমৎসভ যদি ইয়েলৎসিনের স্থলাভিষিক্ত হতেন, তাহলে হয়তো ধীরে ধীরে রাশিয়ায় একটি অপূর্ণ কিন্তু প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। পুতিনের একনায়কত্ব এখন নির্মম এবং অপ্রতিরোধ্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তাঁর নেতৃত্বের প্রতি জনগণের আস্থা তো কমছেই, তার ওপর পুতিনের শাসনব্যবস্থার আত্মবিশ্বাসও কমে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। বিপরীতে, ১৯৮৯ সালের তিয়েনআনমেন স্কয়ারে গণহত্যার পর থেকে চীনের কমিউনিস্ট শাসন বিরাট অর্থনৈতিক সাফল্য এবং দক্ষ নিয়ন্ত্রণের বৃহৎ যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। তা হলেও চীনা শাসকগোষ্ঠী বহুবিধ দোলাচলের মুখে পড়ছে। এর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার সম্ভবত ৪ শতাংশ বা তারও নিচে নেমেছে। আবাসন খাতও অতিঋণজনিত সংকটের মধ্যে রয়েছে। হ্যাল ব্র্যান্ডস ও মাইকেল বেকলে সম্প্রতি খেয়াল করেছেন, '(চীনে) রাষ্ট্রীয় জোম্বি সংস্থাগুলোকে লাগাতার সহযোগিতা করা হচ্ছে যখন বেসরকারি সংস্থাগুলো পুঁজির দুর্ভিক্ষে রয়েছে।' অর্থনৈতিকভাবে উদ্ভাবনাময় ও গতিশীল থাকার জন্য শাসনযন্ত্রকে বেসরকারি উদ্যোগ ও বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে হবে। কিন্তু চীন তার সবচেয়ে বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর পাশাপাশি অন্যান্য উদ্যোক্তার সঙ্গে কঠোর আচরণ করছে। কারণ, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি তাদের গঠনগত অক্ষমতার কারণে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহ্য করতে পারে না। ব্র্যান্ডস ও বেকলে জানাচ্ছেন, 'নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করায়' চীনে পানি ফুরিয়ে যাচ্ছে এবং 'অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে বেশি জ্বালানি ও খাদ্য আমদানি করতে হচ্ছে।' ফলে চীনা প্রবৃদ্ধি এক একক বাড়ানোর খরচ ২০০০-এর থেকে তিন গুণ বেশি হয়ে গেছে। চীনা জনসংখ্যার মধ্যে প্রবীণদের হার দ্রুত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের মূল্য এবং আর্থিক চাপও বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী তিন দশকে কর্মক্ষম জনসংখ্যা ২০ কোটি

পর্যন্ত কমে যাবে এবং সমানতালে প্রবীণ নাগরিকদের সংখ্যা বাড়বে।

এই দ্বন্দ্বগুলো চীনের বিস্ময়কর অর্থনৈতিক উত্থানকে সোভিয়েতের মতো লম্বা স্থবিরতার রূপ দিতে পারে। কিন্তু তার আগে আসতে পারে কমিউনিজমের পতন এবং গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা। এমন সম্ভাবনা শাসকদের মনে কৌশলগত আতঙ্ক তৈরি করতে পারে বলে ব্র্যান্ডস ও বেকলের আশঙ্কা। তারা এই উপসংহারে আসতে পারে যে সময়টা তাদের শাসনের পক্ষে নয়। এবং এই ভয় থেকে (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানি এবং পার্ল হারবারের আগে জাপানের মতো) ক্ষমতা ফুরানোর আগেই তড়িঘড়ি করে সামরিক আঘাত হানা শুরু করতে পারে চীন।

দুই দশক আগে কল্পনা করা হয়েছিল, চীনের দ্রুত উন্নয়ন গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য চাপ তৈরি করতে পারে। অর্থনীতিবিদ হেনরি এস রোয়েন অবশ্য ২০০৭ সালেই পূর্বাভাস দিয়েছিলেন, চীনের দ্রুত অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণ দেশটিকে ২০১৫ সালের মধ্যে 'আংশিক মুক্ত' রাষ্ট্র এবং ২০২৫ সালের মধ্যে 'মুক্ত' রাষ্ট্রে পরিণত করবে। একইভাবে এশিয়ান ব্যারোমিটার (তাইওয়ানের দুটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত জরিপ-সম্পাদক) বারবার কিছু আশাপ্রদ প্রামাণিক তথ্য খুঁজছিল যে চীনাদের মূল্যবোধ, বিশেষ করে যুবকেরা আরও বেশি করে উদারনৈতিকতার দিকে বদলে যাচ্ছে কি না। যাহোক, আধুনিকীকরণ উদারীকরণকে এগিয়ে নেয়—এই বিশ্বাস (আমার কাছে তা প্রলুব্ধকর বলে মনে হয়েছিল) এখন পর্যন্ত ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই জার্নালটি রোয়েনের প্রবন্ধটির মতো অনেক পূর্বাভাসমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করে গেছে, যেখানে ন্যূনতম থেকে ব্যাপক পরিবর্তনের আশা করা হয়েছিল। আশা করা হয়েছিল শক্তিশালী নাগরিক সমাজ ও অধিকতর প্রযুক্তিবিদকেন্দ্রিক, আইনভিত্তিক রাষ্ট্রের জন্য। অথবা দুর্নীতি ও জবাবদিহিহীন শাসনের সংকট গণতন্ত্রের পথ খুলে দেবে বলে বিশ্বাস করা হয়েছিল। এসবের বিপরীতে, অ্যান্ড্রু নাথানের ২০০৩ সালের 'কর্তৃত্ববাদী সহনক্ষমতা' বিশ্লেষণটি বরং বেশি বাস্তব বলে মনে হয়। তবে নাথানের মূল্যায়নে ধরে নেওয়া হয়েছিল, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি নিয়মিতভাবে, যোগ্যতর উত্তরাধিকারী বাছাই, মেধাভিত্তিক, বিশেষায়িত আমলাতন্ত্র এবং গণ-অংশগ্রহণ ও গণ-আবেদন সৃষ্টির পথ খুলে দেওয়ার মাধ্যমে শাসন চালিয়ে যাবে। খুব কম লোকই ভাবতে পেরেছিলেন নয়া কর্তৃত্ববাদী শাসক হিসেবে সি চিন পিং তাঁর ক্ষমতার সামনের প্রাতিষ্ঠানিক বাধাগুলো গুঁড়িয়ে দেবেন, জনতার ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বাড়াবেন এবং

রাজনৈতিক উদারতার সব চিহ্ন মুছে ফেলবেন।

আমরা দুটি ভিন্ন ধরনের শাসনপদ্ধতির মধ্যে যুগান্তকারী সংঘাতের সময়ে চলে এসেছি—একটি চলে ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে, অন্যটি বৈধতার ওপর। ক্ষমতার ওপর দাঁড়ানো শাসনব্যবস্থাগুলো পরস্পরের স্বাচ্ছন্দ্য ও সহায়তা যেমন উপভোগ করে, তেমনি তাদের রয়েছে অংশীদারি দুর্নীতিগ্রস্ত নেটওয়ার্ক ও নিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি। তবে বেশির ভাগেরই অর্থনৈতিক সম্ভাবনা হ্রাস পাচ্ছে। নজরদারি ও নিপীড়ন ব্যয়বহুল এবং ধনিক গোষ্ঠীর অত্যাচার অর্থনীতিকে শুকিয়ে ফেলে এবং দমন ছাড়া রাষ্ট্রের আর সব সক্ষমতা লোপ পায়। যেমন ভেনেজুয়েলা ও জিম্বাবুয়ে আবিষ্কার করেছে, যদি শাসক চক্রের লুট করার প্রাকৃতিক সম্পদ না থাকে বা (উত্তর কোরিয়া ও সিরিয়ার মতো) তারা যদি বৈশ্বিক অপরাধ সিন্ডিকেট হিসেবে কাজ না করে, তাহলে এই পন্থা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রকে অবক্ষয়িত এবং ব্যর্থ করে দিতে পারে। তুরস্কের রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান এবং হাঙ্গেরির ভিক্টর অরবানের মতো স্বৈরাচারীরা তাঁদের শাসনের বৈধতা ও নবায়নের জন্য নির্বাচনের ওপর নির্ভর করেন, সেখানে তাঁদের অপশাসনের অর্থনৈতিক পরিণতিই ডেকে আনবে তাঁদের পতন। ভারতের জনতুষ্টিবাদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যদি তাঁর অগণতান্ত্রিক শাসন চালিয়ে যান, তাহলে এই দোলাচলের মোকাবিলা তাঁকেও করতে হবে।

কিন্তু রাশিয়া ও চীনের স্বৈরশাসকেরা নিজেদের ধ্বংস করার আগেই বিশ্বশান্তি ধ্বংস করে ফেলতে পারেন। তাঁদের অপরিণামদর্শী মডেল গভীর দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হওয়ায় রাশিয়া ও চীনের কর্তৃত্ববাদী শাসকদের বৈধতা কমে যেতে থাকবে। গর্বাচেভের পরিণতি দেখে রাজনৈতিক সংস্কারের ভয়ে তাঁরা ভীত। কিন্তু সংস্কার করা না হলে ক্ষমতা বাঁচাতে তাঁদের স্বদেশে ও বিদেশে শক্তি প্রয়োগের ওপর বেশি করে নির্ভর করতে হবে। এটি সম্ভবত তাদের ফ্যাসিবাদী পথে চালিত করবে। নিরলসভাবে অভ্যন্তরীণ বহুত্ববাদ দমন, উগ্রজাতীয়তাবাদ, সম্প্রসারণবাদ চালানোর পাশাপাশি সমস্ত উদার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি তীব্র আদর্শিক শত্রুতা জারি থাকবে। রাশিয়া ও চীন উভয় দেশেই এলজিবিটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও হয়রানিমূলক প্রচারণা চলবে এবং প্রথাগত জেন্ডার আচরণ থেকে যেকোনো বিচ্যুতিকে 'পশ্চিমা প্রভাব' বলে চিহ্নিত করবে। এসব হলো আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্য আরও বেশি করে হুমকি হয়ে ওঠা এই শাসনব্যবস্থার ভেতরের দিক।

অর্ধশতাব্দীর মধ্যে স্বাধীনতার ধারণার জন্য সবচেয়ে অন্ধকার মুহূর্তে আমরা আছি। আমি গণতন্ত্রের দীর্ঘমেয়াদি সম্ভাবনার প্রতি বিশ্বাস রাখি, কারণ এটি নৈতিকভাবে উচ্চতর এক ব্যবস্থা। এটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদা মেটাতে, অর্থনীতির বিকাশে, পরিবেশ রক্ষায়, মানবাধিকারের প্রতি সম্মানে এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে আরও কার্যকর হতে পারে বলে প্রমাণিত হয়েছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, মর্যাদা ও স্বশাসনের দাবি মানুষের মজ্জাগত। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এই মূল্যবোধগুলো আরও কাঙ্ক্ষিত হয়েছে। তবে গণতন্ত্রের বিজয় অবশ্যম্ভাবী কিছু নয়। এই নতুন যুগে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং এর নেতাদের কৌশল ও পদক্ষেপের অভিঘাত দশক ধরে চলতে থাকবে। প্রশ্ন হলো, বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো কি তাদের মধ্যকার বিভেদ সামলিয়ে এবং তাদের সংকল্পকে এক করে পুনরুত্থিত কর্তৃত্ববাদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে? আন্তোনিও গ্রামসির কথাটা তাড়িত করে : 'বুদ্ধির হতাশাই ইচ্ছাশক্তির আশাবাদ।' বর্তমান বিপদের গভীরতা বিষয়ে পরিষ্কার নজরই পারে প্রয়োজনীয় ইচ্ছাশক্তি জাগাতে।

আমি আশাবাদীই রইলাম।

আমি আশাবাদী।

● **ল্যারি জে ডায়মন্ড** আমেরিকান রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানী ও সাবেক মার্কিন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি তিন দশক ধরে আমেরিকার ন্যাশনাল এনডাউমেন্ট সংস্থা থেকে প্রকাশিত *জার্নাল অব ডেমোক্রেসির* প্রতিষ্ঠাতা সহসম্পাদক। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর, জাতিসংঘ প্রভৃতিতে কাজ করেছেন। রচনাটি যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত *জার্নাল অব ডেমোক্রেসির* জানুয়ারি সংখ্যা থেকে নেওয়া হয়েছে।

ইতিহাস

ভারতবর্ষের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মন

জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক

ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে শুধু না, পাশ্চাত্যের বিদ্যাজগতেও ব্রিটিশ-ভারতের উনিশ শতক দারুণভাবে গবেষিত বিষয়। ভারতবর্ষের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন কী করে ধর্মীয় পুনর্জাগরণ ঘটিয়ে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ব্রিটিশ শক্তির হাতে গড়া অখণ্ডতাকে ভেঙে ফেলল, কেন রাজনৈতিক আধুনিকতা ও সেক্যুলার শিক্ষা শেষ পর্যন্ত গোষ্ঠীবাদী আত্মপরিচয়ের খাতে ঢলে পড়ল, হিন্দু-মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অবিবেচক আচরণ কীভাবে শতকোটি মানুষের জীবনে বিপর্যয়ের বীজ বুনে দিল; জাতীয় আব্দুর রাজ্জাক গভীর অভিনিবেশে তা খুলে দেখিয়েছেন।

ভারতবর্ষের বেশির ভাগ রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিষেক ঘটেছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাতে, এটা স্বীকৃত ঘটনা। তারা যা ভেবেছে, যা বলেছে এবং যা করেছে, আন্দোলনের দলিলগুলো সেসবেরও দলিল। এমনকি অন্যরা শরিক হওয়ার পরও আন্দোলনের নেতৃত্ব এই শ্রেণির হাতেই ধরা ছিল। আন্দোলনের আরজিনামা, যুক্তি, দাবিদাওয়া ও হুমকি-ধমকি থেকেই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পরিণতির ব্যাখ্যা মিলবে; তা ঠিক নয়। কিন্তু আমরা যদি এসব রাজনৈতিক আন্দোলনের চরিত্র বুঝতে চাই, তাহলে ভিনদেশি সরকারের সঙ্গে মধ্যবিত্তের সত্যিকার সম্পর্কের পাশাপাশি কী জাতীয় শিক্ষা তাঁরা পেয়েছিলেন, সেটাও খতিয়ে দেখা উচিত। কেননা, তাঁদের দেওয়া শিক্ষার জোরেই তো এই শ্রেণি 'শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি' হয়ে উঠতে পেরেছিল এবং সেই শিক্ষার দোহাই দিয়েই এরা নেতৃত্বের দাবিদার হওয়াকে জায়েজ করেছিল। ব্রিটিশ শাসনের মৌলিক কিছু দিকের বিরোধিতাই ছিল আন্দোলনগুলোর সারবস্তু। এ বিষয়ে

● অনুবাদ : **হাসান আল জায়েদ ও রায়হান রহমান**

কোনো সন্দেহ না থাকলেও পরিহাসের বিষয় এটাই যে আন্দোলনের বনিয়াদি চিন্তাভাবনাগুলো ছিল ওই সরকারেরই দান। সমগ্র আন্দোলনে লম্বা সময় ধরে ভারতবর্ষের অখণ্ডতার অলঙ্ঘনীয় বিশ্বাস কাজ করে গেছে। কিন্তু এমন চিন্তা তো ছিল ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রশাসনের আইনি এখতিয়ার বাড়ানোর ফল। ব্রিটিশরা যদি ১৮৪৯ সালে পাঞ্জাব জয় না করত, তাহলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের আওতায় পাঞ্জাব আসত কি না সন্দেহ। একইভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তরফে ১৯৩০-৩১ সালে বার্মাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার দাবির পক্ষেও কোনো যৌক্তিকতা ছিল না।

বাস্তবতা হলো, আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের যে অবস্থা, তাতে জনগণকে একীভূত জাতীয় এককের চেয়ে একই মহাদেশের অধিবাসী বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষ বলে মনে হতো। ভারতবর্ষে ব্রিটেনের হস্তক্ষেপ এখানকার অর্থনৈতিক বিকাশকে শুধু পরিবর্তিত ও বাধাগ্রস্তই করেনি, একই সঙ্গে তাদের ওপর একটা রাজনৈতিক ঐক্যও চাপিয়ে দিয়েছিল। অর্থাৎ রাজনৈতিক ঐক্যদানকারী অর্থনৈতিক ভিত্তি অর্জিত হওয়ার অনেক আগেই ভারত একটি রাজনৈতিক এককে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। স্বাভাবিক বিকাশের এই উল্টোমুখী যাত্রার মধ্যেই কিন্তু—তা সে রাজনৈতিক দলের বিকাশের বেলায়ই হোক বা অন্য কোনো ব্যাপারে—ভারতীয় রাজনীতির বৈসাদৃশ্যগুলো কমবেশি শনাক্ত করা সম্ভব। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তন এই বিচিত্র, আলাদা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈরী উপাদানগুলোকে এই ছাঁচে গড়া রাজনৈতিক ঐক্যের কাঠামো জোড়া লাগাতে পারেনি। ঐক্যের নীতিটা কিন্তু ভারতবর্ষের অধিবাসীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা থেকে উঠে আসেনি। বরং এটা এসেছে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর বিশ্বাস থেকে। ভারতীয় ঐক্যের ধারণা একটা মাত্রা পর্যন্ত এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যে আগ্রহী ইউরোপীয়দের অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা থেকে উদ্ভূত হলেও বিশদ বাস্তবতা তৈরি হয়েছে শাসনযন্ত্রের অর্থাৎ যাদের মাধ্যমে ভারতবর্ষে আইনকানুন বজায় রাখা হতো, তাদের চাহিদার ভিত্তিতে। প্রথমত ও প্রধানত যে প্রশাসনযন্ত্রের মাধ্যমে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য স্পষ্ট হয়, তা এত বিশাল ছিল বলেই পরিস্থিতির মধ্যে শেষ পর্যন্ত আলাদা প্রভাব নিয়ে টিকে ছিল। ভারতের ঐক্যের চূড়ান্ত কারণ হয়ে থাকতে পারে বাজারের ঐক্য। কিন্তু ভারতকে জোড়া লাগানো হয়েছিল যেসব গিট্টু দিয়ে, সেসবের রোজকার বিবর্তনের মধ্যে প্রশাসনযন্ত্রের প্রয়োজনই সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল।

অন্যভাবে বললে, শুরুতে রাজনৈতিক একত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং তাদের হাতে বেড়ে ওঠা সর্ববিরাজিত প্রশাসনযন্ত্র একে হৃষ্টপুষ্ট করেছিল। এমনকি আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্তও দেশীয় মধ্যবিত্তরা ওই যুগের সামাজিক-অর্থনৈতিক ময়দানে একটানা প্রভাবশালী হয়ে উঠছিল। অর্থনৈতিক কাঠামোতে গ্রামের প্রাধান্য তখনো বজায় ছিল। যদিও পণ্যের কেনাবেচা ও বিলিবণ্টনের দরকারে উঠতি ও ধনবান মধ্যশ্রেণির রমরমা ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে বড় বড় শহরের উত্থান হচ্ছিল। মূলত বাজারের জন্য পণ্য উৎপাদনকারী কারিগরদের অনেক শ্রেণি উৎপাদনী ক্ষেত্রেও পরিবর্তন বয়ে আনছিল। আর্থিক জীবনের এই রূপান্তর মধ্যশ্রেণির গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়।

ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যের ধরন ও মাত্রা দেখলেই ভারতবর্ষের অর্থনীতির পরিবর্তনশীল চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ১৭৫৭ সালের বিপর্যয়ের পেছনে জগৎ শেঠ পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই কিন্তু ধনবান শ্রেণির রাজনৈতিক প্রতিপত্তির উদাহরণ। পুরোপুরি সামন্তবাদী অর্থনীতিতে এমনটা একেবারেই সম্ভব হতো না। কিন্তু মধ্যবিত্তের সামাজিক মর্যাদা ও ভূমিকা বদলের দুটি কারণ থাকতে পারে, ১. ইউরোপের সঙ্গে ভারতের ব্যবসার ধরনে পরিবর্তন, ২. মূলত বাজারের জন্য উৎপাদনে নিয়োজিত কারিগর শ্রেণিগুলোর অবস্থার লাগাতার পতন।[১] ব্রিটিশদের ক্ষমতাসীন হওয়ার প্রাক্কালে জগৎ শেঠ পরিবারের অবনতি ও পতনের ঘটনা পুরোনো মুদ্রা ব্যবসায়ী ধনী পরিবারগুলোর বিলুপ্তি এবং নতুন শ্রেণির উত্থানেরই লক্ষণসূচক ঘটনা। তখন থেকেই ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ও চরিত্র দেশে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকা রাজনৈতিক কাঠামোর শর্তাধীন হয়ে পড়ে; দেশের প্রয়োজনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না।

ভারতীয় অর্থনীতির সামাজিক ভিত্তিতে যে রদবদল ঘটে চলছিল, তা আরও চমৎকারভাবে বোঝা সম্ভব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে একের পর এক দেশীয় রাজ্যের পতনের ঘটনায়। এ ঘটনার আংশিক ব্যাখ্যা তো অবশ্যই কোম্পানির সেনাদের উচ্চতর সামরিক সক্ষমতার মধ্যে মেলে কিন্তু এর অন্য আরেকটি বড় দিকও রয়েছে। যেখানে ভারতীয় একজন রাজন্যের অধীনে থাকা সৈন্যদের প্রায় ছয় মাসের বেতন বকেয়া থাকত, সেখানে কোম্পানির সেনারা যুদ্ধের ময়দানে নামলেই পেত বেতনের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, যেখানেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যুদ্ধ করতে গেছে, সেখানেই কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই ঘটনাস্থলে স্বাভাবিক মিত্র হিসেবে স্থানীয় বেনিয়া শ্রেণিকে তারা পক্ষে পেয়েছে। ১৭৫৭ সালের আগে থেকেই এরা কোম্পানির বাণিজ্যকেন্দ্রের সঙ্গে নিবিড়

ব্যবসায়িক সম্পর্কের মধ্যে ঢুকেছে। সামাজিক সংগ্রামের বেলায় জাতিগত ভিন্নতা ছাপিয়ে উঠেছে অর্থনৈতিক প্রয়োজন। সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্থানীয় বেনিয়া শ্রেণির কাছে ঠিক ততটাই গৌণ ছিল, যতটা ছিল ভিনদেশি বুর্জোয়া ব্যবসায়ীদের জন্যও।

স্থানীয় বেনিয়া শ্রেণির মধ্যে ইংরেজ হানাদাররা খুঁজে পেল তাদের সহজাত মিত্র। এদের সঙ্গে নিয়ে তারা দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে উপড়ে ফেলল। কিন্তু তখনো স্থানীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির গতানুগতিক বিকাশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গড়ে তোলা কাঠামোর কোনো চাহিদাই মেটাতে পারত না বলে একটা পর্যায়ে শ্রেণিটিকে তারা তৈরি করে নেয়। সে সময় ইংরেজরা ভারতবর্ষে যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত, তা ছিল আকারের দিক থেকে একেবারেই সীমিত। তাদের মূল দৃষ্টি ছিল রাজনৈতিক কাঠামোর দিকে। রাজনৈতিক কাঠামোর চাহিদাতেই মিত্রের দরকার হয় তাদের। আসলে যে শক্তি ব্রিটিশকে ক্ষমতা দখলে মদদ জুগিয়েছিল, সেই সামাজিক শক্তিকে বিকশিত হতে দিলে নিশ্চিতভাবেই স্থানীয় বুর্জোয়াদের উত্থান ঘটত। এবং সেই শ্রেণি হয়তো শেষ পর্যন্ত ভারতে ইংরেজ বেনিয়া বুর্জোয়াদের জায়গা নিয়ে নিত, অর্থাৎ তাদের প্রতিস্থাপন করত। এমন আত্মবিনাশী ভূমিকা ইংরেজরা নেবে, সে আশা অবাস্তব। দেশের রাজনৈতিক শাসক হিসেবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার বেনিয়া চরিত্র ঢেকে ফেলতে শুরু করলে রাজনৈতিক কাঠামোর গুরুত্ব আরও বাড়ে। অবশ্য এই সব সম্পর্ককে বিশেষ দিকে চালিত করার মতো কোনো নীলনকশা তাদের ছিল না। তবে স্থানীয় বেনিয়াদের সঙ্গে সম্পর্কের আদল থেকেই এই সম্পর্কের রাজনৈতিক চরিত্র তৈরি হয়ে গিয়েছিল। শিক্ষাদানের ব্যাপারে—ইংরেজি ভাষার শিক্ষা—কোম্পানির অবদান মোটামুটি। তবে তা করা হয়েছিল ইতিমধ্যে খানিকটা ইংরেজি জানা স্থানীয় ব্যক্তিদের চাহিদা মেটাতে। আদতে অল্প কিছু মানুষকে ইংরেজিতে শিক্ষা দিতে গিয়ে গণশিক্ষাকে অবহেলা করা মোটেই দুর্ঘটনা বলা যাবে না।[২]

শুধু উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিতরাই প্রশাসনযন্ত্রের চাহিদা মেটাতে সক্ষম বলেই খরুচে হওয়া সত্ত্বেও মানুষ 'উচ্চ' শিক্ষার পেছনে ছোটা বন্ধ করেনি। রেললাইন বসানোর প্রস্তাব যখন প্রথম উঠল তখনো কিন্তু বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক বিবেচনার চেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে কৌশলগত বিবেচনা।[৩] নিঃসন্দেহে রেললাইন ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলোকে বিশ্ববাজারের প্রভাবের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। তাহলেও বাস্তবে একে দেখা হয়েছে আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে ভারতবর্ষে আইনকানুন

বজায় রাখার সহজ উপায় হিসেবে। আইনকানুন বজায় রাখার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য থাকতে পারে, হতে পারে তা অর্থনৈতিক বা অন্য কিছু। তবে ভারতবর্ষের আমলাদের চোখে, প্রশাসনযন্ত্রের কাছে এটা ছিল স্বতঃসিদ্ধ একটা বিষয়। বাস্তবে অন্তত তিনটি আলাদা গোষ্ঠী তিনটি আলাদা কারণে রেলপথের ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। প্রথম দলটি ছিল বিনিয়োগকারীরা—এদের সবাই ছিল ইংরেজ। এদের মূল উৎসাহ ছিল অর্থনৈতিক ফায়দা তোলা (লন্ডন 'নগরী'র স্বার্থের সঙ্গে এদের এক করে দেখা যেতে পারে)। ভারতবর্ষের রপ্তানিকারকেরা ছিল দ্বিতীয় দল। এদের মূল আগ্রহ ছিল ভূখণ্ডের আনাচ-কানাচ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে বিদেশে রপ্তানি করা, কেননা এটাই ছিল ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল খোরাক। কার্যত কলকাতা ও বম্বে শহরের আড়তগুলোর ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলো রপ্তানিকারকদের পুরো দলটিকে কাছে টেনে নিয়েছিল। অবশ্য উভয় পক্ষই ব্রিটিশ হলেও তাদের স্বার্থ মোটেও এক ছিল না। নিঃসন্দেহে, তৃতীয় দলটি ছিল ভারতবর্ষের আমলাতান্ত্রিক সরকার। তাত্ত্বিকভাবে, ভারত সরকার ব্রিটিশ সরকারের শাখা হওয়া সত্ত্বেও আমলাতন্ত্র আগাগোড়া তৃতীয় একটা পক্ষ হিসেবে কাজ করে গেছে, যদিও এর কাজ ছিল প্রথম দুই পক্ষের ফারাক কমিয়ে আনা। ভারত সরকারের এমন এক নীতি ছিল যে তারা একবার এই গোষ্ঠীকে আরেকবার ওই গোষ্ঠীকে সমর্থন করত। তবে সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল নিজের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। কিন্তু রেললাইন বসানোর অগ্রগতি ও অন্য কিছু উপাদান ভারতে নিত্যদিন অনেক মানুষের মিছিল বয়ে আনল। রেলব্যবস্থায় কাজ করার চেয়ে এদের মূল নজর সেই ভিত্তিকাঠামোর দিকে, যার ওপর ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল। অথচ রেললাইন এবং সমজাতীয় অন্যান্য কর্মকাণ্ডের ফল দৃশ্যমান হতে তখনো অনেক দেরি। তাহলেও ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্কের বদল শুধু এসবের মধ্য দিয়েই সম্ভব হতে পারত।[৪] ইতিমধ্যে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক কাঠামোর প্রভাবে ভারতের রাজনৈতিক চেতনার সূচনা চোখে পড়ার অনেক উপাদান সামনে চলে আসে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক উন্মেষ ও রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যবসা ও শিল্পে উৎসাহী স্বাভাবিক মধ্যশ্রেণির বুর্জোয়াদের যতো না অবদান, তার চেয়ে অনেক বেশি অবদান ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত একটা ছোট গোষ্ঠীর। গোষ্ঠীটি ইংরেজি শিক্ষাকে ভারতের আমলাতন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে কাজে লাগিয়েছিল।

এই শ্রেণির উৎপত্তির ধরন যাচাই করলে এদের শক্তি ও দুর্বলতা এবং এদের মাধ্যমে শুরু হওয়া আন্দোলনগুলোকে বোঝা যেতে পারে। সমকালীন

ইংরেজদের রাজনৈতিক ও অন্য সব চিন্তাভাবনার সঙ্গে এদের পরিচয় ছিল বটে, কিন্তু সেসব চিন্তাপদ্ধতির সঙ্গে এদের কোনো পদ্ধতিগত সম্পর্ক ছিল না। এঁদের জানাশোনা ছিল পরের মুখে ঝাল খাওয়ার মতো। আসল জিনিস নয়, এঁরা পেতেন মূলের প্রতিফলন। একেবারে খাঁটি সত্য কথাটি বলবার সময়ও কিন্তু এঁদের মধ্যে নিষ্ঠার অভাব দেখা গেছে, কারণ সে সত্যের শিকড় তো তাঁদের অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল না। শোনা যায়, রাজা রামমোহন রায় ইউরোপের জুলাই বিপ্লবের* উদ্‌যাপন করেছিলেন কলকাতায় বসে, ওই বিপ্লবের সম্মানে বাংলার গভর্নর জেনারেলের দেওয়া ডিনারের দাওয়াতে গিয়ে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীন একজন প্রজার এভাবে ইউরোপীয় বিপ্লব উদ্‌যাপন করাকে 'লোকদেখানো' এবং বেমানান বলেই মনে হয়। মূলত ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার খরুচে যে প্রকল্পের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত তৈরি করা হলো, ভৌগোলিকভাবে তার সুযোগ যেভাবে বণ্টিত হলো, তাতে করে এ ধরনের শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ মোটামুটি সংকুচিতই হয়ে গেল। ইংরেজি শিক্ষা হয়ে উঠেছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে প্রবেশের পূর্বশর্ত। কাজে কাজেই তা সবার জন্য অবারিত ছিল না। শিক্ষার বিষয়বস্তু যা ছিল, তা এই সংখ্যালঘু শ্রেণিটির সঙ্গে বিশালসংখ্যক সাধারণ মানুষের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলায় কোনো কাজে আসেনি। সমকালীন ইউরোপীয় চিন্তার ছায়ায় এঁরা বিকশিত হতে থাকলেন। একই সঙ্গে আপন পরিপার্শ্বের মধ্যে হয়ে গেলেন পরদেশির মতো। এই পরদেশি চরিত্র তখনই ঢাকা পড়ল, যখন দীর্ঘমেয়াদি বস্তুগত পরিবর্তনের ফলে সামাজিক অর্থনীতির মধ্যে এঁরা একটা ভিত্তি পেয়ে গেলেন। তবে ওই সব সীমাবদ্ধতার জন্য এই শ্রেণি যেভাবেই ভুগে থাকুক না কেন, এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চৈতন্যের জাগরণ আনা (অর্থাৎ, দেশের রাজনৈতিক কাঠামো বদলানোর সচেতন দাবি) এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করার কৃতিত্বটি এই শ্রেণিরই। রাজনৈতিকভাবে সচেতন অংশের দাবির পেছনে অন্যান্য উপাদানের প্রভাব কতটা, সে প্রশ্ন অবশ্য আরও জটিল।

আঠারো শতকের শেষ দশকে ভারতের ব্রিটিশ সরকার ১৭৯৩ সালের সপ্তম প্রবিধান আইন জারি করে। বাংলার ভূমি রাজস্ব আদায়ের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে পরিচিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই আইন দিয়ে কখনো কখনো ওই সময়ের ব্রিটিশ সরকারের চরিত্র ব্যাখ্যা করতে দেখা যায়। এ আইনে জমিদারদের সুবিধা

*১৮৪৮ সালের দ্বিতীয় ফরাসি বিপ্লব-সম্পাদক

দেওয়া হয়েছিল বলে তখনকার সরকার 'সামন্তবাদী শ্রেণি'র প্রতি পক্ষপাতী বলে যুক্তি দেওয়া হয়। বলা হয়, যেহেতু তারা তখনো প্রস্তুত অবস্থায় ছিল না; তাই সরকার শ্রেণিটিকে বানিয়ে নিয়েছে। এই বক্তব্যের মধ্যে সত্যের কিছু উপাদান থাকলেও, কোম্পানি শাসনের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মালমসলা জোগানো কিন্তু এই আইনের আসল উদ্দেশ্য ছিল না। মূলত কমতে থাকা ভূমি রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি হিসেবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কারণ, ভূমি রাজস্বই ছিল কোম্পানির আঞ্চলিক আয়ের প্রধান উৎস। তা হলেও এই আইনের ফলে যে সামন্ত অভিজাততন্ত্র গড়ে ওঠে, তারা ইংল্যান্ডের অভিজাতদের চেয়ে অনেক আলাদা। এই যুগে কোম্পানি প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক কারবারের জন্য ভূস্বামীদের চেয়ে অনেক গুণ বেশি নির্ভরশীল ছিল ভাসা-ভাসা ইংরেজি জানা উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির ওপর। ব্যবসায়িকই হোক বা প্রশাসনিকই হোক, কোম্পানির বিভিন্ন রকম দপ্তরে কাজ করতো মধ্যবিত্ত শ্রেণির পুরুষেরা, জমিদারের বংশধরেরা না। বাস্তবতা হলো, এই নতুন লোকেরা কোম্পানির দপ্তরের বরাতে সহজেই বনেদি জমিদার শ্রেণিতে উত্তরিত হতে পারত।[৫] জমিদার শ্রেণির সদস্য হওয়ার আগে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের একজন লবণের দেওয়ান। এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে রাজা রামমোহন রায় ছিলেন মাসে ৫০ রুপি মাইনা পাওয়া পাতিবাবু। উল্লাপাড়ার রাজ পরিবারের পত্তনকারীরা ছিলেন ৫০ রুপিরও কম বেতন পাওয়া লোক। কোম্পানির নথিপত্রে এমন কারও নাম পাওয়া যায়নি যিনি ১৭৯৩ সালের আগে থেকেই জমিদার ছিলেন, আবার কোম্পানির আশীর্বাদও পেয়েছিলেন। কোম্পানি যেমন বেসামরিক প্রশাসনে জমিদারদের প্রতি পক্ষপাত দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি সামরিক প্রশাসনে নিয়োগের বেলায়ও তাদের দিকে তাকায়নি। কোম্পানির দেশীয় সেনাবাহিনী ছিল বিশাল প্রতিষ্ঠান, তবু সেখানে বনেদি পরিবারের সন্তানদের কোনো জায়গা হয়নি। কোনো শ্রেণিকে লালন-পালন করার প্রমাণ যদি কোম্পানির থেকে থাকে, সেটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি; যারা ইংরেজি শিক্ষা চালু করার প্রচেষ্টাকে ভেবেচিন্তে আলিঙ্গন করেছিল।

বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দ্যেশ্য যা-ই থাকুক, এর ফলে এমন এক সময়ে একধরনের জমিদারশ্রেণি তৈরি হলো, যখন কোম্পানি আরও বেশি করে পাতি ব্যক্তিদের দিকে ঝুঁকছে। যথাযথ ও সোজা-সাপটাভাবে কোম্পানির 'নীতি' ব্যাখ্যা করার অসুবিধা হলো, একই সঙ্গে ভারতে দখলদারি পরিচালনা এবং একে লাভজনক রাখার এই জটিল উদ্যোগ চালাতে গিয়ে একই সময়ে তাদের

পরস্পরবিরোধী নীতিকৌশল নিতে হয়েছিল। এর ফলে যে চিত্র তৈরি হলো, তার মধ্যে স্পষ্টতার অভাব রয়েছে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর পটভূমি গড়ে উঠেছিল এমন সব শক্তির কার্যক্রমে, যাদের অভিমুখ ও তাল-লয় এক ছিল না। জমিদারশ্রেণি তৈরি চলতে থাকার পাশাপাশি আরও গভীর ও ধারাবাহিক পদক্ষেপে চলতে থাকল মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরির কাজ। পাশাপাশি চলতে থাকল জমিদারি তালুকের ধারণা—সরকারকে কমবেশি সামান্য কিছু খাজনা দেওয়ার মাধ্যমে—এবং জমিদারি হাতবদল সহজ করার আইন ও বিধিমালা। এর ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ধীরে ধীরে জমিদারি সম্পত্তির মালিকানায় ঢুকতে থাকল। অন্যভাবে বললে, জমিদারদের সঙ্গে অন্য সব শ্রেণির মধ্যকার বিভাজনরেখাটি ধীরে ধীরে, তবে কার্যকরভাবে মুছে যেতে লাগল। যে মানুষটি ছিলেন জমিদার, তিনিই আবার পেশাজীবী ও ব্যাংকার—বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভারতে তাদের ঋণদাতা মহাজনই বলত। এ হেন বহুবিধ সামর্থ্যের মানুষদের হাতে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিসীমা স্বভাবত অস্পষ্টই হয়।

সামাজিক অর্থনীতির প্রভাবক উপাদানগুলোর চেয়ে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলো আলাদা হলেও ওই উপাদানগুলোই ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তি। ইংরেজি শিক্ষায় প্রবেশাধিকার পাওয়া এই শ্রেণিটির সামাজিক সম্পর্কের ধরন এ জন্যই গুরুত্বপূর্ণ যে এটাই তাদের সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য ঠিক করে দেয়। এই শ্রেণির সদস্যরা যে পরিবেশে বাস করত এবং প্রাত্যহিক জীবন চালাত, সেটাও মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই শ্রেণির রাজনৈতিক ভূমিকা যাচাই করতে গিয়ে এদের শিক্ষার বিষয়বস্তুর দিকেও নজর দেওয়া দরকার। ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার জন্য আন্দোলনের ইতিবৃত্ত বিভিন্ন প্রকাশনায় দেখানো হয়েছে। মামুলি বা মহান, সরকারি বা বেসরকারি, মিশনারি বা সাধারণ, ভারতীয় বা ইউরোপীয়—সবার নাম এখন ভালোই জানা হয়ে গেছে। কিন্তু আসলে কী শেখানো হতো এবং এই নয়া শিক্ষা রাজনৈতিক বিকাশের, বিশেষ করে রাজনৈতিক আন্দোলনে কী ধরনের প্রভাব ফেলেছিল, সে বিষয়ে লেখালেখি কিন্তু তুলনায় কমই হয়েছে।

বিকাশের পথে এই শিক্ষার বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিচারের আগে মনে রাখা দরকার, ১৮ শতকের তৃতীয় ভাগে কোম্পানিশাসিত ভারতবর্ষে সামাজিক অবস্থান উন্নত করার সব পথই ছিল কোম্পানির প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগের ওপর নির্ভরশীল। বড় বড় ব্যবসায়ী ও কারবারিরা কিন্তু ভারতীয় সমাজে প্রতাপশালী গোষ্ঠী ছিলেন না। এমনকি ভূস্বামী শ্রেণিও নয়। কেননা সামন্ত অভিজাত শ্রেণিতে

প্রবেশাধিকার পেতে হলে কোম্পানির প্রভাবশালী কর্মচারীদের সঙ্গে খাতির থাকতে হতো। কোম্পানির বাড়তে থাকা ভারতীয় কর্মচারী শ্রেণিগুলোই ছিল ভারতীয় সমাজের 'স্বাভাবিক' নেতা। এরা যে কোম্পানিতে ছোট চাকরি করত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ না থাকলেও ভারতীয়দের মধ্যে শ্রেণি হিসেবে এরাই ছিল সবচেয়ে ক্ষমতাধর আর বিত্তবান। এদের নিয়োগের নীতি ও পদ্ধতি এবং শিক্ষা পাওয়ার ধরন ও বিষয়সূচিই আসন্ন মধ্যবিত্তের বৃদ্ধিবৃত্তিক জলবায়ু ঠিক করে দিয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতীয়দের মধ্যে থেকে নিযুক্ত বড় পদধারীরা অধিকাংশই ছিলেন আইনি কর্মকর্তা, কাজি আর পণ্ডিত। এরা ইউরোপীয় বিচারকদের সহকারী হিসেবে তাঁদের কাছে হিন্দু ও মুসলিম আইন ব্যাখ্যা করতেন। কলকাতার মুসলিম কলেজ আর বেনারসের হিন্দু কলেজ তো বানানোই হয়েছিল কোম্পানিকে হিন্দু ও মুসলিম আইন জানা কর্মচারীর জোগান দিতে।[৬] হিন্দু ও মুসলিম আইন ছাড়াও রাজস্ব প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা যখন আরও বড় আকারে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল, তখন ওই সব আইনে প্রশিক্ষিত কর্মচারীর চাহিদাও কমে আসতে শুরু করল। ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা—এটা থাকলে দৈনন্দিন কাজকর্ম ও ইউরোপীয় বড় কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগে সুবিধা হয়—ছোটখাটো কিন্তু লোভনীয় চাকরির যোগ্যতা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। এই সন্ধিক্ষণে, ১৭৯৩ সালের দিকে মিশনারিরা ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে নতুন কারণ যোগ করল। ১৮৬৪ সালে সরকারি চাকরির বেলায় ইংরেজি বিদ্যা একমাত্র যোগ্যতা বলে গণ্য হওয়ার আগে কলকাতার মুসলিম কলেজ এবং বেনারসের হিন্দু কলেজ থেকে যেসব শিক্ষিত মানুষজন সরকারি চাকরি করতে পারত, তাদের সংখ্যা ১৮৩১ সাল থেকে লক্ষণীয়ভাবে কমে আসছিল। এসব প্রতিষ্ঠানে তারা আসলে কী কী বিষয়ে শিক্ষা পেত?

মেকলে'র* বহুল উদ্ধৃত সেই অনুচ্ছেদ দেখায়, ভবিষ্যতের কর্মচারী তৈরির জন্য কোম্পানি যে শিক্ষার পেছনে টাকা ঢেলেছে, সময়ের প্রয়োজনের কাছে তা কতটা অকিঞ্চিৎকর। হিন্দু আর মুসলিম আইন শেখানোর যে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়েছিল, বাস্তবে সম্পূর্ণ আলাদা আরেক গুচ্ছ আইন পরে এদের জায়গা নিয়ে নেয়।[৭] নতুন এসব আইন ব্যাখ্যার জন্য এমন লোকের দরকার ছিল, যাদের ইংরেজি ভাষাজ্ঞান হতে হবে মুসলিম বা হিন্দু আইনে পাণ্ডিত্যের চেয়ে

[* টমাস বেবিংটন মেকলে (১৮০০-১৮৫৯ ব্রিটিশ অভিজাত, রাজনীতিবিদ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের শিক্ষানীতি এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি প্রণয়নেরও রূপকার তিনি।-সম্পাদক)]

আরও মানসম্পন্ন ও সারবান। হিন্দু ও মুসলিম আইনের সব খুঁটিনাটি জানা লোকদের সামাজিক বিলুপ্তি তখন অনিবার্য হয়ে উঠল। এরা আর ভারতবর্ষের উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণির অংশ হয়ে উঠতে পারল না। ইংরেজি জ্ঞান রাতারাতি সরকারি চাকরিতে প্রবেশের পাসপোর্ট হয়ে উঠলে এই মানুষগুলো মুশকিলে পড়ে গেলেন। ভাবনাচিন্তা ছাড়াই তাঁরা বুঝে গেলেন, এই শিক্ষা শুধু তাঁদেরই না, তাঁদের সন্তানদের জন্যও ভালো নয়। প্রাচ্যবাদী বনাম প্রতীচ্যবাদীদের বিতর্ক উত্তপ্ত হয়ে ওঠার আগেই প্রাচ্যীয় ভাষায় শিক্ষাদান সে সময়ের চাহিদার কাছে পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। বাংলা সরকারের 'দ্বৈততা'র কথা মুর্শিদাবাদের লোকেরা বিশ্বাসই করত না। গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত পদ তখন দখল করে রেখেছিল ইংরেজরা, প্রাচ্যের কোনো ভাষার ওপর তাদের কোনো দখলই ছিল না।

নিচু পদের যেসব কর্মচারী খাজনা আদায় বা বিচারিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের সংস্পর্শে আসতেন, তাঁদেরও প্রাচ্যের ভাষা শেখার কোনো জরুরত দেখা দেয়নি। তত দিনে ইংরেজি শিক্ষায় পৃষ্ঠপোষকতার পক্ষে মিশনারিদের খোলাখুলি প্রচারের বয়সও অনেক হয়ে গেছে।

ইংরেজি ভাষার পক্ষে মিশনারিদের সংগঠিত প্রচারকাজ শুরু হয় ১৭৯৩ সালে তাদের আগমনের সময় থেকেই। তবে তারও অনেক আগে থেকেই, অন্তত কলকাতায় ইংরেজি শেখানো ও পড়ানো চলে আসছিল। কলকাতাসহ ভারতের অন্যান্য বন্দরনগরীতে কিন্তু আগে থেকেই ইংরেজি জানা মানুষ ছিলেন। তাঁরা ইংরেজ বণিক ও দেশীয় ব্যবসায়ী শ্রেণির ভেতর মধ্যস্থতা করার মতো যথেষ্ট ভালো ইংরেজি জানতেন। ১৭৫৭ সাল থেকেই ইংরেজি জ্ঞানের বাণিজ্যিক মূল্য হঠাৎ করে বাড়তে শুরু করে। ১৭৫৭ থেকে ১৮১৬ সালের মধ্যে কলকাতা শহরে শুধু ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য অনেকগুলো স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮] ১৮১৩ সালের চার্টার অ্যাক্টের মাধ্যমে দরকারি জ্ঞানের শিক্ষা দেওয়ার দায়ভার যখন কোম্পানির ওপর বর্তাল, তখন ইংরেজি ভাষার জ্ঞানের বিস্তর চাহিদা ছিল।[৯] কোম্পানির যেসব কর্মচারী প্রাচ্যবাদী চিন্তাধারার পক্ষে ছিলেন, তাঁরা ইংরেজিতে নির্দেশনাদানের ব্যাপারটা ভালোভাবে নেননি। সে কারণেই ইংরেজিতে শিক্ষা দেওয়ার প্রাথমিক দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল দুটি দলের ওপর। অবশ্য লর্ড বেন্টিংকের আমলে কোম্পানির প্রাচ্যবাদী কর্মচারী দলটি পুরোপুরি হার মানতে বাধ্য হয়েছিল। অর্থাৎ ১৭৯৩ থেকে ১৮৩১ সাল পর্যন্ত, ইংরেজিতে শিক্ষাদানের বিষয়বস্তু কী হবে, তা কোম্পানি ঠিক করেনি, করেছে কিছু

বেসরকারি ব্যক্তি। ১৭৯৩ থেকে ১৮৩১ সাল পর্যন্ত সময়টাকে আবার দুই ভাগ করা যায়, ক) ১৭৯৩-১৮১৪ এবং খ) ১৮১৪-৩৩। প্রথম পর্যায়ে শুধু মিশনারিরাই উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইংরেজি শেখানোয় নিয়োজিত ছিল। আদতে প্রথম ক্ষেত্রে ইংরেজি জ্ঞান ব্যবহার করা হয়েছিল মূলত হিন্দুদের খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তর করার সুবিধার জন্য।[১০] এটাই মূল কারণ, যে জন্য কোম্পানির দেশীয় কর্মচারীরা এ ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। আঠারো শতকের শেষ দিকে কোম্পানির মুখ্য কর্মচারীদের জীবনাচরণে খ্রিষ্টীয় বৈশিষ্ট্য আলাদা করে দেখা যেত না। মাঠপর্যায়ের অধিকর্তারাও আসলেই বিশ্বাস করতেন, ধর্মান্তরকরণে কোম্পানির অতি উৎসাহ ইতিমধ্যে গড়ে তোলা রাজনৈতিক কাঠামোকে গুরুতরভাবে বিপদে ফেলবে। ইংরেজি ভাষার জ্ঞান শুধু একটা লক্ষ্য সাধনেরই উপায় ছিল—একটা মাত্রা পর্যন্ত জনগণের নৈতিক উজ্জীবনের মাধ্যমে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তর করার পথ সুগম করা। মূলত ইংরেজির সহায়তায় অথবা ইংরেজির মাধ্যমে দেওয়া শিক্ষার বিষয়বস্তু এই মূল গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের সঙ্গে জড়িত ছিল। ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার প্রথম সচেতন উদ্যোগ তাই মিশনারিদের দ্বারা ধর্মান্তর করার উদ্দেশ্যের সঙ্গেই সম্পৃক্ত ছিল।

দ্বিতীয় পর্বের শুরু ১৮১৪ সালে, এ বছর রামমোহন রায় কলকাতায় স্থায়ী হলেন। এ বছরকে ইংরেজি ভাষার প্রতি কলকাতা শহরের স্থানীয় লোকজনের মধ্যকার ক্ষুদ্র অথচ ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর সমর্থনের বছর হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। মিশনারিদের পাশাপাশি রামমোহন রায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই দলটি ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষার প্রশ্নটিকে জোরালোভাবে সামনে নিয়ে এল। ১৮১৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট আইনে স্থানীয় জনগণের শিক্ষার জন্য বার্ষিক এক লাখ রুপি খরচ করা নিয়ে বিতর্ক চলল। যদিও রামমোহনের অনুসারী ও মিশনারি দুই দলই ইংরেজি শিক্ষাকে লক্ষ্য হিসেবে নিলেও তাদের কাঙ্ক্ষিত পদ্ধতি ছিল আলাদা। মিশনারিরা সীমাহীন উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা নিয়ে যে লক্ষ্যে ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে তদবির করে গিয়েছিল, তার ফল হলো বিপরীত। সংস্কারের জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আন্দোলন ছিল মিশনারিদের ধর্মান্তর করার বাড়াবাড়ির মোক্ষম জবাব। অবশ্য সমাজের দীর্ঘমেয়াদি বিকাশের বৃহত্তর প্রশ্নটি বিবেচনায় নিলে এর বেশ একটা দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি দেখা যায়। ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন আগাগোড়া ধর্মনিরপেক্ষ প্রশ্ন না থেকে তা কার্যত শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ভেতরে ধর্মচেতনা পুনরুজ্জীবিত করায় ব্যবহৃত হলো। শতাব্দীর একেবারে শেষভাগেও তা ফুরিয়ে গেল না। রামমোহন রায় ইংরেজি শিক্ষা চালু করার

পুরোধা হিসেবে ক্রমবর্ধমান (শিক্ষিত) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতে ইউরোপীয় জ্ঞান ও চিন্তার চাহিদা মেটানোর দরকারি সংযোগ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কর্মজীবনের পুরোটা সময় তিনি ধর্মের পেছনেই ব্যয় করলেন। এটা যে শুধু রামমোহন রায়ের বেলাতেই হয়েছে, তা কিন্তু নয়। চার্লস গ্রান্ট* ও মিশনারিরা ইংরেজি শিক্ষাকে ধর্মান্তরের বাহন মনে করলেও এটা ঘটাল হিন্দুত্ববাদী সংস্কার। ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভের শুরু থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগ পর্যন্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে মেধাবী মানুষেরা কেবল ধর্মীয় প্রশ্ন নিয়েই মেতে থাকলেন।

ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা ছিল ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা। বহুদিন ধরে এই একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সব গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী জোগানো হয়েছে, অন্ততপক্ষে ইংরেজিপড়ুয়াদের অনেকেই এই প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতদের তালিকা দেখলে মনে হবে এটি যেন এই কলেজের ছাত্রদেরই তালিকা। কলেজটির প্রতিষ্ঠার হেতু ও ধরন দেখায় যে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন বলতে আমরা যা বুঝি, তা আসলে মিশনারিদের ধর্মান্তর করার বাসনার সঙ্গেই জড়িত। ১৮১৫ সালে এ দেশেরই একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি (রামমোহন রায়) বাড়িতে কয়েকজন বন্ধুকে দাওয়াত করেছিলেন। সেখানে আলাপের মধ্যে দেশের মানুষের নৈতিক অবস্থার উন্নতির সেরা উপায়টি কী হতে পারে, তা উঠে আসে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহন রায় বেদান্ত পদ্ধতি অনুসারে ধর্মীয় মতবাদ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি কিছুটা সংশোধন করে হেয়ার সাহেব* একটা কলেজ প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন।[১১] অর্থাৎ হিন্দু কলেজ ছিল ব্রাহ্মসভারই একটি বিকল্প। মূলত মিশনারিদের ধর্মান্তর করানোর জোশের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার পদক্ষেপ নেওয়ার দরকারেই এটা গড়ে ওঠে। 'এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হলো সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের সন্তানদের ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষায় শিক্ষিত করে ইউরোপ ও এশিয়ার সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানদান করা।'[১২] কলেজটির জন্ম হয়েছে

---

* চার্লস গ্রান্ট ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চেয়ারম্যান। তিনি ভারতে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মান্তর ও সমাজসংস্কারের ব্যাপারে মিশনারিদের পক্ষে ছিলেন-সম্পাদক)

*ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২) ছিলেন একজন স্কটিশ ঘড়ি নির্মাতা ও ব্যবসায়ী। তিনি কলকাতার অনেক বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন-সম্পাদক

'স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নৈতিক উন্নতি সাধনের' আকাঙ্ক্ষা থেকে। অথচ এত আগেও কিন্তু 'স্থানীয়' বলতে হিন্দু ছাড়া আর কাউকে বোঝানো হয়েছে বলে দেখা যায় না। রাজনীতির মাঠে হিন্দু ও মুসলমানদের একত্রে কাজ না করার যে ব্যর্থতা, তার ব্যাখ্যামূলক নীতি হন্যে হয়ে খুঁজতে খুঁজতে এ ও হিউম 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' (ভাগ করো শাসন করো) নীতি আবিষ্কার করলেন। অথচ এর দরকার হতো না যদি তিনি শিক্ষিত ভারতীয়দের মনের দিকে তাকাতেন। কোনো রকম সরকারি প্রচেষ্টা ছাড়াই তারা হিন্দু ও মুসলিম পরিচয়ের আলাদা খুপরিতে নিজেদের আটকে ফেলেছিল।[১৩] ওই শতাব্দীর প্রথম দিকে, ধর্মীয় ভিত্তিতে জনগণকে বিভক্ত করার প্রবণতা স্বাভাবিকই ছিল, কিন্তু শতকজুড়ে যেভাবে এই প্রবণতার বিস্তার ও আধিপত্য ঘটেছে, তার পরিণাম ছিল ভয়ানক।

সমাজ যদি এই দুইয়ের কোনো একটি ধর্মের অনুসারীদের নিয়েও গঠিত হতো; তাহলেও হয়তো এই ধর্মীয় প্রবণতা সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশের দিকে যেত। কিন্তু ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে, একাধিক ধর্মের অনুসারী থাকা আরও সর্বনাশা জটিলতার পূর্বলক্ষণ হয়ে ওঠে। মিশনারিদের প্রথম অভিযানের অভিঘাত এমন সংস্কারকদের তৈরি করেছে, যাঁরা ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু পরে এটি তৈরি করল ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদীদের, হিন্দুধর্মের আরও বেশি গোঁড়া রক্ষকদের। কিন্তু সংস্কার বা পুনরুত্থান, পরিণতি যা-ই হোক না কেন, সন্দেহাতীতভাবে ওই যুগের মূল আগ্রহ—চিন্তার সারবস্তু—ছিল ধর্ম। ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু সংস্কার বা পুনরুত্থানবাদই হোক অথবা মুসলমান সংস্কার বা পুনরুত্থানবাদই হোক, সম্প্রদায়গত ছাড়া তা আর কিছু হতে পারত না। হিন্দু সংস্কার ও পুনরুত্থানবাদের পক্ষে মুসলমান সংস্কার ও পুনরুত্থানবাদের সমান্তরালে চলা খুবই সম্ভব ছিল। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের প্রায় পুরোটাই তারা কেউ কারও পা না মাড়িয়ে সমান্তরাল পথে চলেছে। ভারতে মুসলমান সংস্কার ও পুনরুত্থানবাদ তাদের হিন্দু প্রতিপক্ষের চেয়ে সামান্য কিছুটা পুরোনো। খ্রিষ্টান মিশনারিদের আক্রমণের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আসলে মিশনারিরা তাদের মহান ব্রত নিয়ে নেমে পড়ার আগেই সংস্কার পূর্ণ বিকশিত আন্দোলনের চেহারা নিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ এই পুরো সময় ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম ও ইসলাম নিজেদের আবিষ্কার করে যাচ্ছিল—দুই ধর্মের খাঁটি অনুসারীরা নিজেদের হৃদয় হাতড়ে যুগের জ্বলন্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতভেদ থাকার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। মানুষ সত্যিই 'গোঁড়া' হয়ে গেলেও পাশাপাশি বসবাস করায় গুরুতর

কোনো সমস্যা হয়নি। আসল সমস্যা শুরু হলো যখন পুনরুত্থানবাদের দশা নিস্তেজ হয়ে আরও সেক্যুলার মানসকাঠামোর জন্য জায়গা ছেড়ে দিল। এর কারণ হচ্ছে তত দিনে ধর্মীয় বিষয়-আশয় আর রোজকার আলোচনার বিষয় হিসেবে ছিল না, সেসব আলোচনার বিষয়বস্তু তত দিনে মোটামুটি মেনে নেওয়া হয়েছে এবং তা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। এই শতকের প্রায় তিন-চতুর্থাংশজুড়ে তীব্র আলোচনার ফলে চিন্তার এমন এক পরিবেশ তৈরি হয়েছে, যা একান্তই পুরোপুরি হিন্দু নয়তো পুরোপুরি মুসলিম। যখন খাঁটি রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মসূচির নায়কেরা দৃশ্যপটে এলেন, তাঁরা তখন একটিমাত্র ভিত্তি থেকেই নিলেন না—খ্রিষ্টধর্ম যেভাবে ইংরেজ চিন্তাধারার সাধারণ ভিত হিসেবে কাজ করেছে—দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাঁরা নিলেন পরস্পরবিচ্ছিন্ন দুটি ভিত্তি থেকে।

যদি হিন্দু সংস্কার বা পুনরুত্থানবাদ মুসলমানদের অনুরূপ ঘটনার চেয়ে আলাদা হতো, তাহলে ভারতের জন্য পরে তা আরও বড় মাপের সমস্যার সৃষ্টি করত। বাস্তবে এগুলো পরস্পরবিচ্ছিন্ন থাকার পাশাপাশি কখনো-সখনো সাংঘর্ষিকও ছিল বটে। মুসলিম সংস্কারবাদের অর্থ ছিল হিন্দুধর্মের সংস্পর্শে যেসব চর্চা ও চিন্তার অভ্যাস ইসলামে ঢুকে গিয়েছিল, সেগুলো থেকে ধর্মকে মুক্ত করা।[১৪] হিন্দু সংস্কারের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল ধর্মান্তরিতদের আবার হিন্দুধর্মের ছায়াতলে ফিরিয়ে আনার পথ ও পন্থা খুঁজে বের করা।[১৫] এবং যদিও ধর্মান্তরকরণের মিশনারি জোশ ঠেকানোর লক্ষ্যেই হিন্দু সংস্কারবাদের জন্ম হয়েছিল, তবু উদ্দেশ্য পূরণের সোনালি পন্থা হিসেবে উভয়ই কিন্তু শিক্ষার ওপর ভরসা রেখেছিল। শিক্ষার (ইংরেজি) বিস্তারে আগ্রহী মিশনারিরা উভয় পক্ষের সঙ্গেই হাতে হাত রেখে কাজ করেছে। মাঠপর্যায়ে কোম্পানি নিজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার আগপর্যন্ত শিক্ষা খাতে মিশনারিরাই ছিল মুখ্য চরিত্র।[১৬] মিশনারিদের প্রভাবের চর্চা দেখা যায় অল্প কিছু মানুষের প্রচেষ্টার মধ্যে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কেরি, ওয়ার্ড ও মার্শম্যান। (উইলিয়াম) কেরি ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলার অধ্যাপক। শতাব্দীর শুরুর দিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে তিনিই ছিলেন মূল ব্যক্তি। শুরুর সময়ে, বাংলার একজন লেখকের পক্ষে আগাম গ্রাহক জোগাড় করা ছাড়া বই প্রকাশ করা অসম্ভবই ছিল। চর্চাটা ছিল এ রকম : সম্ভাব্য লেখককে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের যথাযথ অধ্যাপকের আগ্রহ জাগাতে হতো যেন তিনি প্রতিষ্ঠানটির কাছে বইটির শ খানেক কপি কেনার সুপারিশ করেন।[১৭] একসঙ্গে অনেকগুলো কপি কেনার প্রতিশ্রুতি প্রকাশনার ভাগ্য ঠিক করে দিত। উনিশ শতকের প্রথম

ভাগে বাংলায় ছাপা হওয়া বইগুলোকে মূলত ড. উইলিয়াম কেরির কাছে প্রকাশযোগ্য মনে হতে হতো। মার্শম্যান বাংলায় ও ইংরেজিতে প্রকাশিত অন্তত তিনটি সংবাদপত্রের সম্পাদক হিসেবে তাঁর প্রভাব জাহির করতেন। তিনি *সমাচার দর্পণ* (বাংলায়), *দ্য ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া* (ইংরেজিতে) এবং পরে সরকারি গেজেটের সম্পাদক ছিলেন। বাংলা পত্রিকাটি সম্পাদনার সময় তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বর, মেজাজ ও বিন্যাসের রূপদানকারী একদল লেখকের (ভারতীয়) সহায়তা পেয়েছিলেন। এটাই তাঁর আসল গুরুত্ব।[১৮] অর্থাৎ সূচনাকালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ওপর মূলত শ্রীরামপুরের মিশনারিদেরই দাপট ছিল। যে জনগণ আগেভাগেই গোষ্ঠীগতভাবে গঠিত হয়েছে, তারা মানুষকে মূলত হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিষ্টান পরিচয়েই চিনে আসছে, তাদের মধ্যে সম্প্রদায়গত মানসিকতা ছড়ানোয় এই মিশনারি গোষ্ঠীর অবদান কতটা? এই গোষ্ঠীরই মুখপাত্র *সমাচার দর্পণ* বাঙালিকে সুসভ্য করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছে, 'যখন এটি (ফারসি ভাষা বিলোপ করার প্রবিধান) ঘোষিত হবে, প্রথমত ও প্রধানত 'যবনদের' (মুসলমানদের বর্ণনা করায় প্রবল রকম ঘৃণাসূচক একটি শব্দ, এটা অনেকটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 'হুন' শব্দ ব্যবহারের মতো) ঔদ্ধত্য কমিয়া আসিবে, যা আমাদিগের জন্য অনেক উপকারী হইবে। বাংলা ভাষা চালু হইলে পরে মুসলমানগণ বিতাড়িত হইবে কারণ তারা কস্মিনকালেও বাংলা পড়িতে বা লিখিতে পারিবে না।'[১৯]

শুরুর দিকে ভাষা ও সাহিত্যকে সাজিয়ে দেওয়ায় এই গোষ্ঠীর কাজ যতটা মূল্যবান, তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেনেসাঁর সূচনা করায়। তারা আদতে কী অর্জন করেছে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ, তবে তাদের কাজ অন্যদের যেভাবে অর্জনের পথ দেখিয়েছে, সেখানে তাদের অবদান চিরস্থায়ী। ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের সময় মিশনারিরা খুব দ্রুত মাঠ ছেড়ে চলে গেলেও তারা যাঁদের কাজে নেমে পড়তে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেসব মানুষই হয়ে উঠেছিলেন পরের প্রজন্মের দিশারি। এই ইতিহাস চলমান। এ সময়ের সাহিত্যের অন্তর্নিহিত মূল্য খুব কম, আর দেশীয় ভাষার সংবাদমাধ্যমের গুরুত্ব আরও কম। কিন্তু মিশনারিরা যে বিতর্ক উসকে দিয়েছিল; দুই সম্প্রদায়ই তাতে দারুণ উৎসাহী ছিল।

১৮৩২ সালের সংবাদমাধ্যমের কথা বলা মানে ধর্মীয় চিন্তার শাখা-প্রশাখা নিয়ে কথা বলা। চারটি অ-মিশনারি বাংলা পত্রিকাকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে : ক) *দ্য ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন*, 'বিবেচনাহীন ক্রোধে ফেনিয়ে উঠছে...তার সহায়-সম্পত্তিকে কোন অপ্রতিরোধ্য শত্রুর আকস্মিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করার

জন্য'; খ) *চন্দ্রিকা*, 'মূর্তিপূজার বিশ্বস্ত ভক্তদের গোলিয়াথ'; গ) *সংবাদ কৌমুদী*: 'এটা সেই হিন্দুদের স্বীকৃত অঙ্গ, যারা আলোকিত ইউরোপীয়দের সঙ্গে নিত্যকার ওঠবসের কারণে মূর্তিপূজাকে আপাতদৃষ্টে প্রত্যাখ্যান করতে দ্বিধা করেনি কিন্তু যাদের অনেকেই বাস্তবে এর আচার ও পালনে বাহ্যিক শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কমই দ্বিধা করত'; ঘ) *দ্য ইনকোয়ারার* ও জ্ঞান অন্বেষণ ছিল 'শিক্ষিত হিন্দুদের ছোট একটি দল, যারা তত্ত্ব ও চর্চা, উভয় ক্ষেত্রেই হিন্দুধর্মের পুরো ব্যবস্থাকেই প্রত্যাখ্যান করেছে।[২০] *দ্য ইনকোয়ারার* ছিল ইংরেজি পত্রিকা, যেমনটা ছিল *দ্য রিফর্মার*, 'দেশীয়দের পরিচালিত প্রথম ইংরেজি পত্রিকা'। অর্থাৎ সে সময় সংবাদমাধ্যম ধর্মীয় মতামতের বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত ছিল। কিন্তু তার মানে এটা না যে সংবাদমাধ্যম তখন সেক্যুলার বিষয়ে আগ্রহী ছিল না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সেক্যুলার মন, যতখানি দেখা দিত আরকি, আসলে ছিল মিশনারিদের প্রচারপত্র *সমাচার দর্পণ*-এর মতোই, আলাদা কিছু। *দ্য রিফর্মার* লিখেছিল, 'যে চেতনাগত ভিন্নতা গ্রেট ব্রিটেনের মুসলমান ও হিন্দু প্রজাদের পরিচালিত করে, তা থেকেই আমরা প্রথম পক্ষের আনুগত্যহীনতা ও দ্বিতীয় পক্ষের আনুগত্যের সুরাহা করতে পারি...সরকারকেও এ সকল ঘটনা থেকে শিখতে হবে যে যাদের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে তারা হলো মুসলমান প্রজা, যেহেতু এদের অধিকাংশই রাষ্ট্রদ্রোহ ও বিদ্রোহের প্রতি ঝুঁকে আছে।'[২১] বাংলা ভাষা চালু হলে মুসলমানরা বিতাড়িত হয়ে যাবে, *সমাচার দর্পণ*-এর এই যুক্তিটি সঠিক বলে এখানে ইঙ্গিত করা হচ্ছে না; মুসলমানরা বিতাড়িত হবে অন্য কিছু প্রবণতার জন্য। এটাও দাবি করা হচ্ছে না যে *দ্য রিফর্মার*-এর পরামর্শে সরকার কান দিয়েছিল। কিন্তু যারা পরে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করেছিল, এসব থেকে সেসব বুদ্ধিজীবীর মন বোঝার উপযুক্ত সহায়তা পাওয়া যেতে পারে। রাজনীতির মাঠে একটা টেবিলের চারপাশে বসে হিন্দু ও মুসলমান মিলে অভিন্ন কর্মসূচি ঠিক করতে না পারার অক্ষমতা মূলত শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই ব্যর্থতা। একসঙ্গে বসতে না পারার ব্যর্থতা শুরুর দিকের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ধরন ঠিক করে দিয়েছিল। এখন পর্যন্ত সেই ধারাই বহাল আছে।

বাংলা ভাষাকে আধুনিক ভাষা—আধুনিক সাহিত্যের মাধ্যম—হিসেবে পুষ্ট করায় মিশনারিরা তাদের সমস্ত সমর্থন দিয়ে গেছে। কিন্তু বিষয়টা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে এই অমূল্য কাজটি এমন কিছু মানুষের করতে হলো, যাদের কিনা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ সম্পর্কে অদ্ভুত সব ধারণা ছিল। সুচিন্তিতভাবে

বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়ন ছিল বাংলা ভাষার প্রথম পৃষ্ঠপোষকদের লালিত ধারণাগত প্রভাবের মধ্যে সবচেয়ে কম ক্ষতিকর। এদের পক্ষপাতী মনোভাবের সবচেয়ে স্থায়ী প্রভাব পড়েছিল অন্যভাবে। ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে যারা সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে, প্রকৃতপক্ষে সেই গোষ্ঠীর ভেতরকার লোকেরাই দেশের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আসলে মিশনারিরা যে কারণে ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল, দেশীয় ভাষাগুলোর পৃষ্ঠপোষকতার কারণও ছিল সেটাই। ইংল্যান্ডে যিনি ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে কথা বলেছেন, সেই গ্র্যান্টের বিপরীতে দাঁড়িয়ে কেরি, মার্শম্যান এবং বাংলার অন্যরা মনে করতেন, বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মতত্ত্বীয় রচনা দেশীয় ভাষায় সুলভ করা মানে খ্রিষ্টধর্মেরই সেবা করা। খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বকে জনপ্রিয় করার এই প্রচেষ্টাতেই বাংলা ভাষায় প্রথম গদ্য রচনার সূচনা হয়। তবে অবশ্যই এ কাজ শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। পাঠ্যবই ও জনপ্রিয় লেখাগুলো পড়লে দেশজ ভাষার উন্নয়নের মহৎ উদ্যোগে জড়িতদের পক্ষপাতী আচরণ আবারও স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। এদের সাহিত্যকর্ম দ্রুত আগুয়ান হতে থাকে। কিন্তু সাহিত্যে এই আন্দোলনের সূচনা ও প্রগতিতে যাঁদের অবদান বেশি; তাঁদের চিন্তাভাবনার ভেতরে অন্য ধর্মানুসারীদের ভবিষ্যতের জন্য অশুভ ইঙ্গিত ছিল। শিক্ষিত মানুষের বিবেকের যে জাগরণ থেকে ধর্মীয় সংস্কারের সূচনা হলো, তা পাকাপাকিভাবে প্রকাশিত হলো ধর্মীয় রচনায়। পুরো জনগোষ্ঠীকে ধারণ করার মতো উদারতা এর ছিল না।

১৮৩৫ সাল এবং ১৮৬৫-এ প্রথম উপন্যাসের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের মাঝের সময়টাকে দাগিয়ে নেওয়া যায় অসাধারণ সাহিত্যমানের দুটি পত্রিকা ও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কবির যুগ হিসেবে। *সংবাদ প্রভাকর* নামের পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* দায়িত্বে ছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত। আগের মতোই এ যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মীয় বিষয়াদিতে আচ্ছন্ন থাকা। এমনকি সমাজের পুনর্গঠনের কল্পনা করার সময়ও ধর্মীয় নীতিমালার মাধ্যমেই তা উদ্ভাবিত হলো। অর্থাৎ সে সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখালেখিও ব্যস্ত থেকেছে শুধু জনগণের একটি অংশের জীবন পুনর্গঠনের চিন্তায়। এ যুগের শেষ দিকে এসে মানুষ যখন ধর্মনিরপেক্ষ জায়গা থেকে স্বাধীন রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করার উদ্যোগ নিল, তখনো কিন্তু একটি বিশেষ অংশকে নিয়ে চিন্তা করার বদভ্যাসটি বজায় থাকল। বাস্তবে ১৮৭০-এর দশকে, যে সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলনগুলো শুরু হয়, তখনো কিন্তু ধর্মীয় যুগের সমাপ্তি আসেনি। ১৮৭০ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত কালটি

ছিল আগের ৭০ বছরের ধর্মীয় গাঁজনের পূর্ণ বিকাশের দুর্দান্ত সময়। এই যুগের দাপুটে ব্যক্তিরা কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনাকারীরা নন, বরং কেশব সেন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ধর্ম নিয়ে পড়ে থাকা ব্যক্তিরা। সেক্যুলার এবং পুরোপুরি ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্যে যোগসূত্র ছিলেন বঙ্কিম। নিজেকে পুরোপুরি ধর্মীয় করে তুলে তিনি এ কাজটি সম্পাদন করেন। তাঁর অসাধারণ সাহিত্যপ্রতিভা ব্যবহৃত হয়েছে এমন সব বিষয়ের আলোচনায়, যা তাঁকে শিক্ষিত শ্রেণির বিশেষ অংশের অনুরাগভাজন করে তোলে। আসলে তিনি আরও একটি ধাপ পার হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রায় সমস্ত সাহিত্যকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে বিরাজ করেছে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যকার দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ সে সময়ের ইতিহাসের নির্জলা পাঠ্যবইগুলো যা মোটামুটি রেখেঢেকে বলত, উপন্যাসের আদলে তা তিনি স্পষ্ট করে গেছেন।

এই সময়ের লেখালেখির উচ্চাভিলাষ ও সাহিত্যিক মান নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু পুরো সমাজকে ধারণ করে, এমন চেতনা এসব লেখায় পুরোপুরি অনুপস্থিত। এ ধরনের লেখা তরুণ বাংলাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। শুধু হিন্দু তরুণদেরই হয়তো আলোড়িত করেছে। লেখাগুলো নিছক মুসলমানবিরোধী, তা নয়। এসব লেখার সবচেয়ে লক্ষণীয় দিক হলো, একই দেশে বসবাসকারী বিশালসংখ্যক মানুষের সম্পর্কে কোনো কৌতূহল সেখানে দেখা যায় না। এমনকি আগ্রহের পরিধি যখন পুরোপুরি সামাজিক প্রশ্নকে আমলে আনার মতো বড় হচ্ছে, তখনো প্রশ্নগুলো ওতপ্রোতভাবে ধর্মের সঙ্গেই জড়িত থেকেছে। সতীদাহ প্রথা এবং পরের কালে বিধবাবিবাহজনিত সমস্যা নিয়ে রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো লেখকদের হাত দিয়ে উঁচু মানের সাহিত্যিক রচনা তৈরি হয়েছিল। এসব নিয়ে সমাজে প্রতিক্রিয়াও দেখা দেয়। সমাজ মানে অবশ্যই হিন্দু সমাজ। অন্য কেউ এসব বিষয়ে কোনো আগ্রহ দেখায়নি, কেউ তা দেখালেও সেটিকে স্বাগত জানানো হতো না। যেন সামাজিক চিন্তা ধর্মীয় চিন্তারই একটা দিকমাত্র।

এই নতুন ও প্রবল জাগরণের মধ্যে যাদের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান প্রতিফলিত হয়নি, সেসব নিয়ে কী করা হবে, এই প্রশ্ন সে যুগের কারও মনে কখনো জাগেনি বলেই মনে হয়। যা ঘটেছে, এখানে তার সমালোচনা করা হচ্ছে না। বরং এমন বিকাশের ফলে যে জটিলতাগুলোর সৃষ্টি হওয়ার কথা, সেদিকে নজরপাত করা হচ্ছে মাত্র। যেহেতু রাজনৈতিক তৎপরতা ও রাজনৈতিক চিন্তা সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশের সঙ্গে অনেকটাই জড়িত,

সেহেতু সেসবের প্রভাবে রাজনীতি এহেন পঙ্গুত্ব নিয়েই চলতে বাধ্য হলো। একতরফা ও খণ্ডিত চিন্তার বিকাশ ভবিষ্যতের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে বাধ্য।

কিন্তু খণ্ডিত ও ধর্মীয় ধারার বিকাশের চেয়ে গুরুতর বিষয় ছিল সেক্যুলার শিক্ষা। এর মাধ্যমেই তরুণ ভারত পুষ্ট হচ্ছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস বিষয়ে ইংরেজিতে লেখা মারাত্মক সব পাঠ্যবই অনেক ক্ষতি করে ফেলেছিল। একই জিনিস দেশীয় ভাষায় লেখা হলে ক্ষতির মাত্রা বহুগুণ বেড়ে গেল। বিকৃত গল্পগুলো আশ্রয় করে যখন অসামান্য সব কল্পকাহিনি লেখা হলো, তখন ক্ষতি সীমাহীন ও স্থায়ী হয়ে গেল। ঐতিহাসিক স্মৃতি কল্পনার সৃষ্টি দিয়ে আরও পুষ্ট হয়, বিশেষ করে যখন সেই কল্পকাহিনির স্রষ্টা হন বড় মাপের কোনো লেখক। কাঠখোট্টা ইতিহাসের পাঠ্যবইয়ের চেয়ে তার প্রভাব হয় অনেক গুণ বেশি। এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক, ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিমান ও সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক বঙ্কিমচন্দ্র ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর প্রায় প্রতিটি লেখায় হিন্দু ও মুসলমানদের ভাবাবেগ উসকে দেওয়ার কাজ বেছে নিলেন। ১৮৬৫ সালে প্রথম রচনা প্রকাশের পর থেকেই কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার সর্বাধিক পঠিত লেখক। রামমোহন থেকে শুরু করে বিবেকানন্দ পর্যন্ত ঊনিশ শতকে যাঁরাই পুরোদমে ধর্মীয় চিন্তা ও অনুশীলনের পুনর্গঠন নিয়ে ভেবেছেন, তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমই ছিলেন সৃষ্টিশীল তৎপরতার আঙিনার সবচেয়ে দাপটশালী লেখক। তাঁর 'বন্দে মাতরম' গানটি মানুষের চিন্তা ও কল্পনার ওপর তাঁর প্রভাবের অনড় ও স্থায়ী স্তম্ভ হিসেবে আজও দাঁড়িয়ে। গানটি তাঁর বহুল পঠিত বই *আনন্দমঠ*-এর অংশ। হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব বিষয়ে সবচেয়ে জ্বালাময় রচনাগুলোর অন্যতম এই বই। রাজনৈতিক ভাবধারা নিয়ে লেখা প্রথম সৃজনশীল—এর সাহিত্যিক মান অতি উত্তম—কাজও এটিই। যুব বাংলা বিপুল উদ্যমে এতে সাড়া দিল। এটা ছিল বিধর্মীদের (মুসলিমদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়া সন্তানদের 'মা-কে আবাহনের' (বন্দে মাতরম) রণসংগীত। বইটি এক প্রতিভাধরের সৃষ্টি। মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের মন্ত্র সৃজনে তিনি তাঁর সমস্ত প্রতিভাকে খাটিয়ে নিয়েছেন। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮২ সালে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার তিন বছর আগে। এমনকি গোড়ার বছরগুলোতেও, কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে জড়ো হওয়া নেতারা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রীতিময় সম্পর্ক অর্জনকে কদর করতেন। বাড়তে থাকা জাতীয় আন্দোলনের এই মূলমঞ্চে এমন সম্পর্ক কামনায় প্রস্তাবের পর প্রস্তাব পাস হয়েছে। সে রকম এক জাতীয় আন্দোলন কেমন করে এমন একটি বই থেকে তার 'দলীয় সংগীত' (Theme

song) বেছে নিল? কীভাবেই-বা বইটি এত জনপ্রিয় হলো? এমন অনুমান করা অসংগত হয় না যে গল্পটি এমন এক পাঠকশ্রেণির কাছে বলা হয়, যাদের কাছে একে স্বাভাবিক ও সহজাত বলে মনে হয়েছিল। (মার্কিন সিনেমায় 'কালো মানুষদের' উপস্থাপনের ধরন ঠিক এই মানসিকতারই ইঙ্গিত দেয়)।

উনিশ শতকের শুরুর দিকের বুদ্ধিবৃত্তিক গাঁজন এবং সাধারণ আত্মানুসন্ধান একই সঙ্গে এগিয়েছে। আঠারো শতকে মোগল প্রশাসনিক ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় কাঠামোর বিলুপ্তি এবং সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যের প্রভাবের পরিণতিতে উনিশ শতকের নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক বিন্যাস তৈরি হয়। সারা দেশের জনগণের মধ্যে এই দুই সমান্তরাল প্রক্রিয়া একে অপরের সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ ছাড়াই চলতে থাকে। উনিশ শতকের শুরুর দিকের যাবতীয় প্রচেষ্টার গোড়ায় ধর্ম চলে আসায় উভয় ধারার যৌথতার বদলে সমান্তরাল চলনই অনিবার্য হয়ে ওঠে। যতক্ষণ পর্যন্ত মূল আগ্রহ ধর্মকেন্দ্রিক ছিল অথবা সামাজিক প্রশ্ন ধর্মীয় আচার-আচরণের সঙ্গে জড়িত ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত দুটি সমান্তরাল ধারা ঐকতান বজায় রেখেছে। এই ঐকতান কিন্তু বিচক্ষণ সহনশীলতার ফল ছিল না, বরং ছিল চরম উদাসীনতার নজির। কিন্তু এই কালপর্বে সেক্যুলার জ্ঞান এমন মাত্রায় বিষাক্ত ইতিহাসবোধ ঢুকিয়ে দিয়েছিল; তা জনগণের একটি অংশকে অপর অংশের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণার দিকে ঠেলে দেয়। এভাবে জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কঠিন দেয়াল তৈরি হয়ে গেল। বঙ্কিমের মতো প্রতিভাবান এবং অন্যান্য কম প্রতিভাবান লেখকদের হাতে পাঠ্যবইয়ের লেখার পরীক্ষামূলক ও অশৈল্পিক প্রচেষ্টা নান্দনিক সুষমার আদলে সমৃদ্ধ হয়েছিল। সমসাময়িক পুনরুত্থানবাদী হাওয়া এসবের জনপ্রিয়তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু বইগুলোর বিষয়বস্তুর সমালোচনা তো দূরের কথা, শিক্ষিত জনতা বরং সেসব বুকে টেনে নিয়েছিল। এই শিক্ষিত জনতাকে তো বঙ্কিম ও তাঁর সমসাময়িকেরা তৈরি করেননি। অর্ধশতাব্দী ধরে গোষ্ঠীগত চিন্তাধারা এবং গোষ্ঠীগত বিকাশের মাধ্যমে যে জমি তৈরি করা হয়েছিল, এসব ছিল তারই ফল। ১৮৭০-এর দশক থেকে খেটেখুটে রাজনৈতিক চিন্তা ও রাজনৈতিক আন্দোলনের যে ঐতিহ্য তৈরি করা হয়েছিল, উনিশ শতকে এসে তার রূপ না ছিল ভারতীয়, না বাঙালি, না মারাঠি; তা ছিল হয় হিন্দু নয়তো মুসলমানি ঐতিহ্য। একজন বাঙালি লেখক, তা তিনি প্রতিভাবানই হোন বা প্রতিভাহীন, রাজপুত বা মারাঠির মধ্যে তাঁর গল্পের নায়ক খুঁজে নিতে পারেন; যদিও মারাঠিদের ব্যাপারে তাঁর একমাত্র স্মৃতি হলো বাংলায় তাদের আক্রমণ ও

লুটপাটের ঘটনা। সংযোগটি অবশ্যই ধর্মীয়। ভারতের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ—পাকিস্তান বিতর্কের চেয়েও এটা অনেক পুরোনো—ভারতীয় রাজনীতিতে স্বার্থান্বেষী দলগুলোর সাম্প্রদায়িকতার পরিণতি নয়। অপ্রতিরোধ্যভাবে এটা চলে এসেছে—অন্ততপক্ষে শিক্ষিত শ্রেণির ভেতরের একটা ঘটনা হিসেবে—উনিশ শতকের সামগ্রিক বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের হাত ধরে। উনিশ শতকের সমান্তরাল কিন্তু গোষ্ঠীকেন্দ্রিক, একতরফা ও সংকীর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক ধারার মধ্যে এটা দেখা যায়। রাজনৈতিক আন্দোলনের চরিত্র এবং তার অন্তর্নিহিত সারবস্তু মূলত উনিশ শতকের বুদ্ধিবৃত্তিক গড়নকেই অনুসরণ করেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় লেখা সাহিত্যের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় না থাকলে এটা বোঝা যাবে না। উনিশ শতক থেকে ভারতবর্ষের মানুষের সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপ অনেকগুলো সাহিত্যের বিকাশের ভেতর দিয়ে পূর্ণ অভিব্যক্তি খুঁজে পায়। যে ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে শিক্ষিত ভারতীয়রা সচেতন রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেছিল, তার চিন্তাগত জলবায়ুর জোগান দিয়েছিল দেশজ সাহিত্য।

রাজনৈতিক সভা ও সম্মেলন অথবা সেসবের কার্যবিবরণী পর্যালোচনা থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনের মর্মমূলে কিসের সমাদর চলে, সেখানে পৌঁছানোর পথ মিলবে না। ভারতবর্ষের মুসলমানরা কেন একগুঁয়েভাবে আলাদা রাজনৈতিক পথ বেছে নিল? কেবল এসব উপাদান দিয়ে অথবা সংবাদপত্রের রাজনৈতিক লেখালেখি থেকে যাঁরা ভারতীয় রাজনীতির সারবস্তু ও গতিধারা বুঝতে চান, এ প্রশ্নের উত্তর তাঁদের কাছে অব্যাখ্যাতই থেকে যাবে। যদিও এসব রাজনৈতিক আন্দোলনে বিপুলসংখ্যক মানুষ গোচরে ও অগোচরে শামিল হয়েছে, কিন্তু আন্দোলনগুলোর চরিত্র নির্ধারিত হয়েছে শিক্ষিত পেশাজীবীদের দ্বারা। ভারতের শিক্ষিত মানুষ গড়ে উঠেছিল একটি নয় বরং দুটি ঐতিহ্যের মাধ্যমে। এবং দুর্ভাগ্যবশত, এ ধারা দুটি একে অন্যের থেকে আলাদাই ছিল। ফলে যখন তারা সর্বজনীন সমস্যা নিয়েও আলোচনা করেছে, এমনকি তখনো তারা দুটি সম্পূর্ণ আলাদা মানসিক ভিত্তিভূমি থেকে আলোচনা শুরু করেছে। দেশের সাহিত্যের যে অংশটি মুসলমানদের হাতে সমৃদ্ধ হয়েছিল, তারও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইসলাম ও সাধারণ মুসলমানদের জীবনের ব্যাপারে বহির্মুখী। ১৯২০-এর যে খেলাফত আন্দোলনে গান্ধী দক্ষভাবে সহায়তা করেছিলেন, শুধু এই বহির্মুখী দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে তা ভালোভাবে বোঝা সম্ভব। গান্ধী এই আন্দোলনের তাৎপর্য বুঝতে—জীবন সম্পর্কে কোন দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে তা গড়ে উঠেছিল সেটা বুঝতে—কতটা মর্মান্তিকভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তা আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়

এ আন্দোলনের সাফল্য থেকে তিনি কী আশা করেছিলেন, সেটা দেখলে। তিনি আসলে বিশ্বাস করতেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্য এবং রাজনৈতিক সাফল্য তখনই আসবে যখন হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মের মানুষ আরও ধর্মপরায়ণ হয়ে উঠবে।

আমরা এ পর্যন্ত দাবি করেছি যে শিক্ষিত ভারতীয়দের মন আলাদা খুপরিতে বেড়ে উঠেছে। বাংলার রেনেসাঁর ইতিহাস হলো বাংলার হিন্দু সমাজে আধুনিক ধ্যানধারণা চালু করার ইতিহাস। সাহিত্যের দলিল-দস্তাবেজ থেকে, বিশেষ করে সৃজনশীল সাহিত্যে নিহিত চিন্তার ইতিহাস থেকে যত দূর খুঁজে পাওয়া যায়, বাংলার অ-হিন্দু জনগোষ্ঠীর জীবনে এর কোনো প্রাসঙ্গিকতা ছিল না। বাংলার চিন্তার ইতিহাস যদি ভারতবর্ষের চিন্তার ইতিহাস হতো, তাহলে হয়তো এ সমস্যার কোনো না কোনো সমাধান পাওয়া যেত, আরও পরে গিয়ে ভারতবর্ষকেও হতভম্ব হতে হতো না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এমন কেউ ছিল না, যিনি ভাবতেন যে গোটা ভারত আসলে একটাই সমাজ। এ সমাজ না মুসলমানের না হিন্দুর। তাই যে সময়ে বাংলায় রামমোহন রায় আত্মানুসন্ধানের সূচনা করেছিলেন, তখন অন্য সমাজেও যে একই রকম আত্মানুসন্ধান শুরু হয়েছিল; তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। তবে একটি সমাজ অন্য সমাজ থেকে কতটা দূরে ছিল, তা বোঝা যায় একটি ঘটনা থেকে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে যখন বাংলায় মুসলিম জাগরণ ছড়িয়ে পড়েছিল, বাংলার নয়া সংবাদপত্রে তা কখনোই জায়গা করে নিতে পারেনি, বিকশিত হওয়া নতুন সাহিত্যেও এর কোনো প্রতিফলন ঘটেনি।

কিন্তু এই জাগরণ ছিল বাস্তবতা। এমনকি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হস্তক্ষেপ ছাড়াই, আঠারো শতকজুড়ে দ্রুতগতিতে সমাজের ভাঙন ঘটে চলছিল। সমাজে যখন ভাঙন শুরু হলো, তখন চিন্তাশীল মানুষেরা তাঁদের অন্তরের ভেতর খুঁজে দেখতে শুরু করলেন এবং মূলত দিল্লি শহরকে ঘিরে নতুন জীবনের আলোড়ন শুরু হলো। এই ব্যক্তিরা ঠিক পশ্চিমের প্রভাবে ততটা প্ররোচিত হননি। আঠারো শতকের শেষের দিকে এবং উনিশ শতকের শুরুতে মুসলিম সমাজের জন্য শাহ ওয়ালীউল্লাহ, শাহ আবদুল আজিজ ও সৈয়দ আহমেদ বেরেলভি ঠিক তাই ছিলেন, হিন্দু সমাজের জন্য যা ছিলেন রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁর কাছের অনুসারীরা। এই দুই তরফের মধ্যে পার্থক্য তো বটেই ছিল, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবধান অনেক বিরাটও। কিন্তু এই দুই আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গিতে মিলও ছিল অনেক। এরা উভয়েই সমাজ পুনর্গঠন করতে চেয়েছিল। কিন্তু যে নীতির নিরিখে সমাজকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল, তা ছিল ধর্মীয়। এর ফলে

যে চিন্তার উদয় ঘটেছিল, তা ছিল গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। এমনকি এটি যখন সামাজিক এবং পরে রাজনৈতিক প্রশ্নগুলোকে স্পর্শ করেছে, তখনো। ভারতবর্ষের সব জনগণের জন্য এর কোনো প্রাসঙ্গিকতা ছিল না। সৈয়দ আহমদ বেরেলভি ও তাঁর অনুসারীরা যে ধর্মীয় মতবাদের প্রচারণা করেছিলেন, তা মুসলিম সমাজে গৃহীত হয়নি। এমনকি রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যদের ব্রাহ্ম ধর্মতত্ত্বও কিন্তু মূলধারার হিন্দু সমাজে গৃহীত হয়নি। সৈয়দ আহমদ বেরেলভি এবং বাংলায় ফরায়েজিদের নেতা হাজী শরীয়তউল্লাহর আন্দোলনের কিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব অস্বীকার করা শিক্ষিত মুসলমানদের জন্য বিশেষ বেদনার ছিল। কিন্তু শিক্ষিত মুসলমানরা আন্দোলনের মৌলিক ধারণার সেই উপাদানটিকে অস্বীকারের চেষ্টা করতে পারেনি কিংবা করেনি; যা তাদের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। মুসলিম চিন্তাধারা এবং মুসলিম সমাজের পুনরুজ্জীবন ও পুনর্গঠনের প্রতি শিক্ষিত মুসলমানরা নিজেদের নিবেদিত করেছিলেন। ভারতীয় সমাজে তাঁদের সহযাত্রীদের মধ্যে যাঁরা অমুসলিম, তাঁদের প্রতি তাঁরা ঠিক সে রকম উদাসীনতা প্রদর্শন করেছেন, শিক্ষিত হিন্দুরা যেমনটা দেখিয়েছেন তাঁদের ভিন্নধর্মী স্বদেশবাসীদের প্রতি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের উর্দু সাহিত্যের মূল ভাবধারার মধ্যে ভারতবর্ষের জনসংখ্যার অমুসলিম অংশগুলোর কোনো উল্লেখ বা প্রাসঙ্গিকতা ছিল না।

রাজা রামমোহন রায় যে আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক, যেখানে শাসকশ্রেণি তার পূর্ণ গৌরব ও ক্ষমতা নিয়ে বজায় ছিল। আন্দোলনটি মূলত মিশনারি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা ছিল। ইংরেজি শিক্ষার প্রসার এবং স্থানীয় ভাষার চর্চা এ আন্দোলনের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে যুক্ত ছিল। দীর্ঘ মেয়াদে, শাসকশ্রেণির ভাষাচর্চা স্থানীয় সমাজে এই শ্রেণির মর্যাদা নির্ধারণে ভূমিকা রেখেছিল। তবে দিল্লি এবং এর আশপাশে মুসলমানদের মধ্যে একই রকম যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তা ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে জড়িত ছিল না, তা-ও কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এটি লক্ষণীয় যে সে যুগে মুসলমানদের পক্ষে হিন্দুদের সমান্তরালে ইংরেজি শিক্ষার সাধনা ছাড়াই গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাভাবনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। ইংরেজির জ্ঞান ছাড়াই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে চাকরি পাওয়া যেত; এই বিষয়টি সেই ভাষার জ্ঞান অর্জনের প্রতি মুসলমানদের উদাসীন করে তুলেছিল। কিন্তু এই প্রবণতা বিকাশের ফল কেবল উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করে, যখন স্থানীয়দের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার

বিষয়টি প্রায় পুরোপুরিভাবে ইংরেজি শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে।

এ দুটি আন্দোলনের আলাদা বিকাশের আরও দুটি ফল লক্ষ করা যায়। রাজা রামমোহন রায় যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তা কখনোই ক্রমবর্ধমান ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বাইরে যায়নি। এর বিজয়যাত্রা ধীর হলেও স্থির ছিল এবং এটি গতিপথ পরিবর্তন করেনি। অধুনা পর্যন্ত (অর্থাৎ, ১৯৪০-এর দশকে) শাসকশ্রেণির সঙ্গে আন্দোলনের এবং এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সম্পর্ক সামগ্রিকভাবে বন্ধুত্বপূর্ণই ছিল। মেকলের সময় থেকেই শাসকশ্রেণি ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে যথেষ্ট গর্ব অনুভব করত। কারণ, তারা বিশ্বাস করত, নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ সম্পূর্ণরূপে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারেরই ফল। শিক্ষিত শ্রেণি জানত যে সমাজে তার সমৃদ্ধি ও মর্যাদা প্রচলিত প্রশাসনব্যবস্থা বজায় থাকার সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধা। এই শিক্ষিত শ্রেণির সামাজিক দর্শনের মৌলিক ধ্যানধারণা শাসকশ্রেণিকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারেনি। এমনকি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান অর্জন যে নতুন দেশীয় ভাষার বিকাশ, সেটা শেখাও ছিল কষ্টসাধ্য। ১৮৭০-এর দশকে এবং তারও পরে, আগের সময়ের বাংলায় সংস্কৃত ভাষার শব্দের ছড়াছড়ি অপসারণে জোরালো চেষ্টা চালানো হয়েছিল। নতুন সাহিত্যের অর্জনগুলো কিছু সময়ের জন্য তুলনামূলকভাবে একটি ছোট শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যদিকে সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর আন্দোলন খুব দ্রুতই সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর দিকে নজর দিতে শুরু করে।[২২] এ আন্দোলনের ভাষা শিক্ষিত মানুষের শেখানো বুলি ছিল না। এ আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য বিপজ্জনক ছিল এবং একই সঙ্গে মুসলমানদের শিক্ষিত একটি অংশের জন্যও হুমকির ছিল। অর্থাৎ, মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, সেই শ্রেণির অতিরিক্ত দায়িত্ব ছিল এমন সব মানুষের চিন্তাভাবনাকে অস্বীকার করা, যাঁরা সমাজের চিন্তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। সুতরাং রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত আন্দোলন যেমন সুশৃঙ্খল ছিল, মুসলমানদের এই আন্দোলন তেমন সাজানো-গোছানো ছিল না। এসব চিন্তার মূল শিকড় পোঁতা ছিল নির্দিষ্ট একটা ঐতিহ্যের মধ্যে। এমনকি স্যার সৈয়দ আহমদ খান, যিনি সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর মতবাদের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ ছিলেন, তিনিও কিন্তু মূলত ধর্মীয় চিন্তাধারার পুনর্গঠন নিয়ে আলোচনা করেছেন—যে ঐতিহ্যকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানরা ভয় পেতেন। সংখ্যালঘু এই মধ্যবিত্তকে তাই এমন এক সংশয়ের মুখোমুখি হতে হলো, যে সংশয় অন্য মধ্যবিত্তদের

মোকাবিলা করতে হয়নি। মধ্যবিত্ত মুসলমানকে নিজের সমস্যা তাই নিজেরই সমাধান করতে হয়েছে এবং তার ওপরে আবার বিরূপ শ্রোতাদের নিজের পক্ষেও টানতে হয়েছে। ১৮৭০-এর দশকে মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বিভ্রান্তির মূল কারণ ছিল এটাই। একদিকে তাদের বাস্তব সমস্যার সমাধানের জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে, অন্যদিকে আবার অন্যদেরও বোঝাতে হয়েছে।

উর্দু সাহিত্যের বিকাশ—বাংলার মতো—এমন ছিল যে গড়পড়তা শিক্ষিত হিন্দু এর অধ্যয়নে স্বস্তি বোধ করত না। দুর্ভাগ্যবশত, এটা স্বীকার করতেই হবে, উত্তর ভারতের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত (উর্দুর নানান ধরন) সাহিত্য একধরনের ভ্রান্ত 'জাতীয়তাবাদী' চেতনার হাতেই বরং বেশি নাকাল হয়েছে, অন্য কারণে ততটা নয়। এই চেতনাকে সাম্প্রদায়িকতা থেকে আলাদা করা মুশকিলই ছিল। উত্তর ভারতের কিছু জায়গায় স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এমন হিন্দু ছাত্র পাওয়া স্বাভাবিক যারা মনে করত অন্য ভাষাকে নিজের চিন্তা থেকে বের করে দেওয়াটা হিন্দির প্রতি তাদের কর্তব্য। অথচ তাদের পূর্বপুরুষেরা মাত্র এক বা দুই প্রজন্ম আগে এসব ভাষায় তুমুল পারদর্শী ছিলেন।[২৩] মোদ্দা কথা, উর্দু সাহিত্যের বিষয়টাই এমন যে মুসলমানদের কাছে এর আবেদন প্রায় একচেটিয়া। বাংলা ভাষায় *আনন্দমঠ* যে স্থান দখল করে আছে, উর্দু ভাষায় সেই জায়গা দখল করে আছে ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত হালির একটি কবিতা। হালির *মুসাদ্দাস* ইসলামের উত্থান ও পতনের গল্প। স্নাতক পর্যায়ের একজন গড়পড়তা হিন্দু ছাত্র ইসলামের সমৃদ্ধি ও পতনের গল্প নিয়ে যে উৎসাহী হবে না, এটাই স্বাভাবিক। তা সে স্যার সৈয়দ আহমদই হোন আর মোহাম্মদ আজাদ তাকাউল্লাহ বা নাজির আহমদই হোন, এঁরা ভারী গদ্যে যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, তা কেবল মুসলমানদের জন্যই প্রাসঙ্গিক। তাঁরা যে সমাজ পুনর্গঠন করতে চেয়েছেন, তা ছিল মুসলমান সমাজ। এ কারণেই কিন্তু হালির বিলাপ উর্দু সাহিত্যের স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের হিন্দু ছাত্রদের আগ্রহী করে তুলতে সফল হয়নি।

যে স্থায়ী ঐতিহ্যের ওপর দাঁড়িয়ে পরের কালের রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল; তাকে জানতে হলে প্রথমে অবশ্যই সে সময়ের কালোত্তীর্ণ সাহিত্যচর্চার ভেতরে সন্ধান চালাতে হবে। কারণ, রাজনৈতিক আন্দোলন হচ্ছে শিক্ষিত শ্রেণির মনের প্রতিফলন। এ শ্রেণির হাতে গড়া সাহিত্যে সেই মনের ছবি সবচেয়ে ভালোভাবে সংরক্ষিত আছে। এই সাহিত্যের চরিত্র ও বিষয়বস্তু, পক্ষপাত ও ঝোঁক, তাদের পছন্দের বিষয়বস্তু এবং যেসব উৎস থেকে লেখকেরা এসবের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, তা রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর অন্তর্নিহিত স্রোতের

গতিপ্রকৃতি বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে। যে বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের ওপর অধিকারের ভিত্তিতে শিক্ষিত ভারতীয়রা অশিক্ষিতসহ সমগ্র জনগণের রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল, সেই ঐতিহ্য বড়ই সন্দেহজনক এক সম্পদ।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. ১৭৯২ থেকে ১৮২২ সালের মধ্যে এ দেশের বহির্বাণিজ্যের চরিত্রে রীতিমতো বিপ্লব ঘটে যায়, এর প্রভাব পড়ে সমাজের নানা শ্রেণির অগণিত মানুষের ওপর। ১৭৯২ সালে ভারতবর্ষ থেকে প্রায় ১.২ মিলিয়ন টুকরা কাপড় বহির্বিশ্বে রপ্তানি হয়েছিল, কিন্তু ১৮২২ সালে তা নেমে আসে মাত্র ১০০ খানিরও কমে। এর আগে, বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছিল মাত্র ১৬ হাজার ৫০ রুপি সমমূল্যের বস্ত্র। ১৮২২ সালে বিদেশ থেকে আমদানি করা বস্ত্রের মূল্য দাঁড়ায় ১১ মিলিয়ন রুপিরও বেশি। ১৭৯২ সালে দেশ থেকে নীল রপ্তানি করা হয় ৭ হাজার ২৬৬ মণ। ১৮২২ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় এক লাখ মণে। *সমাচার দর্পণ*, ১৫ ডিসেম্বর ১৮২৭।

২. উচ্চশিক্ষার চাহিদা কত তীব্র, তা স্পষ্ট হয় আরও কিছুদিন পরে। ১৮৫৪ সালের এডুকেশন ডেসপ্যাচ আইনের আসল উদ্দেশ্য যাদের ওপর সরকার বরাবর নির্ভর করে এসেছে, তাদের ওপর নির্ভরতা কমানো এবং অন্যান্য শ্রেণিভুক্ত মানুষের মধ্যে শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া। সেই সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম বিষয়ে নীতিমালা তৈরি করা। ১৮৫৯ সালের বিধানেও কিন্তু একই বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আর্থার পি হাওয়েল, *আ নোট অন দ্য স্টেট অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া*, ১৮৭৬-৭৭, পৃ. ২।
[সম্পূর্ণ রেফারেন্সের জন্য দ্রষ্টব্য, আর্থার পি হাওয়েল, *আ নোট অন দ্য স্টেট অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া প্রায়র টু ১৮৫৪, ১৮৭৬-৭৭*। ক্যালকাটা : অফিস অব দ্য সুপারিনটেনডেন্ট অব গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং, ১৮৭২, পৃ. ২]

৩. ভারতবর্ষের রেলওয়ের বিকাশ-সম্পর্কিত একটা গবেষণাপত্র থেকে (১৮৪৮), পৃ. ৩-৬ [খুঁজে পাওয়া যায়নি]। [স্যার উইলিয়াম প্যাট্রিক অ্যান্ড্রু, *ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ অ্যান্ড দেয়ার প্রবাবল রেজাল্টজ উইথ ম্যাপস অ্যান্ড অ্যান অ্যাপেন্ডিক্স, কনটেইনিং স্ট্যাটিসটিকস অব ইন্টারনাল অ্যান্ড এক্সটারনাল কমার্স অব ইন্ডিয়া বাই অ্যান ওল্ড ইন্ডিয়ান পোস্টমাস্টার*, লন্ডন : টি সি নিউবি, তৃতীয় সংস্করণ ১৮৪৮, পৃ. ৮-৫১।

৪. এমনকি সেই সুদূর অতীতেও বস্তুগত পরিবর্তনের কারণে চিন্তার জগতে পরিবর্তন অচিন্তনীয় ছিল না। এক পত্রিকার সাংবাদিক লিখেছিলেন, 'নতুন চীনা বাজারে কিছুদিন আগে এক দোকানদারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। তিনি বিপ্লবী বা উদারপন্থীদের খুব একহাত নিলেন...নতুন প্রজন্ম যেসব নতুন রীতিনীতি এবং চিন্তাভাবনা আত্মস্থ করছে, সেগুলোর তুমুল সমালোচনা করলেন...অথচ এই লোকটা নিজেই কিন্তু সংরক্ষিত মাছ, মাংস, শ্যাম্পেন, বিয়ার, এসবের ব্যবসা করেন...এই লোকের দোকানের পেছনে যে মদের দোকানটি আছে, তার মালিক এক ব্রাহ্মণ, আরেকজন আছেন, যিনি এক প্রভিশনারের সিনিয়র সহকারী, যাঁকে গরুর মাংস হাত দিয়ে

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হয়, তা ঠিক আছে কি না। এরা কী করছে, তা এরা ঠিকভাবে বোঝে তো?' *দ্য ইনকোয়ারার*, ১৮ অক্টোবর ১৮৩১।

৫. লোকনাথ ঘোষের দুই খণ্ডের *মডার্ন হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান চিফস, রাজাস, জামিনদারস, এটসেট্রা*, [জে এন ঘোষ অ্যান্ড কোং, ক্যালকাটা : ১৮৭৯ ও ১৮৮১] হলো মূলত সেসব মানুষের স্মৃতিকথা যাঁদের পূর্বসূরিরা 'জমিদার' হয়েছিলেন কোম্পানিতে চাকরি করা কিংবা কোম্পানির চাকর হওয়ার সুবাদে।

৬. কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল ১৭৮০ সালে যখন প্রধানত মুসলিম আইনেই আদালত চলত এবং এর কাজ ছিল এই আইনে পারদর্শী মানুষের জোগান দেওয়া। এ সি সান্যাল, 'ক্যালকাটা মাদ্রাসা' *বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট*, জানুয়ারি-জুন, ১৯১৪, দ্রষ্টব্য। আরও দ্রষ্টব্য চার্লস ল্যাশিংটন, দ্য হিস্টরি ডিজাইন অ্যান্ড প্রেজেন্ট স্টেট অব দ্য রিলিজিয়ন্স, বেনেভোলেন্ট ইনস্টিটিউশনস ফাউন্ডেড বাই দ্য ব্রিটিশ ইন ক্যালকাটা অ্যান্ড ইটস ভিসিনিটি, [ক্যালকাটা : হিন্দুস্তানি প্রেস, ১৮২৪], অ্যাপেন্ডিক্স নো 7, XXXI-XXXIII

৭. কলকাতা মাদ্রাসার সিলেবাসের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন স্যার ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, 'প্রায় নব্বই বছর ধরে (অর্থাৎ সূচনাকাল থেকে) সেখানকার সবচেয়ে জনপ্রিয় পঠনের বিষয় ছিল বিধর্মীদের সঙ্গে যুদ্ধের ইতিহাস।' [উইলিয়াম উইলসন হান্টার, *ইন্ডিয়ান মুসলমানস*, লন্ডন, ট্রুবনার অ্যান্ড কোম্পানি, থার্ড এডিশন : ১৮৭৬, পৃ. ২০৪]

৮. *দ্য ক্যালকাটা রিভিউ*, ভলিউম ২, জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৪৯, পৃ. ২১৩-২৪৬।

৯. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অ্যাক্ট ১৮১৩-তে বলা আছে, '...সাহিত্যের পুনর্জাগরণ ও উন্নতির লক্ষ্যে এবং স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গকে উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে এবং ভারতবর্ষের ব্রিটিশ ভূখণ্ডের জনগণের বিজ্ঞানচর্চা প্রারম্ভের লক্ষ্যে এক লক্ষ রুপি সংরক্ষণ ও বিতরণ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইল...' [*মিনিটস অব এভিডেন্স টেকেন বিফোর দ্য সিলেক্ট কমিটি অন দ্য অ্যাফেয়ার্স অব দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ভলিউম ১ পাবলিক*, লন্ডন : প্রিন্টেড বাই দ্য হাউস অব কমন্স, ১৮৩২, পৃ. ৪৮৬]

১০. ১৮১৩ সালের আইনটি ছিল ১৮১৩ সালে হাউস অব কমন্সে নেওয়া সরকারি সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি। সিদ্ধান্তটি ছিল আইনের উল্লেখিত অধ্যায়টির তুলনায় আরও বিস্তারিত, যেখানে ইংরেজি শিক্ষা এবং ধর্মান্তরকরণের মধ্যকার সম্পর্কটিকে আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। সিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল যে, '... ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত অংশের বসবাসরত জনগণের সুখ এবং স্বার্থের দিকে নজর রাখা এই দেশের দায়িত্ব এবং তাহারা যেন প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতি লাভ করিতে পারে, সেজন্য যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের তাগিদে যেই সকল নাগরিক স্ব-ইচ্ছায় ভারত গমন করিবেন তাহাদের যথোপযুক্ত আইনি সহায়তা দেওয়া হইবে ...' ['রেজল্যুশন রেস্পেক্টিং দ্য অ্যাফেয়ার্স অব দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি', জুন ৩, ১৮১৩, প্যারা ১৩, *দ্য পার্লামেন্টারি ডিবেটস ফ্রম দ্য ইয়ার ১৮০৩ টু দ্য প্রেজেন্ট টাইম*, ভলিউম ২৬, লন্ডন : টি সি হ্যানসার্ড, ১৮১৩, পৃ. ৫৬২]।

১১. 'আ স্কেচ অব দ্য অরিজিন, রাইজ অ্যান্ড প্রোগ্রেস অব দ্য হিন্দু কলেজ', *দ্য ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজারভার*, ভলিউম ১, [জুন-ডিসেম্বর, ক্যালকাটা : দ্য ব্যাপটিস্ট মিশন

প্রেস, ১৮৩২, পৃ. ৬৯]

১২. 'প্রসপেক্টাস অব দ্য হিন্দু কলেজ, ২৭ আগস্ট, ১৮১৬', *দ্য ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজারভার*, ভলিউম ১, পৃ. ৭২।

১৩. স্যার উইলিয়াম ওয়েডেরবার্ন, 'ফাদার অব দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস', *অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ১৮২৯-১৯১২*, লন্ডন : আনউইন, ১৯১৩।

১৪. *সমাচার দর্পণ*, ১৮ আগস্ট ১৮৯০। [আরও দেখুন ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, *ইন্ডিয়ান মুসলমানস*, পৃ. ৫১-৫৯]

১৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, পৃ. ২২৭-২৮৯।

১৬. ১৮১৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর, কলকাতা স্কুল বুক অ্যান্ড সোসাইটির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের ভারতে ইংরেজি শিক্ষায় আগ্রহী হওয়ার সূচনা হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে তা কোম্পানির পক্ষ থেকে ছিল না। চার্লস লাশিংটন, *দ্য হিস্ট্রি, ডিজাইন অ্যান্ড প্রেজেন্ট স্টেট অব রিলিজিয়াস, বেনেভোলেন্ট অ্যান্ড চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশন ফাউন্ডেড বাই দ্য ব্রিটিশ ইন ক্যালকাটা অ্যান্ড ইটস ভিসিনিটি*, কলকাতা : হিন্দুস্তানি প্রেস, ১৮২৪, পৃ. ১৫৬-১৮৪।

১৭. কেরি লিখেছেন 'কলেজের পণ্ডিত হারু প্রসাদ *পুরুষ পরীক্ষা* নামে একটি সংস্কৃত রচনাকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। যদি এটি ১০০ কপি অগ্রিম ক্রয়ের স্বাভাবিক প্রণোদনা পায় তবে এটা তিনি ছাপাতে চান...' (হোম মিসেলেনিয়াস নং ৫৬৩, পৃ. ৩৯২)। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, পৃ. ৩৯২-এ উদ্ধৃত।

১৮. মার্শম্যান সম্পাদিত পত্রিকার জন্য পণ্ডিতেরা এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে তাঁরা শ্রীরামপুরে ছিল না বলে প্রকাশনা স্থগিত করতে হয়েছিল। *সমাচার দর্পণ*, ২৬ অক্টোবর ১৮৩৩।

১৯. *সমাচার দর্পণ*, ১৩ ডিসেম্বর ১৮৩১।

২০. 'জেনারেল ক্যারেকটারিস্টিকস অব দ্য নেটিভ নিউজপেপার', *দ্য ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজারভার*, ভলিউম ১, ১৮৩২, পৃ. ২১২।

২১. *দ্য রিফর্মার*, ১৮ নভেম্বর ১৮৩১।

২২. 'এর সূচনা হয় সৈয়দ আহমদ এবং তাঁর দুই বিদ্বান শিস্য শাহ আবদুল আজিজ ও আবদুল কাদিরের ধর্মীয় সংস্কারের মাধ্যমে। নতুন মতবাদগুলো বিতর্কের ধোঁয়া জাগিয়েছে। সবই উর্দুতে লেখা, সাধারণ মানুষ জন্য সহজ-সরল ভাষায়... সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর আন্দোলন ভেঙে পড়লে, বিখ্যাত মুসলিম নেতা স্যার সৈয়দ আহমদের শিক্ষা, সামাজিক, ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক ও আধা রাজনৈতিক সংস্কার ও কর্মকাণ্ডে তার চিন্তাচেতনার চূড়ান্ত পরিণতি পাওয়া যায়।' রাম বাবু সাক্সেনা। *আ হিস্ট্রি অব উর্দু লিটারেচার*, [এলাহাবাদ : রাম নারায়ণ লাল, ১৯২৭, পৃ. ২৬৫-২৬৬]।

২৩. স্যার টি বি সাপরু, 'ফরোওয়ার্ড', পৃ. iii, *আ হিস্ট্রি অব উর্দু লিটারেচার*, রাম বাবু সাক্সেনা।

খাতি ইতিহাস চিন্তা

বাংলাদেশে বৈশ্বিক ষাটের দশক : সেনা-এলিট পাহারা ও নিম্নবর্গের প্রতিরোধ

শুভ বসু

সারকথা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মহাবয়ানে গণ-আন্দোলন আর জনযুদ্ধ ছিল যমজ ঘটনা। ষাটের দশকের গণ-আন্দোলনেরই পরিণতি মুক্তিযুদ্ধ। তাদের শত্রু ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের এলিট সেনা-আমলা-জমিদার-বুর্জোয়ার জোটের। বিরুদ্ধে ছিল ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্তের জোট। উচ্চবর্গীয় পাকিস্তানি শাসকদের বিপরীতে জাতীয়তাবাদী জোটটি ছিল নিম্নবর্গীয়। কিন্তু এটি শুধু দেশীয় ব্যাপার ছিল না। বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বাংলাদেশের গণ-আন্দোলন ছিল ষাট দশকে বিশ্বজুড়ে চলা তারুণ্যের বিদ্রোহেরই একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তারুণ্যের ক্রোধ ও আবেগের কাব্য রূপ পেয়েছে বিদ্রোহী মিছিলে, অভ্যুত্থানে, ব্যারিকেডে ও শহীদানে। ইনসাফ বা সামাজিক ন্যায়বিচার ছিল এসব আন্দোলনের মরণপণ দাবি। বৈশ্বিক আবহের সঙ্গে আঞ্চলিক মাত্রার এই যোগাযোগের কথা কমই আলোচিত হয়। শুভ বসু সেদিকেই বিশ্লেষণী নজর দিয়েছেন এই রচনায়।

গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিংবা সূর্যাস্তের
জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট
উড়ছে হাওয়ায় নীলিমায়।
(আসাদের শার্ট : শামসুর রাহমান)

তরুণ বামপন্থী কর্মী আসাদের শহীদি মৃত্যুতে কবি শামসুর রাহমান এই অবিস্মরণীয় কবিতা লিখেছিলেন। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে আসাদের

● অনুবাদ : **প্রতীক বর্ধন**

মৃত্যুতে যে গণ-অভ্যুত্থানের সূচনা হয়, তা ঢাকাকে ষাটের বৈশ্বিক বিক্ষোভের অন্যতম ভূমি করে তোলে। প্যারিস, মেক্সিকো সিটি, বেইজিং, প্রাগ, হ্যানয়, রাওয়ালপিন্ডি অথবা পাশের কলকাতার মতো ঢাকাও মিছিল, ক্রোধ ও বিপ্লবের শহরে পরিণত হয়। পাশ্চাত্যপন্থী ও তথাকথিত আধুনিকায়নবাদী সামরিক একনায়কের বিরুদ্ধে জনতার ক্ষোভের যে বিস্ফোরণ ষাট দশকের গড়ন দিয়েছে, তারও রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস।

বাংলাদেশে পাকিস্তানি শাসনের মূল বিষয় ছিল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শোষণ। পাকিস্তানের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র ও শিল্পকারখানার প্রতিনিধিত্বে বাঙালিরা ছিল সংখ্যালঘু। ১৯৬০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জোট বেঁধে পাকিস্তান সেনা ছত্রচ্ছায়ায় পুঁজিবাদী আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া চালায়। পশ্চিমা দাতাগোষ্ঠীর বিপুল অনুদান এবং মার্কিন প্রশাসন ও হার্ভার্ডভিত্তিক মার্কিন পরামর্শকদের উৎসাহে ভর করে সামরিক শাসকেরা ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৯ সালের মেয়াদে প্রবৃদ্ধিভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করে। তা হলেও প্রবৃদ্ধিমুখী এ উন্নয়নকৌশলের সঙ্গে সামাজিক ন্যায্যতার প্রশ্নকে জড়িত করার বিষয়টি গুরুত্ব পেল না। দেখা গেল, ১৯৬১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের ১৭টি শিল্পপরিবারের হাতে রয়েছে শিল্পের স্থায়ী সম্পদের ৩০ শতাংশ এবং বৃহৎ উৎপাদনমুখী খাতের মোট বিক্রীত পণ্যের ২০ শতাংশের নিয়ন্ত্রণ। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের আদমজী, দাউদ, করিম, বাওয়ানি, ইস্পাহানি ও আমিনের মতো ছয়টি প্রতিষ্ঠানের হাতে রয়েছে উৎপাদন খাতের মোট সম্পদের ৪০ শতাংশ এবং বড় কারখানার উৎপাদিত পণ্যের ৩২ শতাংশের নিয়ন্ত্রণ।[১] কলকাতা থেকে আসা ইরানি বংশোদ্ভূত শিল্পগোষ্ঠী ইস্পাহানি ছাড়া বাকি সবাই ছিল করাচিভিত্তিক গুজরাটি অথবা পাঞ্জাবি পরিবার। ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৬৪-৬৫ সাল—এই ১৫ বছরে পাকিস্তানের শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে বার্ষিক ১৫ শতাংশ হারে। তা হলেও পাকিস্তানিদের প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল ১ শতাংশের কম। একই সময়ে দেখা গেছে, ১৯৪৯-৫০ সালে যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল ১০ শতাংশ বেশি, সেখানে ১৯৬৪-৬৫ সালে এই ব্যবধান বাড়ে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ। পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচার এবং উন্নয়ন তহবিলের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করার ঘটনা অর্থনীতিকে স্থবিরতার দিকে নিয়ে গেল।[২] ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের ২৩ বছরের মেয়াদে পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় বাড়ে মাত্র ২ ডলার।

রাজনৈতিকভাবে, আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র নামের এক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এসব বৈপরীত্য আড়াল করার চেষ্টা করলেন। ১৯৫৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪০ হাজার এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হলেন। মৌলিক গণতন্ত্রের আট হাজার ইউনিট সৃষ্টি করা হলো, যাদের কাজ ছিল ১০ জন ভোটারের নির্বাচকমণ্ডলী নির্বাচিত করা, যাঁদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। পূর্ব পাকিস্তানে কারা ছিলেন এই মৌলিক গণতন্ত্রী? গ্রামীণ সমাজ এবং সেই সমাজের ক্ষমতাসোপানে মৌলিক গণতন্ত্রীদের অবস্থানের চিত্র তুলে ধরেছেন রাশিদুজ্জামান। ৩ হাজার ৬৭৫ জন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের ওপর পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, ৬১ দশমিক ১২ শতাংশ চেয়ারম্যানের বার্ষিক আয় ছিল তখন ৪ হাজার রুপির ওপরে। ২৮ দশমিক ৭৯ শতাংশের আয় ছিল ২ হাজার থেকে ৪ হাজার এবং ৯ দশমিক ৬৯ শতাংশের আয় ছিল ২ হাজার রুপির কম। এই কালপর্বে গ্রামাঞ্চলের ৮৫ দশমিক ৭ শতাংশ মানুষের বার্ষিক আয় ছিল ২ হাজার রুপির কম। পূর্ব পাকিস্তানে গ্রামীণ জোতজমির আয়তনের নিরিখে, ৪২ দশমিক ৪০ শতাংশ মৌলিক গণতন্ত্রীর জমির পরিমাণ ছিল ১৩ দশমিক ৫০ একরের বেশি। ৪০ দশমিক ৪১ শতাংশ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের জমির পরিমাণ ছিল ৫ থেকে সাড়ে ৭ একর। পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীণ জোতের গড় আয়তনের সঙ্গে তুলনায় দেখা যায়, মৌলিক গণতন্ত্রীদের ৬২ দশমিক ৮১ শতাংশ ছিল বড় খামারের মালিক। ফলে এই উপসংহারে পৌঁছানো যায় যে মৌলিক গণতন্ত্রীদের বড় একটি অংশ এসেছিল উদ্বৃত্তধারী কৃষক তথা ধনী কৃষকদের মধ্য থেকে। সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্রের উচ্চকোটির নেতৃত্বে ধনী কৃষক ও একচেটিয়া শিল্পপতিদের এই জোট পূর্ব পাকিস্তানে অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক শোষণের বন্দোবস্ত কায়েম করে।

এর সঙ্গে আরেকটি বুজরকি ধারণা যুক্ত হলো যে বাংলা ভাষা নাকি মুসলিম পরিচয় স্পষ্ট করার উপযুক্ত বাহন নয়। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পর পাকিস্তান সরকার ১৯৫৬ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও উর্দু ভাষার সমান সরকারি মদদ বাংলা ভাষা পায়নি। বাংলা ভাষা বদলে দিতে এবং সমৃদ্ধ ঐতিহ্য থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করতে পাকিস্তান রাষ্ট্র বিভিন্ন কায়দা করেছে, এমনকি বাংলা ভাষার শব্দভান্ডার ও বর্ণমালা পর্যন্ত পরিবর্তনের প্রস্তাব এনেছে।

ষাটের দশকজুড়ে চলা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং সাহিত্য সম্মেলনে পাল্টা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চর্চার প্রকাশ দেখা যায়। বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের

প্রতি নিবেদিতরা কমিউনিষ্টমনা বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে শাসকমহলের বিরুদ্ধে একধরনের সাংস্কৃতিক লড়াই শুরু করেন। গ্রামসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বললে, এই বুদ্ধিজীবীরা রাষ্ট্রের বৈধতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে একধরনের 'অবস্থান রক্ষার লড়াইয়ে' অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

বিকল্প বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে এই সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ ক্রমশ নতুন এক ভাষাভিত্তিক জাতির কল্পিত জনসমাজের শক্তি সৃষ্টি করে। গ্রামসি যেমন স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন বিপ্লবী প্রকল্পের মর্মে নিহিত থাকে সংস্কৃতির প্রশ্ন। মানুষের জগৎ-দৃষ্টি তৈরিতে সংস্কৃতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ করে "সংস্কৃতিই গড়ে দেয় সেই জগৎকে বদলানোর উপায় আন্দাজের সামর্থ্য। সেই বদলকে সম্ভবপর অথবা কাঙ্ক্ষিত হিসেবে দেখা হবে কি না তা-ও ঠিক করে দেয় সংস্কৃতি। অথবা সংস্কৃতি মানুষকে পৃথিবীটা দেখতে শেখায়। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, 'পৃথিবীটা বদলে দেওয়ার যে কল্পনাশক্তি মানুষের থাকে তার রসদ জোগায় সংস্কৃতি, অর্থাৎ তাকে গড়েপিটে দেয়। শুধু তা-ই নয়, এই পরিবর্তন কাঙ্ক্ষিত বা আরাধ্য কি না, তা দেখার চোখও গড়ে দেয় সংস্কৃতি'।"[৩]

পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্র ঐতিহ্যের সাংস্কৃতিক মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে ১৯৬০-এর দশকের সূচনা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে ঢাকায় তিনটি নাগরিক কমিটি গঠিত হয়। বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ এসব কমিটির কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। সরকারি চাপ থাকা সত্ত্বেও বিচারপতি মাহবুব মোর্শেদ রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়াননি। তবে ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উত্তরাধিকার আবার সংকটের মুখে পড়ে। যুদ্ধের সময় 'ভারতীয়' বলে অভিহিত করে পাকিস্তান রেডিও ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রনাথের গান পরিবেশন বন্ধ করা হয়। এরপর ১৯৬৭ সালে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী খাজা শাহাবউদ্দিনের নির্দেশে রেডিও পাকিস্তানে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার নিষিদ্ধ করা হয় এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা পাকিস্তানের ভাবাদর্শবিরোধী। বুদ্ধিজীবীরা মন্ত্রীর এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে নামেন। ২৫ জুন, ১৯৬৭ তারিখে ১৯ জন লেখক, বিজ্ঞানী, চিত্রকর এবং শিক্ষকের বিবৃতি প্রকাশিত হয়। জনমতের চাপে খাজা শাহাবউদ্দিন ঘোষণা দিলেন, রবীন্দ্রনাথের গান পাকিস্তানের চেতনার বিরোধী এমনটা তিনি মনে করেন না, তবে তাঁর বক্তব্য আরও স্পষ্ট করতে বলেন যে তিনি কেবল (রবীন্দ্রনাথের) যেসব গান পাকিস্তানি ভাবাদর্শের সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক,

সেসব নিষিদ্ধ করার চিন্তা করবেন। পূর্ব পাকিস্তানের রবীন্দ্রপ্রেমীরা একে বিজয় বলে বিবেচনা করলেন।

১৯৬০-এর দশকে ঢাকা শহর ধর্মভিত্তিক সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ভাবধারা নিয়ে প্রশ্ন জাগানো নতুন ধারার সাংস্কৃতিক তৎপরতার উর্বর ভূমি হয়ে দাঁড়ায়। কমিউনিস্ট সাংস্কৃতিক কর্মীরা এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সৃজনী সাহিত্যগোষ্ঠী, ক্রান্তি, উন্মেষ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংসদ এবং উদীচী সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের ময়দান প্রসারিত করায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে জনপ্রিয় করে ছায়ানট।

ষাটের দশকজুড়ে কবিতা, উপন্যাস ও ছোটগল্পের ভাব, বিষয়বস্তু ও লেখার শৈলীতে রূপান্তর প্রত্যক্ষ করে পূর্ব পাকিস্তান। তবে সবচেয়ে নজরকাড়া পরিবর্তন আসে কবিতায়। নতুন ধারার কবিরা নতুন ধাঁচের চিত্রকল্প, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও কাব্যভাষা ব্যবহার করেন। এঁদের পুরোধা ছিলেন শামসুর রাহমান। ১৯৫৩ সালে, তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। বাংলা কবিতাকে তিনি নতুন মোড় দেন। তাঁর জাদুকরি কবিতার ভেতর দিয়ে উদয়াস্ত পরিশ্রমের আটপৌরে নগরজীবন যেমন মহিমময় হয়ে ওঠে, তেমনি দারিদ্র্যের দুঃখভার, এমনকি ট্রাফিক বাতির মতো মামুলি জিনিসও নাগরিক ও মার্জিত রূপ পায়। ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকের সবচেয়ে ব্যঞ্জনাময় রাজনৈতিক কবিতাও তিনিই লিখেছেন। তাঁর 'আমার দুঃখিনী বর্ণমালা' শীর্ষক কবিতাটি ছিল ১৯৬০-এর দশকে বিচারপতি হামুদুর রহমান কমিশনের প্রস্তাবের জ্বলন্ত প্রত্যাখ্যান। একমাত্র আরবি বা ল্যাটিন হরফে লেখা হলেই কেবল বাংলা ভাষা পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে 'সংহত' হতে পারে বলে মনে করেছিল ওই কমিশন।

সমালোচকেরা ষাট দশকের পূর্ব পাকিস্তানের কবিতায় ১৯ শতকের ফরাসি কবি শার্ল বোদলেয়ারের প্রভাব লক্ষ করেছেন। অনেক কবির কবিতাই ছিল দুঃখের ইশতেহার, অনেকেই বোদলেয়ারের মতো বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে সর্বদাই এক লড়াই চলমান, আর এর মধ্যে মানুষের অস্তিত্ব অনির্ধারিত। *সংবাদ* পত্রিকায় 'ইতিহাসের আরেক নায়ক' কবিতা প্রকাশ করেন সে সময়ে ছাত্র কবি আসাদ চৌধুরী। কবিতাটি আফ্রিকার শহীদ মুক্তিসংগ্রামী প্যাট্রিস লমুম্বাকে নিয়ে রচিত। তৎকালীন এক ছাত্র আজাদ সুলতান *আফ্রিকার বুকে সূর্যোদয়* শীর্ষক এক কাব্য সংকলন বের করেন। সাহিত্য সমালোচক অরিত্র মজুমদারের ভাষায়, এক বিদ্রোহী কল্পনা তখন বিপ্লবী চেতনাকে জাগ্রত করেছিল।

বাংলা উপন্যাসেও তখন বিষয়বস্তু ও কাঠামোর দিক থেকে অনেক পরিবর্তন আসে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *চাঁদের অমাবস্যা* ও জহির রায়হানের *হাজার বছর ধরে* (১৯৬৪) উপন্যাসে গ্রামীণ জীবন, দারিদ্র্য, শ্রেণিশোষণ ও শিক্ষিত তরুণদের হতাশার কথা উঠে আসে। কমিউনিস্ট লেখক-ঔপন্যাসিক সত্যেন সেনের *পদচিহ্ন* (১৯৬৮) উপন্যাসের বিষয় গ্রামবাংলার এক হিন্দু-অধ্যুষিত গ্রামের নিরাপত্তাহীনতা এবং সমৃদ্ধি থেকে দারিদ্র্যে পর্যবসিত হওয়ার ঘটনা। এরপর শহীদুল্লা কায়সারের *সারেং বৌ* উপন্যাস এক গ্রামীণ নারীর সংগ্রামের কাহিনি উপজীব্য করে রচিত হয়। একদিকে গ্রামের ধনী কৃষকদের ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে প্রলয়ংকরী জলোচ্ছ্বাস—এই দুইয়ের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই। এসব বিশিষ্ট উপন্যাস সামাজিক রূপান্তর ও শ্রেণিসংগ্রাম, পিতৃতান্ত্রিক দাপট এবং দেশভাগের করুণ পরিণতির কথাও বর্ণনা করে।

চলচ্চিত্রজগতেও এ সময়ে পরিবর্তন আসে। ষাটের দশকে পল্লিজীবনের গল্পের সঙ্গে লোককথার আদল মেশানো চলচ্চিত্র বক্স অফিসে তাৎক্ষণিক আলোড়ন তোলে। আবদুল জব্বার খানের চলচ্চিত্র *জোয়ার এলো* প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃতিকে জড়াজড়ি করে থাকা গ্রামীণ ইসলামের ওপর দৃষ্টিপাত করে। জব্বার খানের এই ছবির বাণিজ্যিক সফলতার পর পরিচালক সালাহউদ্দিন তাঁর আগের শহুরে পটভূমির চলচ্চিত্র থেকে সরে এসে রূপকথার গল্পের দিকে মোড় নেন এবং তৈরি করেন *রূপবান* চলচ্চিত্র। ভ্রাম্যমাণ যাত্রাপালার ঢঙে নির্মিত সরল কাহিনির এই ছবি রাতারাতি বক্স অফিস কাঁপিয়ে দেয়। চলচ্চিত্রে লোকসাহিত্যের পুনর্জাগরণকে আলজেরীয় উপনিবেশবাদবিরোধী তাত্ত্বিক ফ্রাঞ্জ ফানো উপনিবেশিত জাতির নিজ সংস্কৃতির শিকড় আবিষ্কারের প্রতিফলন বলে অভিহিত করেছেন। সে সময়ের বহুমুখী প্রতিভাধারী চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানকেও প্রভাবিত করে এসব লোকগাথা। ১৯৬৬ সালে তিনি নির্মাণ করলেন লোকসাহিত্যভিত্তিক আরেকটি চলচ্চিত্র *বেহুলা*। গল্পটি যদিও 'হিন্দু' দেবী মনসাকে নিয়ে হলেও সেলুলয়েডের পর্দায় একে লোকসাহিত্য হিসেবে তুলে ধরা হয় এবং এটিও ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়।

এই বিবিধ রকম সংযুক্ত ও তর্করত সাংস্কৃতিক বাহাসগুলোর মধ্যে সেসব প্রক্রিয়া চলমান ছিল, যার মধ্য দিয়ে প্রতিরোধের অর্থ উৎপন্ন, প্রোথিত ও মহিমান্বিত হয়। ষাট দশকের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ, তার পদ্ধতি এবং উদ্দেশ্য বুঝতে গিয়ে গবেষকের নিজস্ব সচেতনতা (Reflexitivity) প্রয়োগ করতে গিয়ে বাস্তবে জনপ্রিয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে বিমূর্ত করে ফেললে রাজনীতি-বিচ্ছিন্ন

বয়ান তৈরি হবে। অথচ ওই সব রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বিক্ষুব্ধ ছাত্র, শ্রমিক, নিম্নবর্গীয় সামাজিক শ্রেণিগুলো এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীরা আগ্রাসী পুঁজিবাদ ও অভ্যন্তরীণ উপনিবেশায়ন প্রতিরোধ করেছিলেন। সাংস্কৃতিক ধারাগুলো ছিল গণতন্ত্র ও শোষণমুক্ত সমাজের জন্য বৃহত্তর গণভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ, যে আন্দোলনে অনেকে শহীদ হন।

তাই গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বৈশ্বিক ষাটের দশক পূর্ব পাকিস্তানে আত্মপ্রকাশ করে। এই দশকের যাত্রা শুরু হয় ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের জাতীয় শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ও পাকিস্তান সরকারের শিক্ষাসচিব এস এম শরিফের সভাপতিত্বে পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব পেশ করা হয়। তখনো আগ্রাসী পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা একাই দাঁড়িয়েছিলেন। বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনের পর আসে ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালের পাটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট আন্দোলন। সাবেক বিপ্লবী ছাত্রনেতাদের মধ্যে কাজী জাফর আহমদ, হায়দার আকবর খান রনো ও রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে ঢাকার কাছের টঙ্গী শিল্পাঞ্চলে বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এরপর ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে একই সঙ্গে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ডাক ও টেলিগ্রাফকর্মীরা আন্দোলন শুরু করেন। চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের শ্রমিকদের আন্দোলন শুরু হয় মার্চ মাসে। রেলওয়ের কর্মীরা দীর্ঘ সময় ধরে প্রচার-প্রচারণা চালানোর পর ১৯৬৫ সালের ২৭ মে ধর্মঘট ডাকেন। এমনকি হাসপাতালের নার্সরাও ওই মাসেই ধর্মঘট আহ্বান করেন। শ্রমিকশ্রেণির এসব আন্দোলন ছাত্র আন্দোলনকে অর্থবহ করে তোলে। তবে আগ্রাসী শাসনের বিরুদ্ধে এসব আন্দোলন একরৈখিকভাবে বিজয়ের দিকে এগিয়ে গেছে, এমন ভাবা ঠিক নয়। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এসব প্রতিরোধ আন্দোলনে সাময়িক বিরতি টানে।

যুদ্ধের পর ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি শহরে বিরোধী দলগুলোর এক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি পেশ করেন। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে তিনি মধ্যবিত্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার-সমর্থিত ছাত্রসংগঠন এনএসএফ অর্থনীতি বিভাগের মার্ক্সবাদী অধ্যাপক আবু আহমেদকে প্রহার করে। এ ঘটনা ছাত্রসমাজকে দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলনের দিকে উসকে দেয়। নিম্নবর্গীয় শ্রেণির মানুষও অর্থনৈতিক দুরবস্থার বিরুদ্ধে

ক্ষোভ জানানো। অটোরিকশার চালকেরা মার্চের ১ তারিখ থেকে ধর্মঘটে যান। এই পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফার সমর্থনে ধারাবাহিক কর্মসূচি হাতে নেন। দাবি করেন, পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। পাকিস্তান আমলে শেখ মুজিব বারবার গ্রেপ্তার হয়ে কারান্তরীণ থাকলেও তিনি ছয় দফার সমর্থনে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। এরপর ৭ জুন তেজগাঁও ও নারায়ণগঞ্জের শ্রমিকেরা নিপীড়নমূলক ১৪৪ ধারার বিরুদ্ধে ফেটে পড়লে পুলিশ গুলি চালায়। অন্তত ১০ জন শ্রমিক প্রাণ হারান।

১৯৬৭ সালে শ্রমিকদের ধর্মঘটের হুমকি ঢাকা শহর অচল করে দেয়। পাটকলশ্রমিক, স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও পরিবহনশ্রমিকেরা ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন। মাওলানা ভাসানী ২৭ জানুয়ারি পাটচাষিদের সম্মেলনের আয়োজন করেন। ১ ফেব্রুয়ারি থেকে রেলশ্রমিকেরা টানা ধর্মঘট ঘোষণা করেন। মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে বামপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)। ১৯৬৭ সালজুড়ে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিকশ্রেণির বিভিন্ন অংশ শিল্প-ধর্মঘট ঘোষণা করে সামরিক পুঁজিবাদকে চ্যালেঞ্জ করে। বছরের শেষ দিকে ন্যাপ এক বিভক্তির সামনে পড়ে, একই সঙ্গে একদল ভিন্নমতাবলম্বীও আওয়ামী লীগ ত্যাগ করেন। সামরিক-আমলাতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিবাদ গতি হারাতে শুরু করে। এ অবস্থায় ১৯৬৮ সালের ৭ জানুয়ারি সরকার আট ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনে। ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি সরকার শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য ৩৪ জন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের আওতায় আটক করে। এরপর ১৯ অক্টোবর এক কাউন্সিল সভায় আওয়ামী লীগ মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচন বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয়। পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া এবং জনসংখ্যার অনুপাতে নির্বাচনব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি তোলে তারা। এসব সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ও ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপ পরস্পরের কাছাকাছি আসে। এর মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্ররা ১৯৬৮ সালের ২৬ নভেম্বর আইয়ুব খানের শাসনের বিরুদ্ধে রাওয়ালপিন্ডিতে বিদ্রোহে নেমে পড়েন।

১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে মাওলানা ভাসানী সর্বাত্মক হরতাল ঘোষণা করে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। ৬ ডিসেম্বর জনসভা সফল হলে তিনি গভর্নর হাউস অবরোধ করেন। এরপর ৮ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে আরেকটি হরতাল পালিত হয়। ১৯৬৮ সালের ১০ ডিসেম্বর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো স্বৈরাচারবিরোধী দিবস পালন করে। ১৪ ডিসেম্বর ঘেরাও আন্দোলনের ডাক

দিয়ে ভাসানী আরও অগ্রসর হন। এর উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক কর্মীদের নিয়ে সরকারি কার্যালয় ঘেরাও করে প্রশাসনকে অচল করে দেওয়া। ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রসংগঠনগুলো ১১ দফা দাবি উত্থাপন করে। ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ, ন্যাপসহ (মোজাফফর) আটটি রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি (ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি বা ড্যাক) গঠন করে। এরা সম্মিলিতভাবে ফেডারেল সরকারব্যবস্থা, সর্বজনীনভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন এবং সব রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবি করে। ১৪ জানুয়ারি ড্যাক নিজ দাবিনামা-সংবলিত সনদ ঘোষণা করে। একই দিনে ভাসানী হাতিরদিয়ায় কৃষক সমাবেশে ভাষণ দেন। ১৭ জানুয়ারি বায়তুল মোকাররম মসজিদ থেকে মিছিল বের করে ড্যাক। তবে ছাত্ররা আরও জঙ্গি মিছিল বের করলে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ হয়। ফলে ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের সামনের বটতলায় বড় সভা করেন। এরপর ছাত্ররা আবার মিছিল বের করলে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ হয়। এরপর ছাত্ররা ১৮ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানজুড়ে পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধর্মঘট পালন করার সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ছাত্রদের প্রস্তুতি ভালো ছিল। তাঁরা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন এবং রোলার ও কংক্রিটের স্ল্যাব দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটক বন্ধ করে দেন। পুলিশ লাঠিপেটা শুরু করলে শিক্ষার্থীরা ইট-পাথর ছুড়ে মারেন। সংঘর্ষের সময় পিছু হটতে থাকা পুলিশ বাহিনী গুলি চালালে সেখানেই ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী (মেনন গ্রুপ) আসাদুজ্জামানের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বদলে দেয়। ২৪ জানুয়ারি নিম্নবর্গীয় সামাজিক শ্রেণিগুলো, ছাত্রছাত্রী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও রাজনৈতিক কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট পালন করেন, বিশাল সভা ও মিছিল আয়োজন করেন। ২৪ জানুয়ারিতে পুলিশের গুলিতে মারা যান নবম শ্রেণির ছাত্র মতিউর। গণতন্ত্রের আন্দোলন, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও ভাষাগতভাবে মুক্ত জাতির আকাঙ্ক্ষা অনেক শহীদের সৃষ্টি করে। এই সময়, ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সামরিক বাহিনী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করে। ১৯৬৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মোহাম্মদ শামসুজ্জোহাকে হত্যা করা হয়। এসব ঘটনায় মানুষের স্বাধীনতার স্পৃহা আরও বেড়ে যায়। এ পরিস্থিতিতে মাওলানা ভাসানী কর বর্জনের আন্দোলন শুরু করার হুমকি দেন। বড় ধরনের রাজনৈতিক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে পাকিস্তান সরকার ১৯৬৯

সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করে এবং পরদিন শেখ মুজিবকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়। গণ-আন্দোলনের ব্যাপকতায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তারা, একসময় তাঁদেরও ধৈর্যচ্যুতি হয় এবং ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

প্রতীকীভাবে আসাদুজ্জামানের শাহাদাতবরণ বৈশ্বিক ষাটের দশকের আন্দোলনের শীর্ষবিন্দু। গণতন্ত্র, সামাজিক রূপান্তর ও ঔপনিবেশিক শাসন থেকে জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত প্রতিবাদের দশক ছিল এটি। বাংলাদেশের শ্রমিক, ছাত্র, লেখক ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা এক বিভ্রান্ত সামরিক গণতন্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে উন্নয়নের নামে অভ্যন্তরীণ উপনিবেশের অবসান ঘটিয়েছেন।

● **শুভ বসু** কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও ক্ল্যাসিক্যাল স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। তিনি তাঁর আসন্ন গ্রন্থ *ইমার্জেন্স অব ইনডিপেনডেন্ট বাংলাদেশ* সমাপ্ত করার কাজে নিয়োজিত।

তথ্যসূত্র

১. [Amzad, Rashid 'Industrial Concentration and economic power' in Gardezi, H. & Rashid, J. (ed.) Pakistan : The Roots of Dictatorship. London : Zed Press. 1983 : 232.]

২. [Thomas, John Woodward. 'Development Institutions, Projects, and Aid : A Case Study of the Water Development Programme in East Pakistan.' Pakistan Economic and Social Review 12, no.1 (1974) : 77-103 : 78. Accessed June 22, 2021.]

৩. [Crehan, K. 2002. Gramsci, Culture and Anthropology. 1st ed. University of California Press. p.71]

ভাষা ও সংস্কৃতি

‘পলিটিক্যাল পার্টিস ইন ইন্ডিয়া’ এবং ভাষায় বিভাজিত সংস্কৃতি

ইফতেখারুল ইসলাম

সারকথা

বিভক্ত ও গণ্ডিবদ্ধ চিন্তাচর্চা উনিশ শতকের চিন্তাপদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। একই মাটির সন্তান হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলমানের লেখনী পরস্পরকে পুরোপুরি উপেক্ষা করেছে। সাহিত্য তথা ভাষাচর্চার ভেতর দিয়ে ঘটেছে এই সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা। এরই প্রতিফলন ঘটেছে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে। পরে পাকিস্তান আন্দোলনেও সেই বিভক্ত চিন্তাপদ্ধতির প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। উনিশ শতকজুড়েই বাংলা ভাষায় সংস্কৃতায়ন চলেছিল। পাকিস্তান আমলে দেখা যায় বাংলা ভাষার আরবীয়করণ। এভাবে উপমহাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে। অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের *পলিটিক্যাল পার্টিস ইন ইন্ডিয়া* বইয়ের এই চিন্তার ব্যাখ্যার পাশাপাশি, এরই আলোকে সাম্প্রতিক বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার ওপর নজর ফেলা হয়েছে এই প্রবন্ধে। লেখক মনে করেন, ব্রিটিশ ভারতের পর্যালোচনা করতে গিয়ে সমকালীন লেখকসমাজের একাংশ গণ্ডিবদ্ধ চিন্তাচর্চাকে উৎসাহিত করছেন। এটা সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদে রূপ নেওয়ার আশঙ্কা জাগাচ্ছে। ঐতিহাসিক কোনো প্রতিক্রিয়ার সমাধান একই রকম একচোখা প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কি করা সম্ভব?

‘জাতীয়তাবাদের আত্যন্তিক আতিশয্য ভাল নয়। আমরা স্বদেশপ্রেমকে সবকিছুর উপরে স্থান দেব; কিন্তু স্বদেশপ্রেমের উপরেও স্থান দেব সত্যকে, ইতিহাসকে। প্রতাপ আদিত্য, সিরাজ-উদ-দৌলা ও মীর কাসিম যেন আমাদের মনের মসনদে আরোহণ না করেন। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে যা মহৎ, যা শ্রেষ্ঠ, যা কল্যাণকর, তাই হবে আমাদের উত্তরাধিকার।’

মমতাজুর রহমান তরফদার (১৯২৮-১৯৯৭), *বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকা*

সম্প্রতি অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের (১৯১২-১৯৯০) *পলিটিক্যাল পার্টিজ ইন ইন্ডিয়া* বইটি প্রকাশ পেয়েছে। ঢাকার বিদ্যাজগতে এ নিয়ে সাড়া পড়তেও দেখা গেছে। বইটির প্রস্তাব ও আলাপ লিখিত হয়েছিল পঞ্চাশের দশকে। তবু এটা সেকালে প্রকাশ পাওয়া যে রকম গুরুত্বপূর্ণ ছিল, একালেও তেমনই প্রাসঙ্গিক। সাম্প্রদায়িকভাবে বিভক্ত চিন্তাপদ্ধতির পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ারি জানানো বইটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। বর্তমান বিশ্বে সাম্প্রদায়িক ও বর্ণবাদী চিন্তাধারা প্রকট আকার ধারণ করছে। পরের কালে এর প্রভাবে একটি গোষ্ঠীর দ্বারা অন্য গোষ্ঠীকে 'অপর' করে তোলার প্রবণতা বেড়ে চলে। এর ছায়া বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনাগুলোতেও পড়েছে বলে দেখা যাচ্ছে। মূলত জাতি ও সম্প্রদায়ের প্রশ্ন ঘিরেই নতুন নতুন বিতর্ক দানা বাঁধছে। ঐতিহাসিকভাবে জটিল ও চিন্তাগতভাবে পিচ্ছিল প্রশ্নগুলো তুলতে গিয়ে সমকালীন লেখক ও চিন্তাবিদদের কারও কারও আলাপে পুরোনো সমস্যা নতুন করে চাগিয়ে উঠছে। অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক তাঁর *পলিটিক্যাল পার্টিস ইন ইন্ডিয়া* বইয়ে সমস্যাটিকে 'বিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত গণ্ডিবদ্ধ চিন্তাধারা' বলে চিহ্নিত করেন। লেখকের মতে, ব্রিটিশ আমলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাম্প্রদায়িকভাবে বিভক্ত চিন্তাপদ্ধতির কারণে একই জনগোষ্ঠী দুটি বিভক্ত বর্গে ভাগ হয়ে যায়। পরের কালে এটাই সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে পরিণত হয়। অধ্যাপক রাজ্জাকের অবদান এখানেই যে তিনি সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক আবহ ও চিন্তার গড়নের সঙ্গে সমাজে দাপুটে রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মসূচির যোগাযোগের সুতাটি ধরিয়ে দিয়েছেন। অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক মনে করেছেন, চিন্তাচর্চা একপেশে হওয়ার কারণে ভবিষ্যতে তা সমস্যার সৃষ্টি করবে। ভাষার মধ্য দিয়েই চিন্তার প্রকাশ ঘটে থাকে। শব্দচয়ন, ঝোঁক, ঢং ইত্যাদি ভাষায় আকার লাভ করে। সর্বোপরি শিল্প ও সাহিত্যচর্চার রূপটি রাজনৈতিকভাবে প্রকাশ পায়। উনিশ শতকের চিন্তাপদ্ধতির ধরন যেমন ভাষায় বিরাজ করে, তেমনি হাল আমলের বিভক্ত চিন্তাচর্চার ধারাটি ভাষার মধ্য দিয়েই উন্মোচিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে দুটো দিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক, চিন্তাচর্চার মাধ্যম হয়ে ওঠা ভাষার ভিত্তিতে কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় অপরায়িত হয়ে না পড়ে। দুই, আলাপের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেন সমাধানকে ঘিরে গড়ে ওঠে।

এক.

অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক উক্ত বইয়ে *মাইন্ড অব দ্য এডুকেটেড মিডল ক্লাস ইন ইন্ডিয়া* (ভারতবর্ষের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মন) শিরোনামের পঞ্চম অধ্যায়ে

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ করেছেন। তিনি বিভক্ত চিন্তাপদ্ধতির সাংস্কৃতিক রাজনীতি সম্বন্ধে লিখেছেন, হিন্দু ও মুসলমানদের সংস্কার বা পুনর্জাগরণবাদী কর্মকাণ্ডের মধ্যে আলাদা চিন্তাধারা প্রবাহিত হওয়ায় প্রায় সময় দ্বন্দ্ব বিরাজ করেছে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বড় মাপের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের মতে, ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে মিশনারিদের ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়ার সম্পর্ক রয়েছে। ব্রিটিশ ভারতের গোড়ার দিকে ইংরেজি শিক্ষা প্রচারের লক্ষ্য ছিল খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করা। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে উনিশ শতকের গোড়া থেকে হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী ধারা জেগে ওঠে। ব্রিটিশ পাদরি উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪), জশোয়া মার্শম্যান (১৭৬৮-১৮৩৭) কিংবা অন্যরা মনে করতেন যে বাইবেল ও ধর্মীয় গ্রন্থাবলি দেশীয় ভাষায় সুলভ হলে খ্রিষ্টধর্ম এই মাটিতে প্রসার লাভ করবে। খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের লক্ষ্যেই প্রথম দিকে বাংলা গদ্য চালু হয়েছিল। এই প্রচেষ্টা এখানে সীমাবদ্ধ না থেকে বিচিত্র খাতে প্রবাহিত হয়। পরে পাঠ্যবই ও অন্যান্য সাহিত্য রচনাও পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে। এতে বাংলা ভাষা বিকশিত হলেও তা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জন্য ভবিষ্যতে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে আব্দুর রাজ্জাক প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষার বিকাশে জড়িত ব্যক্তিদের দায়ী করেন। তাঁর মতে, শিক্ষিত ব্যক্তিদের ধর্মকেন্দ্রিক বিভক্ত চিন্তাভাবনার ছাপ তাঁদের সাহিত্যকর্মেও বিপুলভাবে ফুটে উঠেছিল। ফলে এসব সাহিত্যকর্ম গোটা জনগোষ্ঠীকে একীভূত না করে চিন্তা ও মনকে বিভক্ত করেছে। উনিশ শতকের গোড়ার বিভক্ত চিন্তাধারা পরবর্তীকালের সাহিত্য ও রাজনীতিতে স্থান করে নেয়। আর পরবর্তীকালে চিন্তাজগতের ব্যক্তিরা ধর্মীয় চৌকাঠের বাইরে গিয়ে স্বাধীন রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করলেও সমাজের একাংশ নিয়ে একচেটিয়া মনস্তত্ত্বই ক্রিয়াশীল থাকে। উনিশ শতকের সত্তরের দশকে ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের শুরু হলেও এই বিভক্ত চিন্তাধারার অবসান এখনো ঘটেনি। জনসাধারণকে একই কাতারে নিয়ে আসার সামাজিক ভিতও গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মসূচি পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁরা দুটি আলাদা আদর্শিক অবস্থান থেকে তৎপর ছিলেন।

হিন্দু ও মুসলমানদের উভয়ে চিন্তাচর্চায় ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত হওয়ায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি জেগে ওঠে। উনিশ শতকের গোড়া থেকে ষাটের দশকের শেষাবধি (১৮০০-১৮৭০) এ ধরনের চিন্তা বিকশিত হয়েছে। পরবর্তী তিন দশক এই চিন্তাধারা চূড়ান্তভাবে পরিণতি লাভ করে। এ কারণে ধর্মভিত্তিক দুটি পৃথক গোষ্ঠীর উত্থান ঘটে। রাজনৈতিক তৎপরতা চাগিয়ে উঠলে কর্মী ও নেতারা

ধর্মভিত্তিক বিভাজিত দুই পাটাতনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। দুটি সম্প্রদায় পরস্পরকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে। একই মাটির জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কোনো ধরনের সাংস্কৃতিক লেনাদেনা, জানাশোনা ঘটেনি। অধ্যাপক রাজ্জাকের মতে, এটাই উনিশ শতকের শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র।

উনিশ শতকের সবচেয়ে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। তিনি সুবিধামতো ধর্মীয় ভাবধারা কাজে লাগিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের সমবেদনা পাওয়ার আশায় নিজের সাহিত্যিক প্রতিভার প্রয়োগ করেছিলেন। এই ঘটনাকে আব্দুর রাজ্জাক দুর্ভাগ্যজনক বলে উল্লেখ করেন। শতকজুড়ে সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মে বঙ্কিমের প্রভাব তুলনাহীন। তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিকদের গল্পে বিচার-বিশ্লেষণহীন ও উত্তেজনাপূর্ণ দিকটাই প্রধান হয়ে উঠেছে। এই বিভক্তকরণের ঐতিহ্য খুবই পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলা হয়, যা রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। লেখকের মতে, অর্ধশতাব্দী ধরে হিন্দু-মুসলমানের বিভক্ত চিন্তাচর্চা ও এর পুষ্টিসাধন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পটভূমি তৈরি করেছিল।

উনিশ শতকে প্রভাবশালী পত্রিকাগুলো সাম্প্রদায়িকতাকে প্রকট করে তুলেছিল। অধ্যাপক রাজ্জাক মনে করেন যে *ব্রাহ্মনিক্যাল* ম্যাগাজিন, *চন্দ্রিকা* পত্রিকা হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার জন্য পরিচালিত হয়। আবার *সম্বাদ কৌমুদী*, *দ্য ইনক্যোইরার* ও *জ্ঞানান্বেষণ* পত্রিকা তিনটি হিন্দুত্ববাদকে অনেক ক্ষেত্রে অস্বীকার করেছে। এগুলোর মধ্যে কিছু পত্রিকা ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি পোষণে আগ্রহী ছিল। তবে পত্রিকা ও ছাপাখানাগুলো মোটাদাগে ধর্মীয়ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর মানে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল না, তা কিন্তু নয়। তবে সেসবও মিশনারিদের *সমাচার দর্পণ* পত্রিকার ভাষ্যের চেয়ে ভিন্ন কিছু ছিল না। আব্দুর রাজ্জাকের মতে, *সমাচার দর্পণ* কিংবা *দ্য রিফরমার* পত্রিকার মন্তব্যগুলো সেকালের বুদ্ধিজীবীদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে কাজে লাগে। আর তা রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাতের পথরেখা তৈরি করেছিল। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক কোনো বিষয়ে একই টেবিলে বসে সমাধান করতে না পারার কারণ মূলত শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানের মনোগঠনের মধ্যেই বিরাজমান। এটা তাদের যৌথ ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতার শর্ত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল প্রাথমিক পর্যায়ের বুদ্ধিজীবীদের চালচরিত্রের মধ্যে, যা আব্দুর রাজ্জাকের এই গ্রন্থ রচনার সময়েও (বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে) বিদ্যমান।

সমাজ অন্তর্ভুক্তিমূলক আদর্শের দিকে ধাবিত হলে ওই ধারা থেকে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটতে পারে। ঔপনিবেশিক ভারতে বিপরীত ঘটনাই ঘটেছে। একাধিক আদর্শ চাঙা হয়ে ওঠায় ভারতবর্ষে জটিলতাগুলো সৃষ্টি হয়েছিল। সংস্কার কিংবা পুনর্জাগরণ—উভয় ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের চিন্তার কাঠামো ধর্ম দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। তাঁর মতে, বিশ শতকের শুরুতে দুটি ভিন্ন লক্ষ্য সামনে রেখে আন্দোলন গড়ে উঠেছে। গান্ধী 'রাম রাজ্য'কে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ হিসেবে দেখেছেন। অন্যদিকে মুসলিম নেতাদের কেন্দ্র ছিল ইসলামের প্রথম চার খলিফার শাসন। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে কংগ্রেসের নেতারা বার্ষিক সম্মেলনগুলোতে প্রশংসা করেছেন কিন্তু সেই লক্ষ্যে কোনো কর্মসূচি তাঁরা নিলেন না। এ রকম পরিস্থিতিতে *আনন্দমঠ*-এর মতো সাম্প্রদায়িক উপন্যাস থেকে কীভাবে 'বন্দে মাতরম' গানটিকে জাতীয় আন্দোলনে গ্রহণ করা হয়, এই প্রশ্ন আব্দুর রাজ্জাক তুলেছেন।

তাঁর মতে, যদি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনস্তত্ত্বের ওপর পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণ করা হতো, তাহলে হিন্দু ও মুসলমানদের যৌথভাবে কাজ করা অসম্ভব বলে 'ভাগ করো শাসন করো'—হিউমের এই বক্তব্যের প্রয়োজন ছিল না। শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে বিভক্ত চিন্তাচর্চার কারণে সমাজে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি গড়ে ওঠে, যা ১৯৪৭ সালের দেশভাগ অনিবার্য করে তোলে। উনিশ শতকের প্রথম পর্যায়ে জনগণকে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ভাগ করার মধ্য দিয়ে এই পরিণতির সৃষ্টি হয়েছিল বলে অধ্যাপক রাজ্জাক মনে করতেন। সম্প্রদায়ভিত্তিক এই বিভক্তি স্বাভাবিক বলে মনে করা হয়েছিল। এই পটভূমি তৈরিতে কার্যক্ষেত্রে সরকারি কোনো প্রচেষ্টা ছিল না। উনিশ শতকের প্রাথমিক পর্যায়ের ধর্মাশ্রিত বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা জনগোষ্ঠীকে একীভূত না করে; বরং সমান্তরালভাবে ভিন্ন ধারায় চালিত হতে বাধ্য করেছে। ব্রিটিশ-ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিশ্লেষণে এটাই আব্দুর রাজ্জাকের প্রধান বক্তব্য।

দুই.

উনিশ শতকে বাংলা ভাষার হিন্দুকরণের মতোই পাকিস্তান আমলে বাংলা ভাষার ইসলামীকরণের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ভাষা ও সাহিত্যচর্চা নিয়ে তৎকালীন সরকার ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ব্রিটিশ যুগের প্রশাসন ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সঙ্গে তুলনীয়। ইতিমধ্যে উনিশ শতকের বিভক্ত চিন্তার খেসারত হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে দিতে হয়েছে। হিন্দু জাতীয়তাবাদের

প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পাকিস্তান আন্দোলন এগিয়ে গিয়েছিল। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সমাজ দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি (১৯৪০) কিংবা পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ (১৯৪৩) পাকিস্তান আন্দোলনের সাংস্কৃতিক ভিত্তিকে শক্ত ভিত দিয়েছিল। এ ধরনের কর্মকাণ্ড সেকালের প্রেক্ষাপটে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়া ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

সম্প্রতি ক্ষমতাকাঠামো থেকে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে উল্লেখযোগ্যভাবে উঠে আসছে। জনমত গঠনে তারা প্রভাব রাখছে। এই পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী প্রধানত মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। সমাজে তাঁরা ক্রমে শক্ত জায়গা করে নিচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মতো তাঁরাও 'আধুনিক' জ্ঞানবিদ্যা আয়ত্ত করে সক্ষমতার সঙ্গে বিকশিত হচ্ছেন। নিঃসন্দেহে এই দিক খুবই প্রশংসনীয় ও প্রয়োজনীয় বটে। একটি সহনশীল, অসাম্প্রদায়িক ও সক্ষম জনগোষ্ঠী তৈরির জন্য সব স্তরের মানুষকে জনশক্তি করে গড়ে তোলার বিকল্প নেই। কিন্তু সমাজের চিন্তাধারাগুলো কোন দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, সে পর্যালোচনা করাও জরুরি।

একালের লেখকসমাজের কোনো কোনো অংশ ষাটের দশকের বাঙালি জাতীয়তাবাদের পর্যালোচনা করতে গিয়ে সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতাকে উৎসাহিত করছেন বলে অভিযোগ ওঠে। সে ক্ষেত্রে তৎকালীন 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ'-এর সভাপতি সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (১৯২০-১৯৯৫) প্রমুখ ব্যক্তিদেরকে এই অঞ্চলের প্রধান সাংস্কৃতিক পূর্বসূরি হিসেবে তুলে আনার চেষ্টাও লক্ষণীয়। তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সহানুভূতি ও ধর্মীয় বিবেচনার ভিত্তিতে নিজেদের বক্তব্য প্রচারে সক্রিয় হয়েছেন। অন্যদিকে বিদ্বৎসমাজের একটি প্রভাবশালী ধারা ব্রিটিশ যুগের ইতিহাসচর্চা কিংবা বিশ শতকের বাঙালি জাতীয়তাবাদ পর্যালোচনা করতে গিয়ে যে পদ্ধতিতে আলোচনা উপস্থাপন করছে, তা-ও বিভিন্ন দোষে আক্রান্ত। তাদের শব্দচয়ন, প্রস্তাবের ধরন, আলাপের ঢং, চিন্তার পরিসর ইত্যাদির ভেতর সংখ্যাগরিষ্ঠবাদকে বলিষ্ঠ করার যথেষ্ট উপাদান আছে।

সম্প্রতি ঔপনিবেশিক যুগ অধ্যয়নে ইসলাম, বাঙালি মুসলমান, সাংস্কৃতিক রাজনীতি নিয়ে ব্যাপক আলাপ চলছে। নিঃসন্দেহে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তর্ক। এই তর্কে প্রশ্ন উঠেছে যে এ ধরনের আলোচনা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে উঠতে ভূমিকা রাখবে কি না। হয়তো লেখকদের মধ্যে কারও কারও সদিচ্ছার অভাব নেই। তাঁরা সমস্যাগুলোকে যথাযথভাবে

চিহ্নিত করতে ইচ্ছুক। আর ঐতিহাসিক এই জটিল ছেদগুলোর সমাধান তাঁরা গবেষণার মধ্য দিয়ে খুঁজতে চান। বিতর্কগুলো সর্বসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ মন্তব্য কিংবা লেখালেখি উপস্থাপন করছি কি না, সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজর রাখা দরকার। উপনিবেশবিরোধী জ্ঞানচর্চা, ব্রিটিশ আমলের ইতিহাস পর্যালোচনা এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিচার করতে গিয়ে আমরা পর্যালোচনার পরিবর্তে প্রতিক্রিয়া হাজির করছি কি না। প্রশ্নটি একালের লেখকসমাজের বিবেচনায় নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

উনিশ শতকের চিন্তাবিদেরা সমাজের সব পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে না ভাবার কারণে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তা বিপুলভাবে প্রভাব ফেলেছিল। হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষে একই টেবিলে বসে রাজনৈতিক আলাপ করা সম্ভব হয়ে না ওঠার কারণ প্রাথমিক পর্যায়ে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের মধ্যেই জারি ছিল। একালেও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সহানুভূতি লাভের আশায় কিংবা ইতিহাসের এই ছেদগুলো না বুঝে লেখকসমাজের একটি ধারা সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতিকে প্রকট করে তুলছে। এর ফলে জ্ঞানচর্চার ধারা ক্রমে উনিশ শতকের বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত চিন্তাধারার খাতেই বইছে। এতে করে সমাজে বিভিন্ন পরিচয়ের মানুষের সহাবস্থান আরও নাজুক হয়ে ওঠার আশঙ্কা বাড়ছে।

তিন.

সমাজের সাংস্কৃতিক পাটাতন গড়ে ওঠে প্রধানত ভাষার মধ্য দিয়ে। চিন্তাপদ্ধতি ভাষায় মূর্ত হয়ে ওঠে। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে ভাষা, যা পরিশেষে সাংস্কৃতিক বাতাবরণ তৈরি করে। তত্ত্ব ও তথ্য প্রচারের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি ভিত্তি লাভ করে। একালের বিভক্ত চিন্তাপদ্ধতি প্রধানত ভাষার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে, যদিও তা এখন পর্যন্ত সাংস্কৃতিক রূপ পরিগ্রহ করেনি। যে বিভক্ত চিন্তাপদ্ধতি গেড়ে বসার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে, তা রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত ভয়ংকর। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় ভাষার সাংস্কৃতিক রাজনীতি নিয়ে ভাবা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ দিক। এরই মধ্য দিয়ে চিন্তা প্রকাশের ঐতিহাসিক ছেদগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব।

ভাষাকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করা মানে মূলত সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হয়ে ওঠা। এ ক্ষেত্রে যে বিষয় খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরি, তা হলো ভাষা যেন সব জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে। আমাদের মনে রাখতে হবে, ভাষায় অপরায়ণের মধ্য দিয়েই সাম্প্রদায়িকতার সাংস্কৃতিক রাজনীতি গঠিত হয়।

উল্লেখ্য, মাতৃভাষার অধিকারবলে কেউ ভাষাজ্ঞান রপ্ত করে না। পণ্ডিতদেরও শ্রম ও ঘাম দিয়ে মাতৃভাষা অর্জন করে নিতে হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, '...যাহারা বাঙ্গালা গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহারা ভাল বাঙ্গালা শিখেন নাই। লিখিত বাঙ্গালা ও কথিত বাঙ্গালা এত তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে যে, দুইটিকে এক ভাষা বলিয়া বোধ হয় না। দেশের অধিকাংশ লোকেই লিখিত ভাষা বুঝিতে পারে না। এই জন্যই সাধারণ লোকের মধ্যে আজও পাঠকের সংখ্যা এত অল্প। এ জন্যই বহুসংখ্যক সম্বাদ-পত্র ও সাময়িক পত্রিকা জলবুদ্বুদের ন্যায় উৎপন্ন হইয়াই আবার জলে মিশিয়া যায়।...গ্রন্থকারেরা বাঙ্গালা ভাষা না শিখিয়া বাঙ্গালা লিখিতে বসিয়া এবং চলিত শব্দ সকল পরিত্যাগ করিয়া অপ্রচলিত শব্দের আশ্রয় লইয়া ভাষার মধ্যে যে অপকার করিয়াছেন, তাহার প্রত্যাহার করা শক্ত।'

ইতিহাসবিদ মমতাজুর রহমান তরফদার লিখেছেন, 'নিরেট যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো ভাষার জন্ম বা বিবর্তন হয় না। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের যোগাযোগ ও সংমিশ্রণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তো ভাষাগোষ্ঠীর সমন্বয় বা সংমিশ্রণ এবং নতুন ভাষার উদ্ভব সম্ভবপর।' হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (১৮৫১-১৯৩১) বক্তব্য হলো, 'যাহা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদে কোন ফল নাই এবং উচ্ছেদ সম্ভবও নহে।' তিনি বাংলা ভাষার মধ্যে আত্মীকৃত হয়ে যাওয়া আরবি-ফারসি শব্দের বিষয়ে এই মত দেন। ব্রিটিশ ভারতে শাসনকাঠামো শক্তিশালীকরণে ভাষা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রশাসনিক কাজকারবার নিজেদের মতো করে পরিচালনার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক স্বার্থ সর্বোচ্চকরণের লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকার ভাষায় হাত দিয়েছিল। এ জন্য ভারতবর্ষের এক ও অবিভাজ্যতার ধারণা প্রয়োগ করা হয়। এই কর্মযজ্ঞে দেশীয় ভাষাগুলো উপেক্ষিত হয়েছে এবং যান্ত্রিকভাবে ভাষার বিকাশ ঘটানো হয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি এই প্রচেষ্টাকে পুষ্ট করেছে। সেকালের পত্রপত্রিকা, সাহিত্য ও রাজনীতিতে গুরুতরভাবে এর প্রভাব পড়েছে। সমাজের ভেতর থেকে সাম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়া প্রকট হয়ে উঠেছিল। শিল্প, সাহিত্য ছিল এর প্রধান চর্চাক্ষেত্র। এভাবে ভাষার মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছে এবং সে অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জাগরণ ঘটেছে। এখন ঐতিহাসিক এই অঘটনের প্রতিক্রিয়ায় পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিয়ে সমাধান আনা অসম্ভব। সমস্যার সূত্র যেমন রাজনীতিতে বিরাজমান, তেমনি সমাধানও সেখানে খুঁজতে হবে। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ মমতাজুর রহমান তরফদারের মতে, 'পূর্ব বাঙলার হিন্দু সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ

সংস্কৃতিকে দূরে ঠেলে রাখা চলবে না। মুসলিম সংস্কৃতির যা কিছু উল্লেখযোগ্য উপকরণ, তার সঙ্গে উক্ত সংস্কৃতি দুটির মিশ্রণ ঘটলে তবেই আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য বলিষ্ঠভাবে গড়ে উঠবে।'

লক্ষ করার বিষয়, বাংলা ভাষার আদি রূপটি 'সংস্কৃতজীবী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের তাচ্ছিল্য এবং আরবি-ফারসি জানা মৌলভি-মৌলানাদের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও' ব্যাপক লোকের স্বীকৃতি পেয়েছিল। এই লোকসমাজের মধ্যে ছিল পেশাজীবী, ভূমিনির্ভর, মধ্যশ্রেণির অন্তর্গত ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য জাতির লোকজন। এই শ্রেণির লোকদের সাহিত্যিক অনুপ্রেরণার ধারাও ছিল সরাসরি 'গণ-সংস্কৃতির মর্মমূল' থেকে উৎসারিত। এ ক্ষেত্রে মমতাজুর রহমান তরফদারের আরেকটি মন্তব্য তুলে ধরছি :

'চৌদ্দ শতকের পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল একত্রিত হয়ে একটি সার্বভৌম রাজশক্তির অধীনে এসেছিল এবং হরিকেল, সমতট, বঙ্গ, বরেন্দ্র, গৌড় ও রাঢ়ের মধ্যে বোধ হয় প্রশাসনিক কারণে যোগাযোগও অনেকটা উন্নত হয়েছিল। খুব সম্ভব এই কারণে এবং বিকাশমান বাঙলা ভাষার নিজস্ব গঠনধর্মী ক্রিয়াশীলতার দরুন এই সময়েই এই ভাষা সাহিত্যের ভাষা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। বড়ু চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" এই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পরিপক্ক ফসল। পনের শতকে তাই যখন দেখি যে, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গেও কবি বিজয় গুপ্ত এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিমবঙ্গের কবি মালাধর বসু ও বিপ্রদাস প্রায় একই ধরনের বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ একটি সাহিত্যিক ভাষায় কাব্য লিখেছেন, তখন বিস্ময়ের কোন কারণ খুঁজে পাই না। চট্টগ্রাম থেকে ভাগলপুর পর্যন্ত এবং কোচবিহার থেকে বঙ্গোপসাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় প্রাক্-মোগল যুগেই বাঙলা ভাষা সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।' বলাবাহুল্য, প্রাক্-মোগল যুগের এই সময়ই বাংলার ইতিহাসে স্বাধীন সুলতানি আমল বলে চিহ্নিত।

ব্রিটিশ ভারতে তৈরি বাংলা ভাষার রূপটি 'সংস্কৃতজীবী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের' সঙ্গে তুল্য। এর প্রতিক্রিয়ায় সমকালীন চিন্তাচর্চায় 'সংস্কৃতজীবী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের' তৈরি ভাষার ওপর জবরদস্তিমূলক 'আরবি-ফারসি জানা মৌলভি-মৌলানাদের' ভাষাটি অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চলছে। এর কোনোটাই 'গণ-সংস্কৃতির মর্মমূল থেকে উৎসারিত' ভাষা নয়। বরং একটি অপরটির প্রতিক্রিয়ামাত্র।

বিশ শতকের ষাটের দশকের বাঙালি জাতীয়তাবাদের পর্যালোচনা করতে গেলে আমাদের চিন্তাপদ্ধতি কী হওয়া জরুরি, তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। সমস্যা কিংবা ঘাটতিগুলো চিহ্নিত করতে গিয়ে আমরা যাতে প্রতিক্রিয়া হাজির না

করি। প্রশ্নগুলো অত্যন্ত জটিল ও স্পর্শকাতর হওয়ায় বিদ্বৎসমাজকে খুব বেশি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। প্রশ্ন উত্থাপনের মধ্য দিয়ে আমরা যেন বিভক্ত হয়ে না পড়ি, এ দিকটি খেয়াল রাখাও জরুরি। আমাদের চিন্তাপদ্ধতি, শব্দচয়ন ও এর পরিসর; সর্বোপরি ভাষার ব্যবহার যেন সংস্কৃতিকে বিভাজনের দিকে উৎসাহিত না করে। বরং সব জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তাপদ্ধতি ও ভাষা ব্যবহার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও কার্যকর মাধ্যম। আলোচনাকালে পুরো জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করতে না পারলে আমরা সমস্যার একই চক্রে আবর্তিত হতে থাকব। এ ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তার পরিসর আরও বেশি প্রসারিত করা জরুরি। ভাষার মধ্য থেকে অন্তর্ভুক্তিমূলক এই চিন্তাপদ্ধতি নির্মাণ করাটাই এখন অন্যতম জরুরি কাজ।

● **ইফতেখারুল ইসলাম** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বর্তমানে ঢাকার 'জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক ফাউন্ডেশন'-এ কর্মরত। আগ্রহের বিষয় ইতিহাস, দর্শন ও রাজনীতি।

গ্রন্থ স্বীকার

১. Abdur Razzaq, Political Parties in India, Editor : Ahrar Ahmad, University Press Limited (UPL), First published : January 2022

২. Amalendu De, Roots of Separatism in the Nineteenth Century Bengal, First published : 7 November 1974

৩. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত), *জাতীয়তাবাদ-বিতর্ক*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭।

৪. ক. *হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী*, প্রকাশক : বসুমতি-গ্রন্থাবলী-সিরিজ। খ. *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ* (সুকুমার সেন উপদেশনা), সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রকাশক : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

৫. সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নভেম্বর ১৯৮৩ (অগ্রহায়ণ ১৩৯০)।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে নদীর প্রতিশোধ

মোহাম্মদ এজাজ

সারকথা

প্রাচীনকাল থেকে নদীই ছিল বাংলাদেশের সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির প্রাইম-মুভার বা মূল সঞ্চালক। সম্রাট আকবরের প্রধানমন্ত্রী আবুল ফজল ভাটি বাংলার নদীর কাছে বাইরের শক্তির নাস্তানাবুদ হওয়ার কথা বলে গেছেন। বাংলার অনেক ভাবান্দোলন, সামাজিক সংস্কার আন্দোলন এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের পটভূমি নদীর প্রভাবেই গড়ে উঠেছিল বলে দেখা যায়। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধেও নদী পাকিস্তানি বাহিনীর জন্য হয়ে উঠেছিল ফাঁদ আর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য দিয়েছিল প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষার সুযোগ। মূলত কৃষিসমাজ থেকে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের নদী ও প্রকৃতিবিষয়ক জ্ঞান তাঁদের করে তুলেছিল মাছের মতো সাবলীল। মুক্তিযুদ্ধের সমরনায়কেরাও রণাঙ্গনের সেক্টরের সীমানা ঠিক করা এবং যুদ্ধকৌশল রচনায় নদীকে বড় গুরুত্বের জায়গায় রেখেছিলেন। যুদ্ধের সামরিক অর্জনগুলো তখনই সম্ভব হয়েছে, যখন কিনা গেরিলারা নদী, জলাশয়, খাল-বিলকে গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্ট হিসেবে নিয়েছে। গণপ্রতিরোধ ও নদীর সম্পর্কের ওপর নতুন করে আলোকপাত করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

এক বহুমাত্রিক ঘটনা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ। রাজনৈতিক সংগ্রাম, সশস্ত্র জনযুদ্ধ, নৈতিক প্রতিরোধের পাশাপাশি আরেকটি লড়াই হয়েছিল, যাকে বলে প্রকৃতির প্রতিরোধ। যুদ্ধকালে এ দেশের নদী ও জলাশয়গুলো রাতারাতি প্রাকৃতিক রক্ষাব্যূহের ভূমিকায় দেখা দিয়েছিল।

বাংলাদেশের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যই একে নদীমাতৃক দেশে পরিণত করেছে। এর নিজস্ব ভৌগোলিক পরিবেশের মূল উপাদান ছিল জালের মতো ছড়িয়ে থাকা নদীব্যবস্থা। কালে কালে এই নদীব্যবস্থা গতিশীল জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ইতিহাসের বিভিন্ন সন্ধিক্ষণে, এই নদীগুলোই বহিরাগত

আক্রমণকারীদের মোকাবিলায় নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে। যখনই বিপদ আসন্ন হয়েছে, তখন নদীপারের জনগোষ্ঠীর মুক্তির পথে সঙ্গী হয়েছে নদী ও পানিপ্রবাহ। ১৯৭১ সালের সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে মুক্তিবাহিনীর ভূকৌশলগত পরিকল্পনায় নদীর ভূমিকা ছিল কেন্দ্রীয়। নদীগুলো শত্রুর যাতায়াত সীমিত করায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। সবচেয়ে যেটি গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো এই নদীগুলোই সামনের সারির যোদ্ধা হিসেবে অবতীর্ণ হয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় সম্ভব করে তুলেছে। আর মুক্তিযোদ্ধাদের সিংহভাগই ছিলেন কৃষকশ্রেণির সন্তান, সেহেতু নদী ও পানির চলনের সঙ্গে তাঁদের যে অভ্যস্ততা, তাঁদের যে প্রকৃতি-পারদর্শিতা, তা পাকিস্তানের শুষ্ক অঞ্চল থেকে আসা দখলদারদের বিরুদ্ধে বিপুল প্রতিবেশগত সুবিধা দিয়েছিল।

নদী, ভূকৌশলগত সুবিধা ও এক সহযোগী যোদ্ধা

ঐতিহাসিকভাবে বাংলা অঞ্চলের প্রশাসনিক সীমানা নির্ধারণ করেছে নদী। বর্তমানেও আমাদের অধিকাংশ জেলা, উপজেলা এমনকি থানাগুলোর সীমানা নদী ও খালের মাধ্যমে চিহ্নিত করা আছে। নদীগুলোই বাংলাদেশ তথা বাংলাকে গুপ্ত, পাল, সেন ও মোগলদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে। ভাটি বাংলার নৌপ্রতিরোধ মোগল বাহিনীর বাংলা বিজয়কে অনেক দিন ঠেকিয়ে রেখেছিল। ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির ঘোড়সওয়ার বাহিনীর অন্তিম সমাধি হয়েছে ভাটি অঞ্চলের ঘোড়াউত্রা নদীতে। পুরাকাল থেকে বিশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত নদীপথই ছিল গুরুত্বপূর্ণ পরিবহনব্যবস্থা। নদী ও নৌপথই বাণিজ্যিক এবং যাতায়াতের দিকনির্দেশক ছিল। পর্যটেকরাও নদীপথেই এই বদ্বীপ ভ্রমণ করেছেন।

বলা যায়, নদীই এই ভূমি রক্ষায় কৌশলগত নিরাপত্তার মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। আবার নদীই হয়েছে আত্মরক্ষার দরকারে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার প্রধান পথ। সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি (১২১২-১২২৭ সালে) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি বাংলা বদ্বীপে নৌবহরের প্রবর্তন করেন (সূত্র : বাংলাপিডিয়া)। পরে বারো ভূঁইয়াদের দুজন ঈশা খাঁ ও মুসা খাঁ এই অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য শক্তিশালী নৌবহর গড়ে তুলেছিলেন।[১] মোগল সুবাদারেরা এই নৌসেনাদের ব্যবহার করে মগদের বিতাড়িত করেছিলেন। পলাশী যুদ্ধের পরে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের নিরাপত্তা এবং ব্যবসা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নৌপথের ওপর কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় নৌবহরের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের

দিনগুলোতে এই ঐতিহাসিক স্মৃতি ও ভৌগোলিক ঐতিহ্য সমরবিদ ও ময়দানের মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াইয়ের দিকনির্দেশনা দিয়েছিল। বলা যায়, মুক্তিযোদ্ধারা এই নদীগুলোকে পাকিস্তানের আগ্রাসন ঠেকানোর কৌশলগত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

বিভিন্ন যুদ্ধে নদীর ঐতিহাসিক ভূমিকা

প্রাক্-শিল্পযুগে, সাম্রাজ্যবাদী দখলদারির সময়, অতীতের প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা ও অঞ্চলগুলো বিশেষত নদীর পারে হওয়ায় নৌপথ নিয়ন্ত্রণ করা ভূরাজনৈতিক কৌশল হয়ে উঠেছিল। সমুদ্র ও নদীপথের ওপর নিয়ন্ত্রণ ছাড়া কারোর পক্ষেই বিশ্বশক্তি হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। সম্ভবত খ্রিষ্টপূর্ব ১৩০০ সালের দিকে মিসরীয়দের সঙ্গে 'সমুদ্রের বাসিন্দা'দের এক ঐতিহাসিক নৌযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। আক্রমণকারীরা তখন নীল নদ এবং ওই বদ্বীপ ঘিরে চতুর্দিক থেকে মিসরীয়দের ওপর হামলা চালায়। কিন্তু স্থলভাগে মিসরীয়দের প্রাকৃতিক অবস্থান কাজে লাগানো সমর কৌশলের কাছে পরাজিত হয় প্রতিপক্ষ। তখন দুই পক্ষই নীল নদের যুদ্ধে মুখোমুখি হয়। আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধে (১৭৭৫-৮৩) নদীপথে ব্যাপক অভিযান চালানো হয়। ১৭৭৫ সালে, আমেরিকান বাহিনী নিউ ইংল্যান্ড-কানাডা সীমান্ত অঞ্চলের লেক শ্যামপ্লেইনের চারপাশে নদীতে টহল চালায় এবং জলপথের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। সে সময় এলাকা দখদারত্বের চর্চা ছিল এবং ভৌগোলিক কৌশলগত কারণে সৈন্য পরিবহনে নদীপথ ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হ্রদ, মহাসাগর, নদী এবং বদ্বীপ কৌশল (Southeast Asia Lake, Ocean, River, and Delta Strategy) একটি বিখ্যাত ও সফল যুদ্ধকৌশল; এর সংক্ষিপ্ত নাম SEALORDS। নৌপথে সীমিত আক্রমণাত্মক পদক্ষেপের মাধ্যমে উত্তর ভিয়েতনামের বিপ্লবী যোদ্ধারা যাতে নৌপথে চলাচল ও অস্ত্র পরিবহন না করতে পারেন, তার জন্য আমেরিকানরা দক্ষিণ ভিয়েতনামিদের দিয়ে এই কৌশল প্রয়োগে প্রথম দিকে সফল হয়। সেখান থেকেই এই কৌশলগত মতবাদের উত্থান হয়। মেকং নদীর বদ্বীপ এলাকায় নদীপথে অভিযান এবং সম্ভাব্য সংঘাত ঠেকাতে এ-জাতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালানো হয়। যার ফলাফল ভিয়েতনাম ও বর্তমান মিয়ানমার অঞ্চলের যুদ্ধের ইতিহাসে দৃশ্যমান। অনেকটা একই রকম কৌশল দেখা যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটা পর্যায়ে।

বঙ্গীয় বদ্বীপে নদীকেন্দ্রিক যুদ্ধকৌশল

বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করলে সমগ্র ভূপ্রকৃতি ও ভূগোলই মূলত সক্রিয় বদ্বীপ, অর্থাৎ নদীমাতৃক পরিবেশ। ১৯৭১ সালে এখানেও SEALORDS-এর মতো যুদ্ধকৌশল আংশিকভাবে প্রযোজ্য ছিল। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়গুলোর সময়রেখা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বর্ষা মৌসুমে, ১৯৭১ সালের আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত, মুক্তিবাহিনীর বিজয় অনেকটা পক্ষে চলে এসেছিল। ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১০ নম্বর সেক্টরের নেতৃত্বে ৭৮টি নৌকমান্ডো অপারেশন পরিচালিত হয়। এই অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর ধারাবাহিক গেরিলা অপারেশন থাকার পরও হানাদার বাহিনীর ওপর উল্লেখযোগ্য বিজয় সম্ভব হচ্ছিল না। কারণ, পাকিস্তানিরা তাদের যুদ্ধ সরঞ্জাম, খাদ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নৌপথ দিয়ে পরিচালিত করতে পারছিল। বিদেশি জাহাজগুলোর পণ্য পরিবহনও নৌপথে পরিচালিত হচ্ছিল। এর ভিত্তিতে পাকিস্তান বিশ্বদরবারে দাবি করে আসছিল, এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা বিদ্যমান। তাই আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের চলমান মুক্তিযুদ্ধকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং পাকিস্তানিদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য তাদের সমরাস্ত্র ও রসদ জোগানোর নৌপথ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনাই ছিল মুক্তিবাহিনীর প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর অর্থ হলো, বড় ধরনের যুদ্ধ অভিযানে নৌবাহিনীর উপযোগিতা ব্যাপক। শত্রুদের সৈন্য পরিবহন ঠেকানো, জমায়েতের জায়গা না দেওয়া এবং নদীপথে মালামাল সরবরাহের ব্যাঘাত ঘটানো ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করলে দেখা যায়, সম্পূর্ণ ভূপ্রকৃতিই একটি সক্রিয় বদ্বীপ। এখানকার ১ হাজার ২৭৪টি নদী ও খালের সমন্বয়ে বিশাল প্লাবনভূমি ও জলাভূমি তৈরি হয়েছে। এ দেশের মোট ভূমির ৬৭ শতাংশই প্লাবনভূমি, তা বর্ষা মৌসুমে পানিতে ডুবে যেত। সে সময় (১৯৭১) নদীগুলোর ওপর অল্প কিছু সেতু ছিল, যোগাযোগ, পরিবহন এবং পণ্য সরবরাহের নির্ভরযোগ্য উপায় ছিল নদী তথা জলপথ। এই স্থলভাগ বর্ষার পাঁচ মাস জলাভূমি ও প্লাবনভূমিতে রূপান্তরিত হয়। ২৫ হাজার ১৪০ কিলোমিটার জলপথের পাশাপাশি নদীর অববাহিকাগুলো নতুন রূপ পায়। পানি ও বন্যায় তখন সড়ক পরিবহন ব্যাহত হয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা আগে কখনো এমন নদীমাতৃক পরিবেশ দেখেনি। তাদের চোখে বর্ষার পানি ও নদীই হয়ে ওঠে মুক্তিযোদ্ধা। নৌকমান্ডোদের জন্য কৌশলগত সুবিধা বয়ে আনে নদী। বিজয়ের ফলও তখন বাংলাদেশের পক্ষে এসে যায়। বিশেষত,

১৯৭১ সালের আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত যখন নৌকমান্ডো অভিযান শুরু হয়, তখন ছিল বর্ষা মৌসুম।

নদী মুক্তিযুদ্ধে সেক্টরগুলোর সীমানানির্ধারক

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কৌশলগতভাবে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। সেক্টরগুলোর গঠন মুক্তিযুদ্ধ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে প্রমাণিত হয়। তবে সেক্টরের সীমানা রাজনৈতিক ছিল না, বরং ছিল ভৌগোলিক। বেশ কিছু প্রাকৃতিক উপাদান, যেমন নদী, পাহাড় ও ভৌগোলিক অবস্থানই মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরগুলোর সীমানা নির্ধারণে প্রভাব ফেলে। প্রধানত পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, যমুনা, সুরমা, মধুমতী, মুহুরী নদ-নদীগুলো সেক্টর গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। NEDECO (নেদারল্যান্ডস ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্ট), তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (EPIWTA) পরামর্শক হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে চলাচলযোগ্য নৌপথে জরিপ চালায়। তখন বর্ষা মৌসুমে ২৫ হাজার ১৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ নৌপথ সক্রিয় ছিল। এই সুবিশাল সংযুক্ত নৌপথ ও নদীর তীব্র স্রোত ছিল ভিন্ন ভিন্ন, যা পাকিস্তানিদের কাছে অজানা ছিল এবং এই পরিস্থিতিই বাংলাদেশিদের ঐতিহ্য এবং তা কৌশলগতভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সপক্ষে ছিল।

১৯৭১ সালের ১২-১৫ জুলাই কলকাতায় সেক্টর কমান্ডারদের সম্মেলনে, ১১টি সেক্টর গঠন করা হয় এবং বাংলাদেশ সরকার সেক্টর কমান্ডারদের নিয়োগ দেয়। কিন্তু দেশের ভূপ্রকৃতি বিবেচনা করে এই ১০ সেক্টর তৈরির আগেই ১৯৭১ সালের ১৩ মে ১০ নম্বর সেক্টর তৈরি করা হয়। সেক্টর ১০-এর কোনো সাবসেক্টর ছিল না। মুক্তিবাহিনীর চিফ অব স্টাফ এসব কমান্ডো অপারেশন নিয়ন্ত্রণ করতেন। সেক্টর ১০-এর সচিবালয় ছিল পশ্চিমবঙ্গের পলাশী ও মুর্শিদাবাদে[২]। এই পলাশী যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ উদদৌলা পরাজিত হন, মুর্শিদাবাদ ছিল তাঁর রাজধানী। নবাবের পরাজয়ের ঐতিহাসিক স্থান থেকে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরটি তৈরি হয়েছিল। সেক্টর ১০ গঠিত হয় সব কমান্ডোর সমন্বয়ে, এর মধ্যে একটি আত্মঘাতী স্কোয়াডও ছিল। অন্য সেক্টরগুলোতেও কমান্ডো অভিযান পরিচালিত হতো। প্রাথমিক পর্যায়েই ১ হাজার কমান্ডো ছিলেন। কিন্তু তাঁদের মাত্র ৫১৫ জন নিবিড় প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে ভেবে কমান্ডো নিয়োগপ্রক্রিয়া ধীরে ধীরে করা হয়। অথচ বিজয় দ্রুত হয়ে যাওয়ায় এই ৫১৫ কমান্ডোর মধ্যে

১৫০ জন কোনো অপারেশনেই অংশ নিতে পারেননিং।

রিভার অ্যান্ড ডেলটা রিসার্চ সেন্টার (আরডিআরসি) ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে বেশ কয়েকটি মানচিত্র তৈরি করে, যা নদী এবং জলাশয়গুলো কীভাবে বাংলাদেশের উত্থানকে প্রভাবিত করেছিল, তা নির্দেশ করে। এই মানচিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে ভূরাজনৈতিক এবং ভূকৌশলগত গুরুত্ব, নদী ও স্রোতের আলোকে বাংলাদেশের দৃশ্য এবং ১ হাজার ২৭৪টির বেশি নদীর প্রবাহের অবস্থান। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত স্যাটেলাইটে পাওয়া চিত্রগুলো ব্যবহার করে শনাক্তযোগ্য নদীর মানচিত্র এবং সেক্টরের সীমানা নির্ধারণ করা হয়। মানচিত্রগুলো তৈরিতে জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS) এবং রিমোট সেন্সিং সফটওয়্যার যেমন ArcGIS 10.8, Erdas Imagine এবং Google Earth ব্যবহার করে ঐতিহাসিক সেক্টরগুলোর অবস্থান নিরূপণ করা হয়। সেক্টরের সীমানার মানচিত্রগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সেক্টরগুলোর সীমানার প্রায় ৮৭ শতাংশ এলাকা নদী ও জলাশয় দিয়ে নির্ধারিত। বিশেষ করে সেক্টর ১-এর শতভাগ সীমানা, সেক্টর ২-এর ৮৩ শতাংশ সীমানা, সেক্টর ৩-এর ৮০ শতাংশ, সেক্টর ৪-এর ৮৩ শতাংশ, সেক্টর ৫-এর ৮৬ শতাংশ, সেক্টর ৬-এর ৮১ শতাংশ, সেক্টর ৭-এর ৭৬ শতাংশ, সেক্টর ৮-এর ৯০ শতাংশ, সেক্টর ৯-এর ৮০ শতাংশ, সেক্টর ১১-এর ৮৫ শতাংশ সীমানা অন্য সেক্টরগুলোর সঙ্গে নৌপথ দিয়ে আলাদা করা হয়েছে। এই ভূকৌশলগত সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করেই পরে সারা দেশে সেক্টর ও সাবসেক্টরগুলোয় গেরিলা ও নৌ-অভিযান পরিচালিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধে সেক্টরভিত্তিক সমরকৌশল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, যা কিনা মূলত নদীকে কেন্দ্র করে স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের আরডিআরসির তৈরি করা মানচিত্রে ১ হাজার ২৭৪টির বেশি নদী পাওয়া যায়। এর মধ্যে স্বল্প স্রোতের কিছু খালও রয়েছে। সেই সময় এ নদীগুলো দিয়ে ২৫ হাজার ১৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ জলপথের জাল তৈরি হয়েছিল। আমাদের জানামতে, ১৯৭১ সাল নদীর সংখ্যা, বিস্তারিতসহ এ-জাতীয় কোনো মানচিত্র আগে কখনো প্রকাশিত হয়নি।

আরডিআরসি ১৯৭১ সালের ম্যাপ তৈরি করে ১ নম্বর সেক্টরে ১১৭টি নদী, ২ নম্বর সেক্টরে ১৭০টি নদী, ৩ নম্বর সেক্টরে ১১৭টি নদী, ৪ নম্বর সেক্টরে ৫০টি নদী, ৫ নম্বর সেক্টরে ৮৯টি নদী, ৬ নম্বর সেক্টরে ১২০টি নদী, ৭ নম্বর সেক্টরে ১৪৩টি, ৮ নম্বর সেক্টরে ৬২টি নদী, ৯ নম্বর সেক্টরে ২৬০টি নদী এবং ১১

নম্বর সেক্টরে ১৪৬টি নদী পেয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে নদ-নদীর কৌশলগত ভূমিকা

ভূপ্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণে এ দেশের মূল ভূখণ্ডের প্রধান নদী-উপনদী ও শাখানদীগুলো এমনভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে যে প্রাচীনকাল থেকে এ অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ ছিল অনেকটাই অসম্ভব। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নদীপথই মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। গুপ্ত, পাল, সেন, তুর্কি, আফগান, মোগল ও ইংরেজ আমল থেকে নদীগুলোর সামরিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাকিস্তান আমলে দু-একটি বড় নদী ছাড়া বাকি সবই ছিল সেতুবিহীন। ফলে এ যুগেও নদী অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। '৭১-এর মার্চ মাসে স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে থেকে সামরিক বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় ইউনিটগুলোর জন্য জাহাজযোগে অস্ত্রশস্ত্র ও বিভিন্ন রসদ পশ্চিম পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আসতে থাকে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর স্থলপথে গেরিলা হামলা বাড়লে নৌপথ পাকিস্তানিদের জন্য অধিকতর নিরাপদ বলে বিবেচিত হয়। মধ্য আগস্ট পর্যন্ত রসদবাহী পাকিস্তানি নৌযানগুলো অনায়াসেই বাংলাদেশের নৌপথ ও সমুদ্রপথে যাতায়াত করে। একটি যুদ্ধরত দেশে নৌযান চলাচলের এই স্বাভাবিক ধারা প্রকারান্তরে চলমান যুদ্ধের বাস্তবতাকে প্রায় অস্বীকার করার শামিল। এর ফলে প্রথম দিকে বাংলাদেশে চলমান সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা দেশের বাইরে আলোড়ন সৃষ্টি করতে অনেকাংশে ব্যর্থ হয়। এ অবস্থায় পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে যেমন নৌপথ অধিকতর নিরাপদ রুটে পরিণত হয়, তেমনি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য নৌপথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা জরুরি হয়ে ওঠে। ফলে দেশের সমুদ্র ও নৌরুটগুলোতে যাতে কোনো জাহাজ ভিড়তে না পারে, তার ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়।

দেশের তিন দিকে ভারত ও মিয়ানমারের স্থলভূমি এবং দক্ষিণে জলপথবেষ্টিত বলে ভূপ্রকৃতি যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। যুদ্ধকালীন দেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগব্যবস্থা ছিল ভীষণ নড়বড়ে। এখানকার সব শ্রেণির রাস্তা সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহারের উপযোগী ছিল না। দেশের সমভূমির উত্তরাঞ্চল সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ১৫০ মিটার উঁচু, কিন্তু দক্ষিণাঞ্চল ১০ মিটার থেকে ক্রমে আরও নিচু হয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের সঙ্গে মিশে গেছে। এমন কম উচ্চতা ও অসংখ্য নদ-নদীর কারণে বর্ষা মৌসুমে প্রায় বন্যা দেখা যায়। নদীর আধিক্যের কারণে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র বর্ষাকালে এতই প্রশস্ত হয়ে

ওঠে যে এদের এক তীর থেকে অন্য তীর দেখা যায় না।

পাকিস্তানের লে. জেনারেল কামাল উদ্দিন তাঁর *ট্র্যাজেডি অব এররস* গ্রন্থে মন্তব্য করেন, 'সিনাই ও রাইন নদীর প্রবাহ ছিল সংকীর্ণ, সে তুলনায় গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ছিল মাইলকে মাইল প্রশস্ত। ভৈরব ও পাকশী ছাড়া এ দেশের অধিকাংশ নদীই ছিল সেতুবিহীন।' এসব নদী ও তাদের অজস্র শাখানদী প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত।

দেশের দক্ষিণে রয়েছে বিশাল সুন্দরবন, যা বিখ্যাত বেঙ্গল টাইগারের অভয়ারণ্যরূপে খ্যাত। অজস্র বিচিত্র ধরনের নদ-নদীর কারণে এ অঞ্চলে আকাশপথে হামলা ছাড়া যেকোনো সামরিক কৌশল ব্যর্থ হতে বাধ্য।

পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, সুরমা, কুশিয়ারা প্রভৃতি বড় নদী এ দেশকে প্রধানতম চারটি অঞ্চলে বিভক্ত করেছে। এসব অঞ্চলের ভৌগোলিক স্বকীয়তা যেকোনো সামরিক পরিকল্পনা কিংবা অভিযান পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। জলবায়ুগত দিক থেকে বাংলাদেশের জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বর্ষা মৌসুম। যেকোনো সেনা অভিযানের জন্য বিশেষত শুষ্ক অঞ্চলের অধিবাসী পশ্চিমা সামরিক বাহিনীর জন্য অত্যন্ত অসুবিধাজনক ছিল বাংলাদেশি বর্ষাকাল।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল : এ অঞ্চলের দক্ষিণে পদ্মা, পূর্বে যমুনা এবং বাকি দুই দিক ভারত দ্বারা বেষ্টিত। অঞ্চলটি দেশের তৎকালীন ১৬টি জেলা নিয়ে গঠিত। মালামাল দেশের উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণে নেওয়ার প্রধান উপায় হচ্ছে নদীপথ। এ অঞ্চলের প্রধান নদ-নদীগুলো হচ্ছে যমুনা, তিস্তা, করতোয়া ও আত্রাই। এসব নদ-নদী উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত। এগুলো অতিক্রম করে যেকোনো সামরিক অভিযান পরিচালনা করা খুবই দুরূহ ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের ৩ নম্বর ট্রাংকরোড ছিল এই অঞ্চলের তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, সৈয়দপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী বরাবর এক একমুখী রাস্তা। এ অঞ্চলের প্রধান শহর ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, নাটোর, রাজশাহী, পাবনা দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে পাকশীতে ব্রিটিশ আমলে নির্মিত হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ও পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে দৌলতদিয়া ফেরিঘাটের মাধ্যমে যুক্ত। দৌলতদিয়া ও নগরবাড়ি ফেরিঘাট থেকে লঞ্চযোগে যমুনা নদীর মাধ্যমে এই ভৌগোলিক এলাকার বিভিন্ন জেলার যোগাযোগ রক্ষা করা হতো। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ অথবা নগরবাড়ী ফেরিঘাট অচল করে দিতে পারলে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বৃহত্তম অংশের সঙ্গে এ অঞ্চলের জল ও স্থলপথের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া সম্ভব। তাই মুক্তিযুদ্ধের সময় এ অঞ্চলের নদীগুলোর সামরিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল : এ অঞ্চলে রয়েছে ২১টি জেলা। ভারতের কলকাতার নিকটবর্তী হওয়ায় অঞ্চলটি ভারত-পাকিস্তান উভয়ের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যশোর এ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগকেন্দ্র, যেখানে বিমানবন্দর ও সেনানিবাস রয়েছে। শিল্প ও বন্দরনগরী খুলনা সমুদ্রবন্দর চালনার সঙ্গেও যুক্ত। এ অঞ্চলে অবস্থিত হার্ডিঞ্জ ব্রিজ কৌশলগত কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ভৌগোলিক এলাকায় বৃহত্তর যশোর ছাড়া বাকি অঞ্চল এতই নদীবহুল যে প্রচলিত স্থল অভিযান এ অঞ্চলে অকার্যকর হতে বাধ্য। ভাটি অঞ্চল হওয়ায় সারা বছর নাব্যতা থাকা নদী ও গহিন সুন্দরবন এলাকা গেরিলাযুদ্ধের জন্যও অনুপযোগী। সুতরাং এ অঞ্চলের লঞ্চঘাট ও নৌঘাট অকার্যকর করে দেওয়া মানে জাহাজযোগে রসদপত্র ও খাদ্যসামগ্রী নেটওয়ার্কই কার্যত অচল করে দেওয়া।

পূর্বাঞ্চল : বৃহত্তম চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও সিলেট অঞ্চল নিয়ে গঠিত দেশের সর্বপূর্ব সীমান্ত ঘেঁষে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এই অঞ্চল। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ও বৃহত্তম বন্দর চট্টগ্রাম পাকিস্তান বাহিনীর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পাহাড় ও নদীর সমন্বয়ে গঠিত এ অঞ্চল গেরিলাযুদ্ধের যথার্থ স্থান। দেশের বৃহত্তম নদী মেঘনা এই অঞ্চলের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম পাশ দিয়ে প্রবহমান। মেঘনা নদীর প্রতিরক্ষাক্ষমতা এতই প্রবল যে যেকোনো সৈন্যবহরকে অপর পাড়ে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম ছিল। মেঘনা মূলত দেশের পূর্বাঞ্চলকে গোটা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। একমাত্র ভৈরব রেলসেতু দ্বারা এই বৃহত্তম অঞ্চলটি ঢাকা, ময়মনসিংহ, জামালপুরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। জলপথে এ অঞ্চলের সঙ্গে সহজে যোগাযোগ সম্ভব ছিল। এ অঞ্চলে যেকোনো সামরিক অভিযান চালনার ক্ষেত্রে মেঘনার ওপর নির্মিত ভৈরব রেলসেতুর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশ্যক ছিল। কারণ, এটিই ঢাকাকে কুমিল্লা ও সিলেট থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিতে সক্ষম ছিল। এদিকে কুমিল্লায় ছিল পাকিস্তানিদের বিশাল সৈন্যবহর। এদের খাদ্য ও রসদ বন্ধ করতে হলে এ অঞ্চলের নদীগুলোর ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। বিশেষ করে চট্টগ্রাম বন্দর ও চাঁদপুর বন্দর অকেজো করে দিতে পারলে দেশের বাইরের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং জলপথে সব সরবরাহব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাবে। আবার চাঁদপুর অঞ্চলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সংযোগ স্থাপনকারী দাউদকান্দি ও মেঘনা ফেরিঘাট বিকল করে দিতে পারলে ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক যোগাযোগবিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য। তাই এই নদীগুলোর সামরিক গুরুত্ব অপরিসীম।

কেন্দ্রীয় অঞ্চল : পূর্বে সুরমা, কুশিয়ারা ও মেঘনা, দক্ষিণে পদ্মা ও মেঘনা এবং উত্তরে ভারতের অবস্থান থাকায় এ অঞ্চলের ভূভাগের গঠন ইংরেজি 'ভি' আকৃতির এবং কৌণিক কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বাংলাদেশের ভূরাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা। এখানকার প্রধান নদীপথ যমুনা, মেঘনা, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী, শীতলক্ষ্যা, বুড়িগঙ্গা, বানার, তুরাগ সারা বছরই নাব্য থাকে। ঢাকা থেকে এই নৌপথ ধরে দেশের বিদ্যমান সব নৌবন্দরে যাওয়া যায়। তাই এসব নদীতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারলে নদীপথে কেন্দ্র ঢাকা রসদ ও অন্যান্য পণ্য সরবরাহ বিঘ্ন হতে বাধ্য।

১০ নম্বর সেক্টরের নৌকমান্ডো অভিযান

অপারেশন জ্যাকপট : ১৯৭১ সালের ১৫ মে নৌকমান্ডারদের প্রশিক্ষণের পর চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, মোংলা ও নারায়ণগঞ্জে পাকিস্তানের স্থল ও নৌবাহিনী মিলিয়ে যৌথ বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা আলাদা অভিযান পরিচালনা করেন। এই 'অপারেশন জ্যাকপট'-এ পাঁচটি কমান্ডো অভিযান, চট্টগ্রাম বন্দরে অভিযান, মোংলা বন্দর ঘিরে অভিযান, নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দর অভিযান, চাঁদপুর নদীবন্দর অভিযান, দাউদকান্দি ফেরিঘাটে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

সমুদ্র ও নদীবন্দরে সম্মিলিত আঞ্চলিক ও স্থানীয় নৌ অভিযান : মুক্তিযুদ্ধের সময় এই নৌকমান্ডোরা পাকিস্তানি সৈন্যদের পরাস্ত এবং তাদের পণ্য সরবরাহ নেটওয়ার্ক ব্যাহত করার জন্য ২১টি জেলা এবং মহকুমায় অভিযান চালিয়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ও তাদের অর্থনৈতিক সম্পদের ওপর ব্যাপক হামলা চালায়। সরকারি নথি অনুযায়ী, আমরা সেক্টর ১০ কমান্ডোদের দ্বারা পরিচালিত ৭৮টি পৃথক নৌ অভিযানের তথ্য পাই।

বিদেশি জাহাজ ও নৌবহরে কমান্ডো অভিযান : নৌকমান্ডো অভিযান পাকিস্তানিদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এ জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে পাকিস্তানিরা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অভিযুক্ত করে। তারা ভেবেছিল, এত বড় এবং শক্তিশালী অপারেশন শুধু ভারতীয়রাই করতে পারে। কিন্তু পরে তারা জানতে পারে, আত্মঘাতী বাঙালি কমান্ডোরাই এসব অভিযান পরিচালনা করেছেন। ১৯৭১ সালের ১৬ আগস্ট পাকিস্তানের নৌবহর এবং তাদের অস্ত্রভান্ডারে একযোগে হামলা চালিয়ে ধ্বংস করা হয় এবং এই খবরটিই আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় ফলাও করে প্রচারিত হয়। তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী তদন্ত সাপেক্ষে বিষয়টি বুঝতে পারে। তবে মুক্তিবাহিনী যে এমন অভিযান পরিচালনা করতে

পারবে, তা কেউ কল্পনাও করেনি।

১৯৭১ সালের আগস্ট-ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশি নৌকমান্ডোরা ১২৬টি জাহাজ, কোস্টার এবং ফেরি ডুবিয়ে দিতে বা ক্ষতি করতে সক্ষম হন। একটি সূত্র নিশ্চিত করে, ১৯৭১ সালের আগস্ট-নভেম্বর মাসের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কমপক্ষে ৬৫টি জাহাজ (১৫টি পাকিস্তানি জাহাজ, ১১টি কোস্টার, ৭টি গানবোট, ১১টি বার্জ, দুটি ট্যাংকার এবং ১৯টি রিভার ক্রাফট) ডুবে গিয়েছিল। কমপক্ষে ১ লাখ টন মালামাল ডুবে গিয়েছিল অথবা আটকে দেওয়া হয়েছিল। জেটিঘাটগুলোও তখন অকেজো করা হয়েছিল এবং যোগাযোগের চ্যানেলগুলো অবরুদ্ধ করা হয়েছিল। নৌকমান্ডোরা তখন কোনো সামরিক জাহাজের সমর্থন ছাড়াই পাকিস্তানিদের অবরুদ্ধ অবস্থায় রেখেছিল। অপারেশন জ্যাকপটের কারণেই পাকিস্তান নৌবাহিনীর আভিযানিক ক্ষমতা হ্রাস পায়।

গোপন অপারেশন হট প্যান্টস : ১৯৭১ সালের ১৬ আগস্টের পর সব কমান্ডো ভারতে ফিরে যান। এরপর নৌকমান্ডোদের দ্বারা পরিকল্পিতভাবে আর কোনো অভিযান পরিচালনা করা হয়নি। এর বদলে মুক্তিবাহিনীর কয়েকটি দলকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করার জন্য পাঠানো হয় এবং অন্য কমান্ডোরাও সুযোগ বুঝে পাকিস্তানিদের ওপর হামলা চালায়।

মুক্তিবাহিনীর ৯ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর জলিল '৭১-এর আগস্টে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কাছ থেকে একটি নৌ ইউনিট গঠনের অনুমতি নিয়েছিলেন এবং ভারতীয় কমান্ডার এম এন সামান্তের কাছে চারটি গানবোট চেয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের অক্টোবরে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট মুক্তিবাহিনীকে দুটি টহল নৌযান (অজয় ও অক্ষয়) দান করে। এই বোট দুটি খিদিরপুর ডকইয়ার্ডে এক মাসের বেশি সময় ধরে সাজানো হয়। এর মধ্যে ছিল দুটি কানাডিয়ান ৪০ ও ৬০ মিমি বোফর্স বন্দুক এবং দুটি হালকা ইঞ্জিন ও ৮টি গ্রাউন্ড মাইন। এ ছাড়া ডেকের প্রতিটির পাশে চারটি করে আটটি গ্রাউন্ড মাইন বহন করার জন্য মোট ৩ দশমিক ৮ মিলিয়ন ভারতীয় রুপি খরচ করা হয়। এই টহল নৌকা দুটির নাম দেওয়া হয় 'বিএনএস পদ্মা ও বিএনএস পলাশ'। ৪৪ জন বাঙালি নাবিক এবং ১২ জন নৌকমান্ডো দ্বারা চালিত হয়েছিল বিএনএস পদ্মা ও পলাশ। ১৯৭১ সালের ৩০ অক্টোবর ভারতীয় নৌবাহিনীর অফিসাররা মুক্তিবাহিনীর কাছে নৌযান দুটি হস্তান্তর করে। কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান পি কে সেন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার কে পি রায় নৌযান দুটি হস্তান্তর করার সময় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাপ্টেন কামরুজ্জামান

উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এই ফ্লোটিলার মিশন ছিল চালনা বন্দরের প্রবেশমুখে আঘাত করা এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি ফ্রিগেটের সাহায্যে পাকিস্তানি নৌবহরে আক্রমণ করা। ১৯৭১ সালের ১০ নভেম্বর এই নৌযানগুলো সফলভাবে মোংলা বন্দরের প্রবেশপথে মাইন পুঁতে দেয়। ১৯৭১ সালের ১১ নভেম্বর মোংলা থেকে কিছুটা দূরে ব্রিটিশ জাহাজ 'দ্য সিটি অব সেন্ট অ্যালবানস'কেও বিতাড়িত করে মুক্তিবাহিনীর এই দুটি নৌযান।

নৌ অভিযান ও মুক্তিযুদ্ধের জয়

নৌকমান্ড অভিযানের প্রতিক্রিয়ায় বিধ্বস্ত পাকিস্তানি সরকার প্রথমে ভারতকে দায়ী করে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনা করে। পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসের পরদিনই এ রকম হামলায় দখলদার সরকার রীতিমতো বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হয়। ১৫ আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত শতাধিক অভিযানে নৌকমান্ডোরা শত্রুবাহিনীর ১২৬টি জাহাজ ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হন। লায়ডস রেজিস্ট্রার অব শিপিংয়ের হিসাবমতে, নৌকমান্ডোরা এই কয়েক মাসের অভিযানে এক লাখ টন মালামাল ডুবিয়ে দেন, আরও এক লাখ টন মালামালের ক্ষতি করেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর কোনো নৌবাহিনী কোনো সাগরে এত ক্ষয়ক্ষতি ঘটাতে সক্ষম হয়নি।

আগস্ট মাসের আগপর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের সমুদ্রবন্দরে বিদেশি জাহাজ মালপত্র নিয়ে আসত, আবার যাওয়ার সময় মালপত্র বোঝাই করে নিয়ে যেত। আগস্টে ৪ বন্দরে একযোগে অভিযান চালিয়ে ২৬টি বিদেশি জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়া হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় বহির্বিশ্বে আলোচনার ঝড় ওঠে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে নৌকমান্ডোদের সব হামলার নিশানায় থাকে বিদেশি জাহাজ। এর ফলে এ অঞ্চলের জাহাজের বিপরীতে ইনস্যুরেন্স দেওয়া বাতিল করে দেওয়া হয় এবং বিদেশি জাহাজমালিকেরা পূর্ব পাকিস্তানে জাহাজ পাঠানো বন্ধ করে দেন। এরপর নৌকমান্ডোদের টার্গেট হয় নদীর ওপরের রেলব্রিজ, পাকা ব্রিজ ও স্থল স্থাপনা ধ্বংস করা। এর ফলে শত্রুবাহিনীর মনোবল একেবারে ভেঙে যায়। নৌকমান্ডো অভিযান, গেরিলাযোদ্ধাদের মনোবল অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। এত দিন মুক্তিযুদ্ধের অভিযান শুধু স্থলভূমিতেই সীমাবদ্ধ ছিল, জলপথ ছিল পাকিস্তানিদের নিরাপদ আশ্রয়। নৌ অভিযানের পর থেকে পাকিস্তানিদের বিপর্যয় ও পরাজয় নিশ্চিত হওয়া শুরু হয়।

নদীভিত্তিক অভিযানের কারণেই পাকিস্তানি বাহিনী আস্থা হারাতে শুরু করে এবং ১৯৭১ সালের আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধে পরাজিত হতে থাকে। সরকারি তথ্য অনুসারে, ১০ নম্বর সেক্টরের নৌকমান্ডোরা অপারেশন জ্যাকপট, হট প্যান্টসহ আরও ৭৮টি অভিযান চালান। এ ছাড়া আরডিআরসি ওই সব নদীতে তিন শতাধিক গেরিলা অভিযানের তথ্য খুঁজে পেয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের বেশির ভাগ অভিযানে নদী এবং খাল-বিলের স্রোত কৌশলগত প্রতিরক্ষা হিসেবে ব্যাপক সুবিধা দিয়েছে। বড় ও ছোট নদী, বর্ষা এবং বৃষ্টি, শত্রুবাহিনীকে তাদের দখলদারি থেকে ধীর ধীরে সরিয়ে দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে যৌথ অভিযান এবং সম্মিলিত কৌশলের মারাত্মক সমন্বয়ের মাধ্যমেই আমাদের বিজয় অর্জিত হয়েছে। একাত্তরের যুদ্ধে দেশের নদীগুলোই মুক্তিবাহিনীর সামগ্রিক বিজয়ের সহায়ক ছিল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সম্পূর্ণ ইতিহাস যখন লেখা হবে, তখন অভিযানগুলোর সঙ্গে সঙ্গে নদীনালাগুলোকে সাফল্যের অন্যতম মৌলিক কারণ হিসেবে ধরতে হবে।

প্রতিবেশের সঙ্গে জনপদের ঐতিহাসিক আন্দোলন ও প্রতিরক্ষার সম্পর্ক কতটা জৈবিক, তা একাত্তরের মুক্তিসংগ্রাম আবারও দেখাল। অন্যদিক থেকে বললে, একটি জনপদের সামাজিক-রাজনৈতিক ও সামরিক স্বভাব সেই দেশের ভৌগোলিক ও প্রতিবেশব্যবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণভাবে গড়ে ওঠে। নদী, ইতিহাস আর মানুষের এই জড়াজড়ি সম্পর্ক বাংলাদেশকে স্বাধীন করায় বিরাট ভূমিকা রেখেছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে নদীর ভূমিকা পর্যালোচনা করলে নদীকে সামরিক অ্যাক্টর ও ফ্যাক্টর হিসেবে আমরা দেখতে পাই। নদী নিম্নলিখিত ভূমিকা পালন করেছিল :

১. প্রতিরক্ষা ধরন হিসেবে পারাপার ঠেকাতে নদী নিজে প্রত্যক্ষ প্রতিরক্ষা হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে।
২. নদী এবং এর তীরবর্তী এলাকায় অভিযানের বেলায় অনুকূল ও কৌশলগত উপাদান হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে।
৩. নদী একটি প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষাব্যবস্থা, যা অভিযানের সময়ে এর তীরে থাকা শত্রুপক্ষকে স্থিতিশীল বা চলাচলে অক্ষম করেছে।
৫. যুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধারা নদীকে অস্ত্র পরিবহন এবং আড়াল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।
৫. স্থলভাগের মতো নদীগুলোও সর্বোচ্চ সামরিক সুবিধা দিয়েছে।

৬. আক্রমণের ধরন, অতর্কিত হামলা, সংঘর্ষের জন্য নদীগুলো গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৯. জলপৃষ্ঠজুড়ে থাকা কচুরিপানা অনেক ক্ষেত্রেই পাকিস্তানি বাহিনীকে খালে-বিলে ও ছোট নদীতে চলাচলে বাধা হিসেবে হাজির হয়েছিল।

১০. শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের রাতের আঁধারে আশ্রয়ের জন্য চলাচলকে পাকিস্তানিদের দৃষ্টির বাইরে রাখায় বড় সহায় ছিল নদী।

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের ৩০ হাজার নিয়মিত সৈন্য এবং ১ লাখ গেরিলা সেনা মোতায়েন এবং তাদের দ্বারা কমপক্ষে ২৩১টি সেতু, ১২২টি রেললাইন, ৯০টি বৈদ্যুতিক স্টেশন, ৭৮টি নৌকমান্ডো অভিযান পাকিস্তানি বাহিনীর পণ্য সরবরাহব্যবস্থাকে অকার্যকর করে ফেলে। ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত কমপক্ষে ২৩৭ জন পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা, ১৩৬ জন জেসিও এবং নিয়মিত সেনাবাহিনীর ৩ হাজার ৫৫৯ জন সৈনিক এবং অনির্দিষ্টসংখ্যক পুলিশ, পশ্চিম পাকিস্তান রেঞ্জার্স, ইপিসিএএফ এবং রাজাকার সদস্য ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। এসব গেরিলা অভিযান পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মনোবলও কমিয়ে দিয়েছিল। নভেম্বরের মধ্যে, পাকিস্তানি বাহিনী তাদের ঘাঁটিতেই অবস্থান নেয়। অসম ক্ষমতার চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও তা দখলে নিতে, মুক্তিযোদ্ধাদের চূড়ান্ত বিজয়ের পথে নৌযুদ্ধের অবদান ছিল বিশাল এবং গুরুত্বপূর্ণ।

● **মোহাম্মদ এজাজ** চেয়ারম্যান, রিভার অ্যান্ড ডেলটা রিসার্চ সেন্টার।

তথ্যসূত্র

১. *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন*, মমতাজুর রহমান তরফদার, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

২. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ : সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস* (সেক্টর ১০)

৩. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ : সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস* (সেক্টর ১০)

সাক্ষাৎকার

বাংলাদেশের প্রকৃতিই মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসী ও জোটবদ্ধ করে

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ভূপ্রকৃতি এবং নদ-নদীর ভূমিকা নিয়ে *প্রতিচিন্তার* সঙ্গে কথা বলেছেন নদী ও পানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আইনুন নিশাত। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন *প্রথম আলোর* বিশেষ প্রতিনিধি **ইফতেখার মাহমুদ**

ইফতেখার মাহমুদ : নদী ও মানুষের সম্পর্ক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কী ভূমিকা রেখেছে? কৃষিপ্রধান দেশে যৌথভাবে প্রতিরোধের সংস্কৃতির উৎস কী ছিল?

আইনুন নিশাত : বাংলাদেশ প্রাচীনকাল থেকে নদীপ্রধান ও বন্যাপ্রবণ দেশ। এখানকার মানুষের জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নদীর সম্পর্ক গভীর। অনেক আগে থেকেই কৃষি ও সেচব্যবস্থার সঙ্গে বন্যার সম্পর্ক ছিল। ব্রিটিশরা এই অঞ্চলে আসার আগে মোগল ও তারও আগের আমলে লেখা বইপত্রে এর অনেক প্রমাণ পাই। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়কার মির্জা নাথানের *বাহারিস্তান-ই-গায়বী* বইয়ে প্রতিটি গ্রামে বড় ভূস্বামী ও ধনী ব্যক্তিদের নেতৃত্বে সমাজ পরিচালিত হওয়ার কথা আছে। তাঁরা গ্রামের লোকদের একত্র করে অষ্টমাসি বাঁধ বানাতেন। এটি আট মাস স্থায়ী ছিল। ওই সময়টাতে যাতে কৃষিজমিতে নদীর পানি ঢুকে পড়তে না পারে, তার ব্যবস্থাপনার জন্য এটি করা হতো। আট মাস পর তা কেটে দেওয়া হতো। বৃষ্টি আর জমে থাকা পানি তখন বেরিয়ে যেত। বর্ষার শুরুতে আবার যাতে জমিতে পানি আসতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা হতো। প্রতিটি গ্রামে দুই ধরনের লোক ছিল। একদল 'গ্রাম সরঞ্জামি', এরা টুকরি-কোদাল নিয়ে তৈরি থাকত। বাঁধ ভেঙে গেলে তারা মাটি তুলে বাঁধগুলো মেরামত করত। আরেকটি দল ছিল 'ঘোড়সওয়ারি দফাদার' নামে। এরা বাঁধ পাহারা দিত। এদের বেতন দিত গ্রাম সমাজ।

বাঁধের পাশে দোকান ও হাট থাকত। কোথাও বাঁধ ভেঙে পানি ঢুকে পড়েছে কি না, তা বোঝা যেত পানি ঘোলা হয়েছে কি না, তা দেখে। এসব চিহ্ন দেখে গ্রামের ওই ঘোড়সওয়ারেরা গ্রামপ্রধানকে খবর দিত। তিনি গ্রামবাসীদের এক করে বাঁধ মেরামতে নেমে পড়তেন। গ্রামের নানা বিপদ-আপদেও গ্রামপ্রধান এবং গ্রামবাসীর সংগঠিতভাবে কাজ করার চর্চা ছিল। আমাদের উৎপাদনব্যবস্থা অনেক বেশি কৃষিনির্ভর বলে প্রকৃতির সঙ্গে সমন্বয় করে চলতে হতো। কৃষিকাজে দা, কোদাল, লাঙলসহ অন্যান্য যন্ত্রের ব্যবহার ছিল। পরে এগুলোই দেশীয় অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নদী ও কৃষিপ্রধান সমাজের এই সংস্কৃতি আমাদের মুক্তিযুদ্ধেও বড় ভূমিকা রেখেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, গ্রামবাসীর উদ্যোগে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাসহ যুদ্ধের বহু রকম কৌশল নির্ধারণে এই সংস্কৃতি অবশ্যই ভূমিকা রেখেছে।

ইফতেখার মাহমুদ : দেখা গেছে, গ্রাম মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের আশ্রয় দিচ্ছে। মেয়েরা এগিয়ে আসছে।

আইনুন নিশাত : বাঁধ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে পুরুষদের একধরনের ভূমিকা ছিল। আবার নারীরাও সরঞ্জামিদের দা-কোদালসহ অন্য জিনিসপত্র এগিয়ে দেওয়ার কাজে শামিল হতো। বাঁধ মেরামতের সময় তারা পিঠাসহ অন্যান্য খাবার রান্না করে দিত। আবার খরার সময় গ্রামে খাদ্যসংকট দেখা দিলে নারীরা বিপদের সময়ের জন্য তুলে রাখা খাবার বের করত। নিজেরা খেত, পাড়া-প্রতিবেশীদের দিত। এই সবকিছু মিলে গ্রামীণ সমাজের মধ্যে একটি এজমালি চেতনা বা কমিউনিটি ফিলিংস কাজ করত। এই গ্রামীণ প্রকৃতি এবং উৎপাদনব্যবস্থা-নির্ভর চেতনা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বড় প্রেরণা ও শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। বাংলাদেশে গ্রামীণ নারীরা যে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেওয়া, খাবার দেওয়া, তথ্য দেওয়াসহ সক্রিয়ভাবে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছে, এটাও আমাদের গ্রামীণ চর্চার মধ্যে ছিল। এর প্রতিফলন শিল্প-সাহিত্যেও রয়েছে।

ইফতেখার মাহমুদ : কী রকম?

আইনুন নিশাত : বেশ কিছু বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে আমরা নারীদের এই ভূমিকা দেখতে পাব। নদীভাঙন ও ফসলহানির মৌসুমে প্রতিবেশীদের সহায়তা করা এখানে সামাজিক নিয়মের মধ্যে ছিল। সত্যজিৎ রায়ের যে *অশনি সংকেত* ছবিতে ববিতা অনঙ্গ বউ নামের চরিত্রটি করেছিলেন, সেখানেও এটার ছাপ রয়েছে। সেখানে তাঁদের বাড়িতে পণ্ডিতমশাই এলেন। এখন তাঁকে খেতে দিতে হবে। অনঙ্গ বউ স্বামীকে বলছেন যে অতিথিকে খাবার দিলে নিজেদের

খাবার থাকে না। তা-ও তাঁরা নিজেরা না খেয়ে অতিথিকে খাওয়ালেন। তার মানে এখানে পাড়া-প্রতিবেশীদের প্রতি সহমর্মিতার বোধ কাজ করত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মা নদীর মাঝি*তে আমরা দেখি, হোসেন মিয়া নতুন চরে কৃষিকাজ এবং বসত করার জন্য গ্রামবাসীকে সংগঠিত করছেন। তাঁর ডাকে অনেকে ওই চরে গিয়ে কৃষিকাজে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। তারাশঙ্করের *পঞ্চগ্রাম* উপন্যাসে আমরা দেখি, বিভিন্ন গ্রামপ্রধান নির্দিষ্ট দিনে বা কোনো সংকটের সময়ে একত্র হচ্ছেন। আলোচনার মাধ্যমে তা মোকাবিলার কৌশল নির্ধারণ করছেন। তাঁদের নির্দেশ নিজ নিজ গ্রামের মানুষ অনুসরণ করত। এই যে একে অপরের ডাকে সাড়া দেওয়া, গ্রামপ্রধানের নির্দেশে যার যা কিছু আছে তা নিয়ে বাঁধ রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়া; এগুলো এখানে আগে থেকেই ছিল। বঙ্গবন্ধু ছোটবেলা থেকে এগুলো দেখে বড় হয়েছেন। ফলে উনি যখন ৭ মার্চের ভাষণে বললেন, 'তোমাদের যার কাছে যা কিছু আছে, তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো'; তখন সাধারণ মানুষ বুঝে গিয়েছিল কী করতে হবে। এই নির্দেশ তো উনি গ্রাম থেকে শিখেছেন। তিনিও নদীপারের কাদামাটির গ্রামে বেড়ে ওঠা মানুষ। এভাবে গ্রামীণ মানুষের প্রতিরোধ গড়ে তোলার সংস্কৃতিকে উনি জাতীয় কর্মসূচি করে নিলেন।

ইফতেখার মাহমুদ : বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস তো রাজা-বাদশাহ ও অভিজাতদের বয়ানে ভরা। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসেও কি তা-ই দেখা যায়? '৭১-এর ইতিহাসে কি গ্রাম ও তার প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপট জায়গা পেয়েছে?

আইনুন নিশাত : আমাদের এখানে নদী ও গ্রামীণ প্রেক্ষাপটের ইতিহাস খুঁজতে গেলে খুব বেশি উপাদান পাওয়া যাবে না। মোগল বা সুলতানি আমলের যেসব বইপুস্তক আমরা পাই, তার বড় অংশজুড়ে রাজা-বাদশাহ ও জমিদারদের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা পাওয়া যাবে। তার মধ্যেও মির্জা নাথানসহ অনেকে কিছু বই লিখে গেছেন। একইভাবে আবুল ফজলের *আকবরনামা*র মতো বইয়ে গ্রামীণ জনজীবনের কিছু চিত্র উঠে এসেছে। আর এখানে গ্রামীণ সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি, তাতে পৌরাণিক ঘটনা হলেও তার মধ্যেও গ্রামীণ জীবন ও ভাব সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। তবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য রাখার চর্চা এখানে খুব বেশি দেখা যায় না। যেমন আমরা যদি ইংল্যান্ডে যাই, সেখানে এডিনবরা বা ড্যান্ডি শহরের বেশির ভাগ নাগরিকের তথ্য চার্চে পাওয়া যাবে। সেখানে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন, তিনি নাগরিকদের নাম, পরিচয়, বৈশিষ্ট্য, এলাকার বর্ণনাসহ অনেক তথ্য

সংরক্ষণ করতেন। ফলে একটি শহর বা গ্রামের একজনের বাপ-দাদা বা তার আগের প্রজন্মের অনেক তথ্য সংরক্ষিত থাকত। ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলা অঞ্চলের যেসব তথ্য আমরা পাই, তার বড় অংশ চার্চ, পাদরি ও ব্রিটিশ প্রশাসকদের লেখা। তাঁরা বাংলাসহ ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ, প্রকৃতি ও নদীর তথ্য নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা শুরু করেন। এটা অবশ্য তাঁদের শাসনব্যবস্থার ধরনের জন্য করতে হয়েছে।

ফলে মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রেও ইতিহাস রচনায় সেক্টর কমান্ডারকেন্দ্রিক, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটের ইতিহাস পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রামীণ জনপদ ও জীবন কীভাবে যুদ্ধে ভূমিকা রেখেছে, তা খুবই কম পাওয়া যাবে। এটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় একটা বড় সংকটও বলা যায়।

ইফতেখার মাহমুদ : বলা হয়, বাংলাদেশের প্রকৃতিও পাকিস্তানি বাহিনীকে রুখে দাঁড়িয়েছিল। কথাটা ব্যাখ্যা করবেন?

আইনুন নিশাত : বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় আমাদের নিত্যসঙ্গী। এই অঞ্চলের আবহাওয়া মূলত গ্রীষ্মপ্রধান ও বর্ষানির্ভর। অন্যদিকে পাকিস্তানের ভূমিরূপ রুক্ষ, মরুময় আর শীতপ্রধান। অনেক এলাকায় বরফ পড়ে। সেখানকার বেশির ভাগ নদীর পানি বরফগলা ও ঠান্ডা। সাংস্কৃতিকভাবে নদীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কম। বেশির ভাগ মানুষ সাঁতারই জানে না। বিপরীতে আমাদের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বড় অংশই সাঁতার জানে এবং তারা রাতে বিভিন্ন কাজে অভ্যস্ত। যেমন মাছ ধরা, ফসলের মাঠ পাহারা দেওয়াসহ নানা কর্মকাণ্ড চলত মূলত রাতেই।

পাকিস্তানে তার উল্টোটা চলে। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর সদস্যরা মূলত শীতপ্রধান অঞ্চলে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। তাদের চলাফেরা ছিল মূলত শহরকেন্দ্রিক। তারা রাতে চলাফেরা করতে ভয় পেত। বিল, হাওর, বাঁওড়ের মতো বড় জলাশয় দিয়ে কীভাবে চলাফেরা করতে হবে, তা তারা জানত না। যুদ্ধকালে তারা মূলত শহর এবং জেলা-উপজেলা সদরগুলোতে অবস্থান করত। অপারেশন শেষ করে তাদের সেখানে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ ছিল। ফলে বাংলাদেশের গ্রামীণ পথঘাট দিয়ে চলাচল করাটাই তাদের জন্য বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের বেশির ভাগ গ্রামের রাস্তা ছিল মাটির। সামান্য বৃষ্টিতে এসব রাস্তা কাদাটে হয়ে যেত। পলিমাটির এই কাদাটে পথ দিয়ে দ্রুত চলাফেরা করার প্রশিক্ষণ ও চর্চা কোনোটাই তাদের ছিল না। এই প্রাকৃতিক

প্রেক্ষাপট পাকিস্তানি সেনাদের বিপদে ফেলেছিল। সেই সঙ্গে মশা, ম্যালেরিয়া ও অচেনা পোকামাকড়ের উৎপাত তো ছিলই। তবে এসব বিপদ কিছুটা কাটিয়ে উঠতে সহযোগিতা করেছিল এ-দেশীয় রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর লোকেরা। তারা পাকিস্তানিদের পথঘাট চিনিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং এখানকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার বেলায় সহযোগিতা করেছে।

পাকিস্তানিদের প্রকৃতি ও সমাজ আমাদের চেয়ে একদম আলাদা। সেখানে বড় ভূস্বামীরা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করত। গ্রামের বাকি মানুষ অনেকটা দাসের মতো জীবন যাপন করত। সেখানকার বড় জমিদারিগুলোতে নিজস্ব জেলখানাও থাকত। আদেশ অমান্যকারীদের পায়ে শিকল পরিয়ে রাখা হতো। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর মধ্যেও এর প্রভাব ছিল। সামরিক বাহিনীর বড় অফিসার, ব্রিগেডিয়ার-কর্নেলরা আসত জমিদার পরিবার থেকে। রাজনীতিবিদদের বড় অংশ উঁচুতলার ওই সমাজ থেকেই আসত। ফলে মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও যৌথ সামাজিক সংস্কৃতি তাদের মধ্যে ছিল না। তারা শুধু নির্দেশদাতা হিসেবে ভূমিকা রাখত। আর নিজেরা আরাম-আয়েশে থাকতে পছন্দ করত।

বিপরীতে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনৈতিক নেতারা একই ধরনের সমাজকাঠামো থেকে আসা মানুষ ছিল। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক গ্রামীণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা। বঙ্গবন্ধু তো একদম গ্রামীণ সমাজে বেড়ে ওঠা মানুষ। ফলে যুদ্ধের কৌশল, যুদ্ধের অনুপ্রেরণা এবং স্বাধীনতার জন্য মরণপণ লড়াই করার বিষয়টি আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও গ্রামীণ সমাজের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই ছিল। কোনো প্রশিক্ষণ বা ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কৌশল মেনে এটি হয়নি।

ইফতেখার মাহমুদ : জুলফিকার আলী ভুট্টো নিজেও তো জমিদার পরিবারের সদস্য ছিলেন।

আইনুন নিশাত : জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের অন্যতম ধনী একটি পরিবারে জন্ম নেন। পশ্চিমা দেশে উচ্চশিক্ষা নেওয়া এই রাজনীতিবিদের নিজেদের জমিদারি ছিল। ফলে রাজনীতিবিদ হিসেবে ভুট্টো ও বঙ্গবন্ধুর মধ্যে সামাজিকভাবে বিপুল পার্থক্য ছিল। এই পার্থক্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে।

ইফতেখার মাহমুদ : পাকিস্তান তো পূর্ব বাংলার কৃষকের স্বপ্নের দেশ ছিল। তাঁরা মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানের প্রতি মোহভঙ্গ হওয়ার পেছনে এখানকার নদী, বন্যা ও ফসল

মার খাওয়া বড় ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করা হয়। ভাষা আন্দোলন, কৃষক-প্রজা পার্টির উত্থান ও ছয় দফার পটভূমি নির্মাণে কৃষি ও নদীর ভূমিকাকে অনেকে সামনে আনছেন। মুক্তিযুদ্ধের এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরির ক্ষেত্রে এখানকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভূমিকা কতটুকু ছিল?

আইনুন নিশাত : ভাষা আন্দোলনের পরপর ১৯৫৪, ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে পরপর বড় বন্যা হয়। তখন মুসলিম লীগ থেকে আলাদা হয়ে মাত্র আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছে। ধারাবাহিক ওই বন্যার পর এই নতুন রাজনৈতিক দলটি বন্যা থেকে মুক্তির দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এটি আওয়ামী লীগকে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে জনগণের অনেক কাছাকাছি নিয়ে যায়। তিন দফা বন্যার পর ১৯৫৬ সালে দুর্ভিক্ষে অনেক মানুষ মারা যায়। সে সময় পুরান ঢাকা থেকে একটি ভুখা মিছিল তৎকালীন লাট সাহেবের বাড়ির দিকে আসতে থাকে, যার নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু। এখন যে ফুলবাড়িয়ায় পশু হাসপাতাল বানানো হয়েছে, সেখানে ওই মিছিল পৌঁছালে পুলিশ গুলি করে। তখন আরেকটি বিষয় ছিল, ঢাকায় কোনো ঘটনা ঘটলে তা দ্রুত জেলা শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ত। আর গ্রামে ছড়াত মসজিদের মাধ্যমে। ঢাকায় ভুখা মিছিলে হামলা হয়েছে, এই খবর মসজিদ থেকে মসজিদের মাধ্যমে জেলা-উপজেলা ও গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। এখনকার মতো তখন মুঠোফোন ছিল না, এটা ঠিক। কিন্তু গ্রামের সঙ্গে শহরের মানুষের নিয়মিত যোগাযোগ ও যাতায়াত ছিল। যোগাযোগের এই নিজস্ব মাধ্যম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভকে আরও তীব্র করে।

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তখন উপায় না দেখে দ্রুত সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধুর কাছে ক্ষমতা দিয়ে দেয়। শেরেবাংলা অবশ্য আলাদা হয়ে কৃষক-প্রজা পার্টি গঠন করেন। তিনি নিজে একটি গ্রামীণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে রাজনীতিতে এসেছিলেন। আইন পেশায় থাকার কারণে গ্রামের মানুষদের ভূমিসংক্রান্ত প্রচুর মামলা পরিচালনা ও সহযোগিতা তিনি দিতেন। যে কারণে তিনি পূর্ব বাংলার গর্ভনর থাকার সময় ভূমি সংস্কার আইনসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এসব ওই সময়ের মুসলিগ লীগের জমিদারদের প্রতিনিধি নেতাদের স্বার্থের বিপক্ষে যায়। এই সবকিছু পূর্ব বাংলার মানুষদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে। তিনটি ধারাবাহিক বন্যার সুদূরপ্রসারী প্রভাবও পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে পড়ে। এমনকি ওই সময়ের ভূরাজনীতিতে পাকিস্তানের মিত্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়। যার ফলে ওই সময়ে আমরা প্রথম

নিজের চোখে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সদস্যদের সামনাসামনি দেখি। তারা পূর্ব বাংলায় খাদ্য ও চিকিৎসাসহায়তা নিয়ে আসে। বাটার অয়েল, গুঁড়া দুধ ও একধরনের মাংস তারা সহায়তা হিসেবে দিত। ওই মাংস সেদ্ধ করলেই খাওয়া যেত। তখন দ্রুত খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর দাবি ওঠে। বন্যা মোকাবিলায় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মানুষের এসব দাবি রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগ সামনে আনে। আওয়ামী লীগ থেকে বন্যা ব্যবস্থাপনার দাবি জানিয়ে আন্দোলন শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে মার্কিন ক্রুগ মিশন, উপকূলীয় বেড়িবাঁধ ও নদী ব্যবস্থাপনার ধারণা নিয়ে আসে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় নদী ব্যবস্থাপনায় প্রকল্প নেওয়া হয়। ক্রুগ মিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য আওয়ামী লীগ থেকে তখন রাজনৈতিক কর্মসূচি ও দাবি তোলা হয়। এর বড় কারণ ছিল বন্যার হাত থেকে এখানকার কৃষি ও কৃষকদের রক্ষা করা। ফলে পুরো স্বাধীনতা আন্দোলনে বন্যা ও দুর্যোগ বড় ভূমিকা রেখেছে বলা যায়।

ইফতেখার মাহমুদ : '৭০-এর ঘূর্ণিঝড়ও তো '৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরুর পেছনে ভূমিকা রেখেছে বলা হয়।

আইনুন নিশাত : বাংলাদেশের যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় যে সমন্বিত উদ্যোগ দরকার হয়েছে, তা গ্রামবাসী একসঙ্গে মিলে করেছে। কিন্তু ঘূর্ণিঝড়ের মতো বড় দুর্যোগ বা জাতীয় বিপর্যয় তো গ্রামবাসীর একার পক্ষে মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। এর জন্য জাতীয় উদ্যোগ দরকার ছিল। পাকিস্তানের শাসকেরা তা করেনি। তারা বিশ্বের ইতিহাসের অন্যতম শক্তিশালী এই ঝড়ের কারণে মারা যাওয়া কয়েক লাখ মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব তখন মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছে। তারা পাকিস্তানিদের এই অবহেলাকে রাজনৈতিকভাবে সামনে এনেছে। বাংলাদেশের মানুষের মনে এ ঘটনা গভীরভাবে রেখাপাত করে। বাংলাদেশের মানুষের সহমর্মিতার সংস্কৃতির সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের সামন্তীয় ও নির্মম মানসিকতার সংঘাত চরম রূপ নেয়। এর ফলাফল হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর মানসিক প্রস্তুতি তৈরি হয়।

ইফতেখার মাহমুদ : মুক্তিযুদ্ধে বিদ্যুৎকেন্দ্র ও সেতুগুলো উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ কারণে পাকিস্তানিদের পক্ষে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী করা কঠিন হয়ে পড়ে কি?

আইনুন নিশাত : মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড একসঙ্গে ছিল। আমি বুয়েট থেকে পাস করার পর ওই সংস্থায় প্রথম চাকরি

করি। যুদ্ধের সময় সরকারি চাকরিতে থাকা প্রকৌশলীরা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে দেশের নদ-নদী, বিদ্যুৎকেন্দ্র ও সেতুগুলোর মানচিত্র সরবরাহ করেছিল। এসব মানচিত্রকে ধরে অবকাঠামোগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। ফলে পাকিস্তানিরা অবকাঠামোকে ধরে যে যোগাযোগব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল, তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় দেশের বড় অংশ এমনিতেই মুক্তাঞ্চল হয়ে যায়।

ইফতেখার মাহমুদ : মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের আবহাওয়া ও প্রকৃতি কেমন ছিল?

আইনুন নিশাত : পাকিস্তানিরা মার্চে আক্রমণ করার দুই মাসের মাথায় বাংলাদেশে বর্ষা শুরু হয়ে যায়। নদীগুলো পানিতে ভরে যায়, রাস্তাঘাট সব কর্দমাক্ত হয়ে ওঠে। ফলে পাকিস্তানিরা শহর ও সেনানিবাসগুলো ছাড়া অন্যত্র খুব বেশি সময় থাকতে পারত না। রাজাকারদের সহায়তায় তারা বিভিন্ন গ্রামে হামলা চালিয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে আসত। কিন্তু সেখানে বেশি সময় অবস্থান করত না। আমার এক বন্ধু বেন ক্রো '৭১ সালে *স্টেটসম্যান* পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে সারা দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি তাঁর প্রতিবেদনগুলোতে লিখেছেন, প্রাকৃতিক কারণে বাংলাদেশের বেশির ভাগ গ্রাম মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে মুক্তাঞ্চলের মতোই ছিল। তিনি সারা বাংলাদেশ হেঁটে ও নৌকায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। শহরগুলোতে পাকিস্তানি সেনাদের তিনি খুব বেশি দেখেননি।

মুক্তিযুদ্ধের ওপরে তৈরি হওয়া তথ্যচিত্রগুলোতে আমরা দেখি কৃষক মাছ ধরছে, ফসল কাটছে। এর মধ্যে পাকিস্তানি সেনাদের গতিবিধি লক্ষ রাখছে। সেই খবর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। পাকিস্তানি সেনারা বাংলার নৌপথ নিয়ে সবচেয়ে বিপদে ছিল। কারণ, তাদের প্রশিক্ষণ হয়েছে সমুদ্র ও বড় নদীতে। বাংলার জোয়ার-ভাটার নদী, খাল-বিল পার হতে না পেরে অনেক অপারেশন অসমাপ্ত রেখে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে তারা। অন্যদিকে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা মূলত নৌপথ ব্যবহার করে অস্ত্র পরিবহন করেছে, যাতায়াত করেছে। ফলে মুক্তিযুদ্ধে পানিপথ আমাদের জন্য বড় সহায় ছিল। আর পাকিস্তানিদের জন্য বড় বিপদ ছিল। আমাদের অনেক জায়গায় পাকিস্তানিরা যেতেই পারেনি। যেমন কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারী ও সিলেটের কিছু এলাকায় পাকিস্তানি সেনারা যেতেই পারেনি।

ইফতেখার মাহমুদ : বাংলাদেশের মানুষের ধরন ও চরিত্রের সঙ্গে নদীর সম্পর্ক আছে কি না?

আইনুন নিশাত : হ্যাঁ, এটি ঠিক। আমাদের ছোটবেলায় সাঁতরে নদী পার হওয়া

সাহসিকতার ব্যাপার ছিল। কিশোর-তরুণদের মধ্যে বাজি ধরে নদী পার হওয়ার চর্চা ছিল। ডুব দিয়ে মাছ ধরা, গাছের মগডালে উঠে পড়া—এই সবকিছু বেশ সাহসিকতার ব্যাপার। প্রাকৃতিক কারণে সাহসী হয়ে ওঠা এখানকার মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে আরও সাহসী করে তোলে। পাকিস্তানের বেতনভুক্ত সৈন্যদের যুদ্ধ আর আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন বাজি রাখা যুদ্ধ দুটি দুই রকমের ব্যাপার।

ইফতেখার মাহমুদ : কচুরিপানা তো বাংলাদেশের নদীর পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মুক্তিযুদ্ধে এই জলজ উদ্ভিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলা হয়।

আইনুন নিশাত : বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রতিবেশ এবং প্রকৃতির প্রতিটি অংশ এখানকার মানুষের জীবন-জীবিকার অংশ। কচুরিপানা দেশের নদ-নদীগুলোর জন্য একই সঙ্গে বিপদ ও সম্পদ। এটি নদীর সামগ্রিক প্রতিবেশব্যবস্থার মধ্যে সমস্যা তৈরি করত। যুদ্ধের সময় কচুরিপানার কারণে পাকিস্তানি নৌযান গ্রামের ভেতরে ঢুকতে বাধা পেত। আবার এটা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাকৃতিক আবডাল। প্রতিটি গ্রামে অনেক পুকুর ছিল আর তাতে কচুরিপানা থাকত। নদী, খাল, বিলগুলোতেও প্রচুর কচুরিপানা থাকত। দেশের প্রতিটি গ্রামীণ জনপদে ঝোপঝাড়ও বেশি ছিল। কচুরিপানার সুবিধা হচ্ছে গ্রামবাসী ও মুক্তিযোদ্ধারা এর নিচ দিয়ে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় পালাতে পারত। দীর্ঘ সময় কচুরিপানার নিচে লুকিয়ে থাকতে পারত।

ইফতেখার মাহমুদ : প্রায় এক কোটি শরণার্থী বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। এত মানুষ কীভাবে গেল? তাদের প্রস্থানের পথ কী ছিল? এ ক্ষেত্রে নদীর কী ভূমিকা?

আইনুন নিশাত : এপ্রিল-মে মাস থেকে গ্রামগুলোতে হামলা শুরু হওয়ার পর মানুষ প্রথমে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য পাশের গ্রাম ও দুর্গম এলাকাগুলোতে পালায়। শহরের মানুষ গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কারণ, শহরের চেয়ে গ্রাম অনেক বেশি নিরাপদ ছিল। মাটির পথ, জলাশয় এবং ঝোপঝাড়ের কারণে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা অনেক বেশি ছিল। তবে জুন-জুলাই থেকে মানুষ ভারতের বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় নেওয়া শুরু করে। শরণার্থীজীবন শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে যারা গিয়েছিল, তাদের বড় অংশ সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ ও হিন্দু সমাজের। কারণ, পাকিস্তানিরা হিন্দুদের বেশি পরিমাণে নিশানা করে হত্যা করত। ফলে তারা বেশি পালিয়েছিল। তাদের একটি অংশ যশোর রোড দিয়ে পেট্রাপোল দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। আরেকটি অংশ পানিপথ দিয়ে, সাতক্ষীরা-খুলনা-

বরিশালের নদী-খাল দিয়ে ভারতীয় সুন্দরবন এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে দেশভাগের সময়কার পূর্ব বাংলার অনেক মানুষ আগে থেকেই ছিল।

আমার গ্রামের বাড়ি খুলনার চুকনগরে। সেখানে একটি বিশাল স্কুল ছিল। এর সামনে বড় মাঠ ছিল। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে শরণার্থীরা সেখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর লোকেরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আগে থেকে খবর দিয়ে দেয়। সেই রাতে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের মতো ব্রাশফায়ার করে শরণার্থীদের হত্যা করা হয়। তাঁদের মধ্যে অনেক মুক্তিযোদ্ধাও ছিলেন। অনেকে প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ওই হত্যাকাণ্ডের সময় উপস্থিত থাকা একজনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। তখন তিনি কিশোর বয়সী। গুলি শুরু হওয়ার পর তিনি মায়ের হাত ধরে হুড়োহুড়ির মধ্যে পড়ে যান। এর মধ্যে উনি জ্ঞান হারান। এক দিন পর তিনি জ্ঞান ফিরে পেয়ে নিজেকে পাশের ভদ্রা নদীর অপর পাড়ে আবিষ্কার করেন। তার মানে, কেউ কোনোমতে নদী পার হতে পারলেই জীবন বাঁচাতে পারত। কারণ, পাকিস্তানি আর্মি কোনোভাবে নদী অতিক্রম করতে পারত না। তারা বড় নদীগুলোয় স্পিডবোট বা লঞ্চ দিয়ে যেত, কিন্তু তা-ও নদীর মাঝখান দিয়ে যেত। এর ফলে নদী-খাল অনেক মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে। চুকনগরের ওই শহীদেরা যদি আগে আগেই নদী পার হতে পারতেন, তাহলে বেঁচে যেতেন।

ইফতেখার মাহমুদ : নদী ও প্রকৃতির মতো গ্রামীণ মুক্তিযোদ্ধাদের ইতিহাসকে কীভাবে আমরা আনতে পারি?

আইনুন নিশাত : এখনো সময় আছে, যদি গ্রামভিত্তিক পরিসংখ্যান নেওয়া হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের বড় অংশ ছিল গ্রামের কৃষক। মুক্তিযুদ্ধের তালিকায় নিজের নাম লেখানো, সার্টিফিকেট নেওয়ার মতো বিষয়গুলো তারা কখনো ভাবেনি। অথচ তারাই মূল প্রতিরোধটি গড়ে তুলেছিল। আর তাদের সহায় হয়েছিল প্রকৃতি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত না হলে সেই ইতিহাস অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে।

ইফতেখার মাহমুদ : আপনাকে ধন্যবাদ।

আইনুন নিশাত : আপনাকেও ধন্যবাদ।

খাতি চিন্তা
শিল্প-দর্শন

ঈশ্বর দর্শন : ভাষার গর্ভগৃহ থেকে পরমতার দিকে

সাজ্জাদ শরিফ

শুরুতেই কমলকুমার মজুমদারের *অন্তর্জলী যাত্রা* উপন্যাসের উৎসর্গপত্রের কয়েকটি চরণে ঘুরে আসা যাক। কমলবাবু লিখেছেন :

> জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন।
>
> এই উক্তির মধ্যে যাঁহার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত,...যিনি মানুষকে, প্রাকৃতজনকে, আপনার জাগ্রত অবস্থার খানিক অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন—"মানুষ কি কম গা!"

'জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন', এমন উক্তির মধ্যে আর কার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হতে পারে! বাংলার হৃদয়ে বহুকাল ধরে সঞ্জীবিত এই ভাব আধ্যাত্মিক সাধক, কিংবা আরেকটু এগিয়ে বলতে পারি বিপ্লবী সন্ত, রামকৃষ্ণ পরমহংসের। তাঁকে, রামপ্রসাদ সেনসহ, *অন্তর্জলী যাত্রা* উৎসর্গ করেছিলেন কমলবাবু। রামকৃষ্ণের উক্তিটি অবশ্য ছিল আরও তীব্র। তিনি বলেছিলেন, 'মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ।' উক্তিটিতে রামকৃষ্ণের ধর্মবোধ আর মানববোধ অবিচ্ছিন্ন হয়ে আছে।

কমলবাবুর ভাষ্যে এই কথাগুলোর মানে ঠিক কী? দ্বিতীয় চরণ বা অনুচ্ছেদ থেকে কিছুটা মন্থরভাবে পাঠ করা যাক।

কমলবাবু প্রথমে বলছেন মানুষের কথা, যাদের উদ্দেশ করে উদ্ধৃতির প্রথম উক্তিটি রামকৃষ্ণ করেছেন। কিছুটা এগোলেই বোঝা যায়, কথাগুলো যে রামকৃষ্ণ নিছক মানুষকে উদ্দেশ করেই বলেছেন, তা নয়; মানুষই এখানে বরং বিষয়। 'মানুষ' শব্দটি লিখেই কমলবাবু ইতস্তত করছেন। তিনি যা বলতে চাইছেন, 'মানুষ' শব্দটিতে যেন তা ধরা যাচ্ছে না। তাই এর ঠিক পরপর দুটো কমার মাঝখানে তিনি নিয়ে এলেন আরও একটি শব্দ, 'প্রাকৃতজন'। মানুষের বিকল্প

হিসেবে নয়, মানুষের হয়ে ওঠার একটি অবস্থা বোঝাতে। শব্দটির ব্যুৎপত্তির বিচারে, প্রাকৃতজন কে? যে মানুষ প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত, এখনো যে প্রকৃতিতে লীন, যেনবা কেবলই এক জীবসত্তা—তার বেশি কিছু নয়; প্রকৃতির ভেতর থেকে যে এখনো জেগে ওঠেনি, মানুষ হিসেবে নিজের জাগ্রত অবস্থার পরিচয় পায়নি। জেগে ওঠার আগপর্যন্ত মানুষ প্রকৃতিরই অংশ, কেবলই প্রাকৃতজন। প্রকৃতি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যখন সে এগোতে শুরু করল, কমলবাবু বলছেন, সেটাই তার জাগ্রত অবস্থা। এই জাগ্রত অবস্থাতেই সে নিজের আত্মপরিচয় অর্জন করে, সে মানুষ হয়ে ওঠে। কারণ, তার মধ্যে এই প্রথম যেন পরমের আভাস মিলছে, তার ওপরে এসে পড়েছে উদ্বর্তনের আলোকরেখা। তার এই এগিয়ে যাওয়া এক অনন্তযাত্রার সূচনা—অজানা দিগন্তের ওপারে, নিজেকে ক্রমশ রূপায়ণ করে তোলার দিকে। আর প্রাকৃতজন থেকে মানুষের এই বিপুল যাত্রাই যেন ঈশ্বরযাত্রা, কমলবাবুর রামকৃষ্ণভাষ্যে। এই মানুষ কি তাহলে কোনোমতেই কম হতে পারে!

কিন্তু কমলকুমার মজুমদার তো ধর্মগ্রন্থ লিখতে বসেননি, বসেছেন উপন্যাসই লিখতে, সাহিত্য রচনায়। মানুষকে তিনি শোনাবেন মানুষেরই অসম্ভব এক জীবনের গল্প।

কথা হলো, মানুষের এই কল্পকথায় ঈশ্বরের কী কাজ? সে কথা খোলাসা করতে এবার এক জার্মান ভদ্রলোকের শরণাপন্ন হওয়া যাক। ভদ্রলোকের নাম গেয়র্গ ভিলহেল্‌ম ফ্রিডরিখ হেগেল। সাহিত্য আর শিল্পকলা নিয়ে হেগেলের নানা ভাবনা বিভিন্ন বইয়ে ছড়িয়ে আছে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভাবনা আছে তাঁর প্রায় প্রথম দিকের উল্লেখযোগ্য বই *দ্য ফেনোমেনোলজি অব স্পিরিট*-এ। তবে বিশদভাবে আছে *ইন্ট্রোডাকটরি লেকচার্স অন ইসথেটিকস* বইটিতে। এতে ধরা আছে হেগেলের শেষ বয়সের পরিপক্ব উপলব্ধি। বেঁচে থাকা অবস্থায় বইটি তিনি গুছিয়েও যেতে পারেননি। জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া বক্তৃতা আর টীকা-টিপ্পনীগুলো তাঁর মৃত্যুর পরে বই হিসেবে সম্পাদিত হয়ে বেরোয়।

লেকচার্স অন ইসথেটিকস বইয়ে হেগেল মানুষের সঙ্গে শিল্পসাহিত্যের সম্পর্ক বোঝার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলছেন, মানুষ যখন প্রকৃতির সন্তান, তখনো তার মনে কোনো ভাব জেগে ওঠেনি, তার মধ্যে পরমের ছায়াসম্পাত ঘটেনি। সে তখনো কেবলই তার শারীরিক বাসনার দাস। জগৎ তার কাছে কতগুলো বিচূর্ণ ইন্দ্রিয়ানুভূতির সমাহারমাত্র।

আদিম যুগের কোনো এক প্রাকৃতজন যখন হাতে চকখড়ি নিয়ে গুহার ভেতরে বাইসন আঁকল, তখন ইতিহাসে এক অসামান্য ঘটনার সূত্রপাত ঘটল। এই বাইসন আঁকার মধ্য দিয়েই মানুষ প্রথম জীবত্ব থেকে মুক্তি পেল মনুষ্যত্বে। মানুষ হয়ে সে উঠে দাঁড়াল, তার যাত্রা শুরু করল পরমের দিকে। ফারসি শব্দ ধার করে বললে, সে 'খোদ'কে চিনতে পারল 'খোদা'র দিকে পা বাড়ানোর পথে। এর আগপর্যন্ত নিজের জীবশরীর টিকিয়ে রাখার জন্য সে বাইসন শিকার করে খেয়েছে। এই শিকারিই শিল্পী হয়ে বাইসনটি আঁকার সময়ে হেগেল বলছেন, যুগপৎ দুটো বড় ঘটনা ঘটেছে। এত দিন তার যে ইন্দ্রিয়পর জীবন ছিল, বলা যায় প্রাণীর জীবন—যে কেবলই খায় আর প্রজনন করে—এই জীবসত্তার বাইরে অতিরিক্ত আরেকটি সত্তা জেগে উঠল তার মধ্যে। আগে যে বাইসন সে দেখত, সেটির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল খাদ্য আর খাদকের। গুহার ভেতরে আঁকা এই প্রথম একটি বাইসন এখন তার সামনে, যেটিকে সে খাবে না। এটি আর কোনো শিকারবস্তু নয়, তার ভাববস্তু।

হেগেল আরও বলতে চান, এই বাইসন আঁকার মধ্য দিয়ে অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও ঘটেছে। বাইসনটা যে আঁকছে, এর আগে সে বহু বাইসন দেখেছে। নানা আকারের, লিঙ্গের, বর্ণের। সেসব বাইসন দেখার অভিজ্ঞতায় যে তার মধ্যে বাইসনের একটি সাধারণ ধারণা গড়ে উঠেছে, ছবিটি তারও প্রমাণ। কারণ, সুনির্দিষ্ট কোনো বাইসন সে আঁকেনি। আঁকা বাইসনটিতে তার সেই সাধারণ ধারণার প্রক্ষেপ ঘটেছে। ছবিটি আঁকার মধ্য দিয়ে তাই উত্তরণ ঘটেছে তার বুদ্ধিবৃত্তিরও। এই শিল্পকর্ম প্রাকৃতজন আর মানুষের প্রথম ভেদের চিহ্ন। এখান থেকেই সে প্রকৃতির গর্ভ ছেড়ে বের হয়ে এল।

যাহোক, হেগেলের মূল কথা হচ্ছে, শিল্পে মানবচেতনা আকার পায়—প্রথমে একটা অবয়বগত রূপে, পরে ভাবগত রূপে। শিল্পকলা পরমকে পেশ করে চেতনা হিসেবে। মানুষের চেতনার মধ্যেই আবির্ভাব ঘটে পরমতার। হেগেলের বিবেচনায় এটিই ভাব।

লক্ষ করার বিষয়, পরমের দিকে ধাবমান মানবচেতনার যে রূপায়ণের মধ্য দিয়ে প্রাকৃতজন মানুষ হয়ে উঠছে, সেটা ঘটছে ভাষায়—এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে চিত্রকলার ভাষায়। আবার যে ভাষা সে রচনা করছে, তারই মধ্যে সে একাধারে মানুষ হিসেবে হয়েও উঠছে।

হেগেলের মতে, পরম ভাবের প্রকাশের পথ তিনটি—শিল্পসাহিত্য, ধর্ম, দর্শন। প্রকৃতির রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসার পর এই তিনটি পথের খোঁজ মানুষ

মোটামুটি পরপর পেয়েছে, যদিও একেবারে সরলরেখায় নয়। তবে শিল্প আর সাহিত্যই যে আদিতম, তাতে তাঁর সন্দেহ নেই। তাই মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার ইতিহাসে শিল্পসাহিত্যের ভূমিকা অনন্য। ভাষার পরিধি আর সক্ষমতা যত বাড়ছে, মানুষও ততই তার মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠছে—হেগেল বলবেন, মানবচেতনা ক্রমশ পরমের দিকে এগোচ্ছে—শিল্প ও সাহিত্যবস্তুর মধ্যে আমরা তার প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি।

দর্শনের খাঁচায় ধরা পরমের দিকে এই যাত্রা মানুষেরই যাত্রা, তার অফুরন্ত সম্ভাবনার দিকে। জার্মান দার্শনিক মার্টিন হাইডেগারের কাছ থেকে ধার করে একটু আগ বাড়িয়ে আমরা বলতে পারি, এটি ভাষার দিকেও মানুষের যাত্রা। কারণ, মানুষের বাইরে যেমন ভাষা নেই, আবার ভাষার বাইরেও মানুষ নেই। ভাষাসমুদ্রের গভীরেই মানুষের জন্ম, প্রকাশ ও বিকাশ।

বিপর্যস্ত ভাষা

ভাষা আমাদের সবকিছু প্রকাশেরই বাহন। সুনির্দিষ্ট একটি গন্তব্যে যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে পারলেই বাহনের দায়িত্ব শেষ। ভাষা আমাদের পৌঁছে দেয় অর্থের কাছে। কিন্তু ভাষা সাহিত্য ও শিল্পকলার বাহনমাত্র নয়। সাহিত্যে আর শিল্পে আমরা দেখি বরং ভাষার এক বিপর্যয়। সাধারণভাবে যেভাবে আমরা ভাষা ব্যবহার করি, সেই ব্যবহার্যতায় সাহিত্য বা শিল্প আমাদের কাছে অর্থহীন ঠেকে। কারণ, ভাষাই এখানে ভাববস্তু হয়ে ওঠে, ভাষাই এখানে গন্তব্য।

ভাষার এই বিপর্যয় ছাড়া শিল্প বা সাহিত্যবস্তুর পক্ষে কিছু ব্যক্ত করাই অসম্ভব। লিখনে কী ঘটে এই ভাষার, সে কথা বিশদ করার আগে অন্য একটি প্রসঙ্গ ছুঁয়ে আসা যাক।

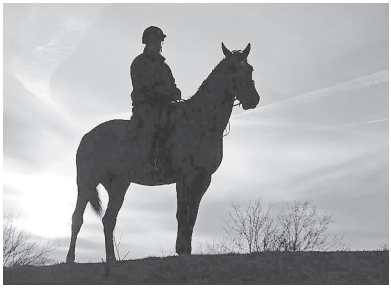

চিত্র ১ : অশ্বারোহী। চোখ যা দেখছে, অভিজ্ঞতা বা বুদ্ধি বুঝে নিচ্ছে তার বিপরীত

যদি প্রশ্ন করি, সূর্যের বিচ্ছুরিত আলোর বিপরীতে চিত্র-১-এ কিসের ছবি দেখা যাচ্ছে? বিন্দুমাত্র না ভেবেই যে কেউ বলে দিতে পারবেন, এটি একটি অশ্বারোহীর ছবি। অথচ এই ছবিতে অশ্ব বা আরোহী কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। সূর্যকিরণের প্রখর ঝলকে গাঢ় কালো রঙে ঘোড়া আর আরোহী একাকার হয়ে আছে।

দৃশ্যমান শুধু তাদের একাকার দুই শরীরের বহির্রেখাটুকু। তারপরও আমরা এক লহমায় বুঝে নিতে পেরেছি, এটি ঘোড়ার পিঠে চড়া এক সওয়ারির ছবি।

অর্ধসহস্রাব্দ আগে মেসো-আমেরিকানদের কিন্তু হয়েছিল এর ঠিক উল্টো অভিজ্ঞতা। স্পেনের কনকিস্তাদোররা যখন ঘোড়ায় চড়ে ওদের জমি আর সভ্যতা লুট ও দখল করতে গিয়েছিল, বিস্ময়ে তখন ওরা হতবাক। তাদের অভিজ্ঞতায় ঘোড়া ছিল না। তাই ঘোড়া আর তার পিঠে মানুষ স্পষ্ট দেখতে পেয়েও দুটিকে মিলিয়ে তারা ভেবেছিল, এ নিশ্চয়ই নতুন কোনো প্রাণী। তাদের মনে ঘোড়া আর মানুষ একাকার হয়ে গিয়েছিল।

এ এক পরমাশ্চর্য বিপরীত অভিজ্ঞতা। আমাদের চোখ বলছে এক, মন বলছে আর। চোখের দেখার বাইরে মেসো-আমেরিকানদের মনে আর কোনো সত্য নেই। এই বিপরীত দুই অভিজ্ঞতার পার্থক্য রচনা করে দিচ্ছে আমাদের অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্চিত জ্ঞান। এই ছবিটিতে চোখ আমাদের দেখাচ্ছে একটিই কোনো প্রাণী বা বস্তু। অথচ বুদ্ধি তার ছুরি দিয়ে একাকার ছায়াপুঞ্জ থেকে ঘোড়া আর মানুষটিকে কেটে পৃথক করে দিচ্ছে। যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান ধারালো ছুরির মতো, সবকিছু বিশ্লিষ্ট করে। বিশ্লেষণই তার ধর্ম।

অথচ আমরা যখন পৃথিবীর দিকে তাকাই, কোনো দৃশ্যপট দেখি, অক্ষিপট আমাদের সবকিছু একাকার করেই দেখায়। আমরা একীভূত অবস্থায় সবকিছু গ্রন্থিত দেখি। কিন্তু যুক্তিশীল মন প্রতিটি বস্তুর চারপাশে দাগ কেটে কেটে তাদের আলাদা করে এনে যার যার বোধগম্য ছকে বসিয়ে দেয়। তাতেই আমরা বুঝতে পারি, ওই বৃত্তাকার জিনিসটা সূর্য, মাথা উঁচু করে থাকা লম্বাটে বস্তুটা তালগাছ, চলমান চৌকো আদলটা আসলে গাড়ি। কোনো কিছুকে বুঝতে চাইলে দাগ দিয়ে বিশ্লিষ্ট করে নিতে হয়।

এই বিশ্লেষণপ্রক্রিয়া আমাদের বুদ্ধিসঞ্জাত ছকের সঙ্গে প্রতিটি জিনিস মিলিয়ে মিলিয়ে বুঝিয়ে দেয়। এই মিলিয়ে নেওয়ার পথে দেখার উপলব্ধির নবীনতা কর্পূরের মতো উবে যায়। এই যে মানুষ চলছে, পৃথিবী বিপুলা হয়ে উঠছে, অবিশ্রাম রূপায়ণ ঘটে চলেছে চেতনার—বাঁধা ছকে তা আর ধরা পড়ে না। এখানেই আসে সাহিত্য আর শিল্পকলার ভূমিকা। আমাদের জীবনে সবকিছুকে ভাগ ভাগ করে রাখা যত সীমানারেখা, শিল্প আর সাহিত্য সেসব মুছে দেয়। তাদের তুলে ধরে অবিচ্ছিন্ন এক সমগ্রে। তাতে চেনা জীবন-জগৎ হঠাৎ অচেনা, অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর হয়ে ওঠে। একটু থমকে দাঁড়িয়ে নিজের সঙ্গে নিজেকে নতুন করে আমাদের বোঝাপড়া করে নিতে হয়। শিল্পসাহিত্যের

পথ এখানে উল্টো। এর পথ সংশ্লেষের। বুদ্ধির ছুরিতে পৃথক পৃথক হয়ে থাকা উপাদান শিল্পসাহিত্যের সংশ্লেষণে এক অঙ্গাঙ্গি ও পূর্ণাঙ্গ চিত্রে সংগতি পায়।

আমাদের চিরচেনা জগৎই শুধু নয়, আমাদের চেনা ভাষার চারপাশের সীমানারেখাও সে কারণে সাহিত্যে বা শিল্পে মুছে যায়। অজ্ঞেয়কে ধরার জন্য কবি বা শিল্পী গ্রাহ্যতার সীমা যেভাবে পার হয়ে যান, তাতে ভাষা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই বিপর্যয় ঘটে নানা পথে।

এই বিপর্যয়ের চেহারা বুঝে নেওয়ার জন্য কবিতা দিয়ে শুরু করা যাক। কিছু কবিতার অংশবিশেষ আমরা পড়ে নিই।

অমিয় চক্রবর্তীর 'আফ্রিকা স্বাক্ষর' :

> সর্ব অক্ষরের সারি উঁচু নিচু কালো সাদা,
> রক্তাম্বর মরুভাষা, পাশে অন্তর্হিত
> যে-মুদ্রণ নীলান্তের, সব ফিরে দেব
> নির্বাক অসংখ্য কাব্য।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'জন্ম এবং পুরুষ' :

> মরা উরু মলা মাছ কুঁচ সাপ বাঁকা নাল ডাঁটি
> বুকের বনাত খাদ মুচিডাব দারুণ গরম
> শক্ত লোহা শক্ত দুধ একাকার বিষাক্ত বলক
> কে চুয়ালে মুখ নেবে। শয়তান ও অসম্ভব চূড়া
> অচেনা সহসা, ফোলা, ফোলা সব ফোলা অন্ধকার।

মৃদুল দাশগুপ্তের 'প্রকৃত পরিচয়' :

> তোমাকে জানাই স্বপ্ন, বসেছি শরীর নিয়ে হাতেপায়ে—এই অহংকারে।
> মাংসের পলাশ ছুড়ে প্রতিষ্ঠা বাঁচায় ওরা, চেতনা হারাও, কিন্তু তাও তো সুশিক্ষা।

কী বলছে কবিতার এই অংশগুলো? কোনো বাক্যের ভেতরে বিভিন্ন শব্দের মধ্যে যে সম্পর্ক আমরা দেখে থাকি, এই উদ্ধৃতিগুলোতে সে-সম্পর্ক লুপ্ত হয়ে গেছে। ব্যাকরণের কঠোর গণ্ডিতে কবিতা আর এঁটে বসতে পারছে না। যেভাবে শব্দের সঙ্গে শব্দের অন্বয় গড়ে বাক্য থেকে আমরা অর্থ বের করে আনি, এই কবিতাগুলোর মধ্যে তার সব নিয়ম ভেঙে পড়েছে। এই কবিতাগুলোর কোনো সরলার্থ ভাষার সাধারণ অভ্যস্ততায় অন্তত আর হতে পারে না। ওপরের উদাহরণগুলো হয়তো চূড়ান্ত মাত্রার, কিন্তু নানা তারতম্যে ভাষার এই শৃঙ্খলা ভেঙে পড়া কবিতার খুব চেনা একটি লক্ষণ।

কবিতার আরেক লক্ষণ ভাষার ও অভিজ্ঞতার যুক্তিসীমার লঙ্ঘন। কয়েকটি কবিতার চরণ পড়লে এই অভিজ্ঞতা আমাদের হবে।

জীবনানন্দ দাশের কবিতা 'হরিণেরা' :

বাতাস ঝাড়িছে ডানা, হীরা ঝরে হরিণের চোখে—
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর হীরার আলোকে।

আল মাহমুদের 'ক্ষমতা যখন কাঁদে' :

ক্ষমতা যখন কাঁদে
দাঁড়ানো দালান-কোঠা গলে যায়
ইট ও লোহার সন্ধি নড়ে গিয়ে
আঠা হয়, জল
শিল্পীর কর্তিত কান ইঁদুরেরা ফেলে যায়
কবির খাতায়। আর
প্রায়ান্ধ কবির মতো আমি
তামাক-কৌটোর খোঁজে হাতড়ে হাতড়ে তুলে আনি
সদ্যকাটা ভ্যানগগের কান

জয় গোস্বামীর 'চিৎসাঁতার' :

মা সমুদ্র, ভেসে আছি, ও মমতাময় অম্লধারা, নগ্নে তোর
ভেসে আছি যেন সূর্যকাল থেকে, তুলেছ বিপুল স্তম্ভজল, উঠে যাই
লাঠি লাঠি উঠে যাই, দণ্ড দণ্ড, উঠে যাই। মেঘ থেকে ধরি ইলেকট্রিক
খাই খাই ইলেকট্রিক, কী আস্বাদ হাহা স্বাদ অহো সহোদরা
আমি ওয়াক্ তুলছি আমি গলা থেকে বুক থেকে আপ্রাণ ঢেলে দিচ্ছি এই
বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ দ্রাক্ষা ঝলসিত রুপোলি তরল কী গরম।

এসব কবিতায় আমাদের অভিজ্ঞতার জগতের বিলয় ঘটেছে, কখনো কখনো ভাষার অভিজ্ঞতার সঙ্গে হাত মিলিয়েই।

আবার কবি অনেক সময় সম্ভাব্যতার সীমাও ছাপিয়ে চলে যান। 'মোর প্রিয়া হবে এসো রানী, দেব খোঁপায় তারার ফুল', যখন লেখেন কাজী নজরুল ইসলাম, আমরা দেখি এ এক অসম্ভব প্রস্তাব। আকাশ থেকে নক্ষত্র পেড়ে এনে প্রিয়ার খোঁপায় গুঁজে দেওয়া তো কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

ভাষার সংস্থান, বাক্যের ব্যবস্থাপনা, অন্বয়ের সম্পর্ক, শব্দের বাচ্যার্থ মুচড়ে, ভেঙে, গুঁড়িয়ে দিয়ে কবিরা কবিতাকে সম্ভাব্যতার বাইরে নিয়ে যান। ভাষার সেই দশার মধ্যে আমাদের চেনা অভিজ্ঞতার জগৎও আগাগোড়া অচেনা হয়ে ওঠে।

চোখের দেখা, মনের বোঝা

চিত্রকলার ভাষাও চোখের দেখা, অভিজ্ঞতা বা বুদ্ধির দেখা এবং মনের দেখার মধ্যে এই টানাপোড়েন তৈরি করে। চিত্রকলায় ভাষা নিজেও কখনো কখনো

এতটাই অমোঘ হয়ে ওঠে যে তাকে মনে হয় বাস্তবের মতো নির্জলা। যেমন রেখা চিত্রকলার একটি কল্পিত ও কৃত্রিম উপাদান। রেখা দিয়ে কোনো দক্ষ শিল্পী আমাদের প্রতিকৃতি রচনা করলে সেটিকে নিজেদের চেহারা হিসেবে আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে গ্রহণ করি। অথচ আমাদের কারও চেহারা রেখা দিয়ে গড়া নয়। কল্পনা ও বাস্তবের এই স্থানচ্যুতি অজান্তেই আমাদের মনে ঘটে। কিন্তু শিল্পীরা আরও কয়েক পা এগিয়ে যান।

আমাদের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা আছে। ধরা যাক, আমাদের চোখের দৃষ্টির সীমানার ভেতর কোনো একটি বস্তুর ঠিক সামনে আরেকটি বস্তু রাখা হলে সেটির পেছনে থাকা বস্তুকে আমরা আর দেখতে পাই না। কিংবা কোনো একজন মানুষ পেছন ফিরলে তার মুখ আমাদের গোচরের বাইরে চলে যায়। যা স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখা যায় না বা অন্তরালে থেকে যায়, শিল্পীর ভাষা চিত্রকর্মে সেটিকে দৃষ্টিগোচর করে তুলতে পারে।

চিত্র ২ : 'অ্যাকর্ডিয়ান বাদক', শিল্পী : মুর্তজা বশীর

মুর্তজা বশীরের 'অ্যাকর্ডিয়ান বাদক' শিল্পকর্মটিতে (চিত্র-২) একটি বৃক্ষশোভিত পাহাড়ি পটভূমিতে তিনটি চরিত্রকে দেখা যাচ্ছে। একটি তরুণ অ্যাকর্ডিয়ান বাজাচ্ছে। এক নগ্নিকা শুয়ে এবং আরেক নগ্নিকা গাছের ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে সে বাদন শুনছে। এই চিত্রকর্মে কোনো চরিত্র বা বস্তু তাদের উপস্থিতি দিয়ে কাউকে আড়াল করছে না। বাদক, দুই নগ্নিকা, পাহাড় ও গাছ—সবার ভেতর দিয়ে সবাইকে দেখা যাচ্ছে। শিল্পী সবার মধ্যে স্বচ্ছতা আরোপ করে ক্যানভাসের আয়তনের মধ্যে পুরো দৃশ্যপটের সবকিছু দর্শকের জন্য দৃষ্টিগোচর করেছেন। বাস্তবে যা অসাধ্য, এই শিল্পকর্মে সেটি সম্ভবপর হয়েছে শিল্পীর উদ্ভাবিত ভাষার শক্তিতে।

১৯৩৮ সালে বান্ধবী মারি তেরেসের একটি প্রোফাইল বা পার্শ্বপ্রতিকৃতি এঁকেছিলেন (চিত্র-৩) পাবলো পিকাসো। পার্শ্বপ্রতিকৃতিতে স্বাভাবিকভাবেই পাশ

চিত্র-৩ : মারি তেরেসের প্রতিকৃতি (১৯৩৮), শিল্পী : পাবলো পিকাসো

থেকে চেহারার অর্ধাংশ দৃষ্টির গোচরে থাকে, বাকি অর্ধাংশ চলে যায় আড়ালে। প্রতিকৃতির দৃশ্যমান অংশে একটি চোখ আমরা দেখতে পাই, অন্যটি দেখা যায় না। নাকেরও একটি পাশই কেবল দৃশ্যগোচর থাকে। কিন্তু এ ছবিতে মারি তেরেসের আড়ালে থাকা চোখটিকে দৃশ্যমান চোখের পাশে ঘুরিয়ে পিকাসোকে উপস্থাপন করতে দেখি। নাকের অন্তরালে থাকা অংশটিও একইভাবে উপস্থাপিত হয়। বিশ শতকের শুরুতে কিউবিজম বা ঘনবাদ নামে এক শিল্প আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই নতুন চিত্রভাষার প্রবর্তন ঘটেছিল। এককথায় বললে, কোনো বিষয়কে একটির বদলে বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা একটি সমাপতনে শিল্পকর্মে উপস্থাপন করা ছিল এর লক্ষ্য। শিল্পীদের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের ইন্দ্রিয়ের পরিধির বিস্তার ঘটানো।

জীবনের অভিঘাতে শিল্পীর মনে যে তরঙ্গ ওঠে, সেটিকে চাক্ষুষ করার জন্য শিল্পকর্মে চাক্ষুষ তাঁকে অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে যেতে হয়। চোখের দেখায় যেসব চিহ্নের মধ্যস্থতায় বাস্তবকে তিনি নিজের কাছে বোধগম্য করেন এবং সবার অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার শরিক হন, শিল্পকর্মে নিছক সেই অক্ষিপটের অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে যেতে গিয়ে সেসব চিহ্নের প্রতিসরণ ঘটে। চেনা ভাষা অচিন দেশে প্রবেশ করে। আমাদের দেখার অভ্যস্ত অভিজ্ঞতা তখন টলে যায়। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার শিল্পীরা বহু যুগ থেকে শিল্পের এই ভাষা ব্যবহার করে এসেছেন। যেমন প্রাচীন মিসরের শিল্পীরা যখন মুখের প্রোফাইল বা পার্শ্বপ্রতিকৃতি আঁকতেন, তাতে চোখটি দেখতে হতো সামনাসামনি দেখা চোখের মতো।

তবে চোখ/মন, দৃষ্টি/উপলব্ধি এবং প্রজ্ঞা/ স্বজ্ঞার টানাপোড়েন, স্থানবদল ও বিচ্যুতিকে সবচেয়ে বড় পরীক্ষার সামনে ফেলেছেন সম্ভবত স্পেনের সপ্তদশ শতকের চিত্রকর দিয়েগো ভেলাস্কেথ এবং বিশ শতকের বেলজিয়ান পরাবাস্তববাদী শিল্পী রেনে মাগ্রিৎ।

চিত্র ৪ 'লাস মেনিনাস', শিল্পী : দিয়েগো ভেলাস্কেথ

লাস মেনিনাস (চিত্র-৪) শিরোনামের ছবিটি ভেলাস্কেথ এঁকেছিলেন ১৬৫৬ সালে। একই শতকের শেষ দিকে, ১৬৯২ সালেই, ইতালির বারোক শিল্পী লুকা জিওর্দানো ছবিটিকে চিহ্নিত করেছিলেন 'চিত্রকলার ধর্মতত্ত্ব' বলে। পরের শতকগুলোতে রহস্যময় এই ছবি নিয়ে বিচিত্র ভাষ্য রচনার হিড়িক পড়ে যায়। প্রভাবশালী ফরাসি ভাবুক মিশেল ফুকো তাঁর *দ্য অর্ডার অব থিংস* বইয়ের প্রথম পরিচ্ছেদজুড়ে *লাস মেনিনাস* নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তবে তাঁর আলোচনার বিষয় কর্তা ও বিষয়ের জটিল সম্পর্ক এবং প্রতিনিধিত্বের বৈশিষ্ট্য। সেসব এ লেখার প্রসঙ্গ নয়।

ভেলাস্কেথের ছবিটিতে চরিত্র অনেক। পরিপ্রেক্ষিত, বিন্যাস আর চরিত্রগুলোর অবস্থানের কারণে বাঁ দিক থেকে তৃতীয় চরিত্র—রাজকুমারী ইনফান্তা মার্গারেৎ তেরেসা—ছবির কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে প্রথমে দৃষ্টি কেড়ে নেয়। দুজন পরিচারিকা তার সেবায় ন্যস্ত। মানুষ, কুকুরসহ আরও বেশ কয়েকটি চরিত্র তাকে ঘিরে আছে। এর মধ্যে দুটো চরিত্র আলাদা। ঘরের আয়তাকার দরজার ওপারে, বাইরে, একটি চরিত্র সিঁড়ির দুটি ধাপে পা দিয়ে দাঁড়ানো। আরেকজন ছবির একেবারে বাঁ প্রান্তে—ইনি স্বয়ং শিল্পী দিয়েগো ভেলাস্কেথ, তিনি একটি চিত্রকর্ম রচনার মাঝপথে রয়েছেন। যে চিত্রকর্মটি আঁকছেন, সেটি দর্শকের দিকে পেছন ফিরিয়ে রাখা। এ পর্যন্ত ছবির বিষয় স্পষ্ট।

ছবির কিছু চরিত্র নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করছে। কিন্তু বেশ কিছু চরিত্র তাকিয়ে আছে ক্যানভাসের বাইরে। সবার দৃষ্টি ক্যানভাসের বাইরে একই বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে—দর্শক যে অবস্থানে দাঁড়িয়ে এ ছবিটি দেখছে, একেবারে সেখানে। ঘরের বাইরে সিঁড়ির ওপরে দাঁড়ানো লোকটিরও তা-ই। সবচাইতে স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শিল্পী ভেলাস্কেথের। তাঁর দৃষ্টি অস্বস্তি জাগায়। কারণ,

ছবির দর্শকের সঙ্গে তাঁর রীতিমতো চোখাচোখি হচ্ছে। একাধিক চরিত্রের এই মিলিত দৃষ্টির কারণে অস্বস্তি এবার গভীরতর হয় দর্শকের মনে। তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে দর্শক উপলব্ধি করতে পারেন, ছবির আরও কিছু বিষয় ক্যানভাসে উপস্থিত নেই; আছে ক্যানভাসের পরিসরের বাইরে—ক্যানভাসের ঠিক মুখোমুখি, দর্শকেরই অবস্থানে। ঘরটির পেছনের দেয়ালে ঝোলানো দর্পণে তাঁদের প্রতিবিম্ব থেকে ধরা পড়ে ক্যানভাসটির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সস্ত্রীক স্পেনের রাজা চতুর্থ ফিলিপ।

এবার ছবিটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি পাল্টে যায়। ছবিটিকে আমরা নতুন করে দেখি। বলতে পারি, ছবিটি আমাদের দেখার দৃষ্টিকে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার বাইরে নিয়ে যায়। এ ছবি এখন আর ক্যানভাসের ভেতরে সীমিত নেই। ক্যানভাসের বাইরেও ছবিটি তার পরিসর রচনা করেছে। ছবির সেই বাইরের পরিসরে দাঁড়িয়ে আছেন রাজা চতুর্থ ফিলিপ ও তাঁর স্ত্রী। ক্যানভাসের ভেতরে আর বাইরে একটি নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ছবিতে গরহাজির রাজা-রানিও এখন ছবির বিষয়।

চিত্র ৫ : 'দ্য হিউম্যান কন্ডিশন
শিল্পী : রেনে মাগ্রিৎ

শুধু বিষয় নয়, সম্ভবত এ ছবির মূল কর্তাও। আর দর্শকও ভেলাস্কেথের আঁকা *লাস মেনিনাস* ছবিটি দেখছে রাজা-রানিরই দৃষ্টিকোণ থেকে। আর ক্যানভাসের ভেতরে থেকে ভেলাস্কেথ আঁকছেন দর্শকের অবস্থানে থাকা রাজ-দম্পতিরই প্রতিকৃতি। (দর্শকেরও কি?) এখানে ছবিতে উপস্থিত ও অনুপস্থিত চরিত্র, শিল্পী এবং দর্শকের অবস্থান ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে যায়। ছবিটি আমাদের অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত করে নিছক চোখের দেখার বাইরে।

আমরা রেনে মাগ্রিতের ১৯৩৩ সালে আঁকা *দ্য হিউম্যান কন্ডিশন* (চিত্র-৫) ছবিটিও একবার দেখে নিই।

দৃশ্যের পুরোভূমি একটি ঘর। প্রথম দেখায় হঠাৎ মনে হয় ঘরের অন্দর থেকে পর্দাখোলা জানালার বাইরে আছে কেবল একটি নিসর্গদৃশ্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই সতর্কভাবে ঘরের ভেতরে ইজেলের তিনটি পায়া এবং ফ্রেমে বাঁধানো

ক্যানভাসের প্রান্ত নজরে এলে বোঝা যায়, মাগ্রিৎ নিসর্গদৃশ্যের ওপরে চোখকে প্রতারিত করে একটি চিত্রকলা প্রতিস্থাপন করেছেন। প্রতিস্থাপিত এই চিত্রকলার বিষয়বস্তুও বাইরের সেই নিসর্গদৃশ্যই। হাতে আঁকা চিত্রকলা আর বাস্তব নিসর্গদৃশ্য এমন অঙ্গাঙ্গি একাকার হয়ে আছে যে তাদের আলাদা করে চেনা যায় না। প্রখর সূর্যালোকের বিপরীতে একাকার অশ্বারোহীর ছবি দেখে যা ঘটেছিল, এখানে তার উল্টো অভিজ্ঞতা হচ্ছে। চিত্রকলা আর নিসর্গদৃশ্যের বিষয়বস্তুর অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে মাগ্রিৎ এখানে চোখকে বশ এবং অবশ করেছেন।

দর্শক উপলব্ধি করেন, জানালার বাইরের একই বাস্তব নিসর্গদৃশ্য ইজেলে রাখা ক্যানভাসে আঁকা এবং একই সমানুপাতে দৃষ্টিসীমার ভেতরে থাকায় এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম ধাপে এই বিভ্রান্তি নিছক চোখের। চোখের দ্বিধা কাটাতে 'বাস্তব নিসর্গদৃশ্য' আর 'আঁকা চিত্রকলা'র সংশয় মোচন করার পরে তিনি টের পান, ছবিটি তাঁকে দ্বিতীয় আরেক বিভ্রান্তির শিকার করেছিল। 'আঁকা চিত্রকলা'কে আলাদা করতে গিয়ে 'বাস্তব নিসর্গদৃশ্য' হিসেবে যার বোঝাপড়া তিনি করছিলেন, সেটিও মোটেই বাস্তব নয়; ক্যানভাসের চিত্রকলাটির মতো আঁকাই বটে।

এই পুরো ব্যাপারটি ঘটার কারণ চিত্রকর্মটিতে চিত্রভাষার বিপর্যয়। দৃশ্যগত চিহ্নগুলো আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য পৃথিবীর যা কিছু প্রতিনিধিত্ব করে, রেনে মাগ্রিতের চিত্রকর্মে সেসবের স্থানচ্যুতি ঘটেছে, দৃশ্যভাষার চেনা অন্বয় এখানে লুপ্ত। এই ধাঁধার মর্মকথা নিয়েই যেনবা ছবিটির শিরোনাম 'মানুষি অবস্থা' বা 'দ্য হিউম্যান কন্ডিশন'।

চোখ/মন, দৃষ্টি/উপলব্ধি কিংবা প্রজ্ঞা/স্বজ্ঞার এই দ্বিবিধ টানাপোড়েনের উদাহরণের জন্য এবার একটি চলচ্চিত্রের শরণ নেওয়া যাক। আমরা ১৯৫০ সালে তৈরি জাপানি চলচ্চিত্রকার আকিরা কুরোসাওয়ার *রাশোমন* ছবিটির দিকে তাকাই।

এই ছবির ঘটনাস্থল তিনটি—একটি বন, গ্রামের এক সালিসি আদালত, আর রাজধানী কিয়োতোর প্রবেশ-তোরণ রাশোমন।

একজন সামুরাই যোদ্ধা, তার স্ত্রী আর এক ডাকাত—এই তিন চরিত্রের মধ্যে কিছু একটা ঘটেছে বনের ভেতরে। কী ঘটেছে আমরা জানি না। শুধু জানি, ঘটনার পরিণতিতে ছুরিকাহত হয়ে সামুরাই যোদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। গ্রামের সালিসি আদালতে সামুরাইয়ের স্ত্রী, ডাকাত এবং অশরীরী আত্মার সঙ্গে যোগাযোগে সক্ষম একজন মাধ্যমের সাহায্যে সামুরাইয়ের মুখে আমরা বনের

গভীরে ঘটে যাওয়া ঘটনার বর্ণনা শুনি। তিনটি গল্পই আলাদা ও পরস্পরবিরোধী, কিন্তু কোনো গল্পকেই আমরা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করতে পারি না। গ্রামের সালিসি আদালতে চলতে থাকে, যাকে আমরা বলতে পারি, সত্যের অনুসন্ধান।

তবু এ ছবির দর্শক হিসেবে বনে গভীরে ঘটে যাওয়া ঘটনা যেমন আমরা দেখতে পাইনি, সালিসি আদালতে এই তিনজনের সাক্ষ্যও আমাদের সরাসরি দেখানো হয় না। এই তিন জড়িত ব্যক্তির গল্পগুলো আমরা শুনি—বনের ঘটনা এবং আদালতের বয়ান থেকে দুই ধাপ দূরে—রাশোমন তোরণের নিচে, আদালতে উপস্থিত এক ভিক্ষু আর কাঠুরের দ্বিতীয় তরফা জবানিতে।

রাশোমন তোরণের নিচেও আছে বৃষ্টিতে আশ্রয় নেওয়া অন্য তিনটি চরিত্রের এক আলাপন। সেই কাঠুরে আর ভিক্ষুর সঙ্গে সাধারণ কোনো এক ব্যক্তির। সালিসি আদালতে যদি ঘটে থাকে সত্যের অনুসন্ধান, এই তিন চরিত্রের মধ্যে তাহলে অনুসন্ধান চলে কর্তব্যের। সত্য তো শেষ অব্দি আমলকীর মতো হাতের তালুতে ধরা দেয় না। ধরা যদি না-ই দেয়, তাহলে মানুষ হিসেবে আমার কর্তব্য কী? এই প্রশ্নের ইতি ঘটে ছয় সন্তানের বাবা দরিদ্র কাঠুরের কর্তব্যবোধে। তোরণের কাছে পরিত্যক্ত এক শিশুকে বুকে জড়িয়ে সে তার সংসারে ঠাঁই করে দেওয়ার জন্য নিয়ে যায়। সত্য নিয়ে আরণ্যক কুহেলির পরে জনপদের প্রবেশ-তোরণে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগেই এ ছবির পরিণতি। অথচ *রাশোমন* শুরুই হয়েছিল বনের ঘটনার আরেক প্রত্যক্ষদর্শী এই কাঠুরেরই হতাশাগ্রস্ত উক্তিতে, 'কিছু বুঝতে পারছি না। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

রাশোমন ছবির এই সূচনা-সংলাপ কাউকে কাউকে হয়তো মনে করিয়ে দেবে এর কাছাকাছি সময়ে, ১৯৫৩ সালে রচিত, স্যামুয়েল বেকেটের *ওয়েটিং ফর গোডো* নাটকটির কথা। মঞ্চে ঢোকার পর এই নাটকের চরিত্র এস্ট্রাগনের প্রথম সংলাপ ছিল, 'কিছুই করার নেই।' আর পুরো নাটকটি জুড়ে এই কিছু-না-করার মঞ্চায়ন চলতে থাকে।

আমরা বলছিলাম *রাশোমন* ছবির কথা। এ ছবিতে সত্যের বিচিত্র ছায়াতপের কুজ্ঝটিকায় দর্শককে নিয়ে যাওয়ার জন্য চলচ্ছবির ভাষার এক বিশেষ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন কুরোসাওয়া। যে বনে সামুরাইয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে—যে ঘটনার একেক ভাষ্য আমরা একেক চরিত্রের মুখে শুনতে পাব—সেই বনে কাঠুরে চলেছে। কিছুক্ষণ পরেই রহস্যময় সেই ঘটনার মুখোমুখি হবে দর্শক। বনে প্রবেশের এই দৃশ্যে ক্যামেরা নানা কোণ থেকে অনুসরণ করে চলেছে কাঠুরেকে। ডানে বাঁয়ে ওপরে নিচে সামনে পেছনে—বিচিত্র দৃষ্টিকোণ

থেকে পর্দায় হাজির করা হতে থাকে কাঠুরেকে। ক্যামেরার বিভিন্ন অবস্থানের কুড়িটি শটে ২ মিনিট ৩৯ সেকেন্ডের এই দৃশ্যধারায় একাত্ম দর্শকেরা ঘটনাটিকে এখন নানা প্রেক্ষাপট থেকে দেখার জন্য প্রস্তুত। তারা এখন এক বহুচারী সত্যের মুখোমুখি।

এরই একেবারে উল্টে ধরা এক চলচ্চিত্রভাষা প্রয়োগ করেছিলেন আন্দ্রেই তারকভস্কি, *নস্টালজিয়া* ছবিতে। এ ছবির মুখ্য চরিত্র আন্দ্রেই গর্চাকভ। একটি গবেষণার কাজে ইতালিতে এসে দোমেনিকো নামে এক খ্যাপাটে লোকের সঙ্গে তার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। দোমেনিকো মনে করে প্রলয় আসন্ন। ভয়ংকর সেই প্রলয় থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে স্থানীয় একটি খনিজ জলার এ পাশে একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে ও পাশে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করতে হবে। বারবার এই চেষ্টা করেও সে ব্যর্থ হয়। কেবলই নিভে যায় মোমবাতিটি। শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে দোমেনিকো গর্চাকভের হাতে তার মোমবাতি তুলে দিয়ে যায়। তার অসমাধেয় কর্তব্যটি যেন গর্চাকভ সমাপ্ত করে।

গর্চাকভ ভুলেই গিয়েছিল দোমেনিকোর এই মিনতির কথা। একদিন সে তার গাইড ইউজেনিয়ার কাছ থেকে রোমে দোমেনিকোর আত্মাহুতি দেওয়ার খবর পায়। গর্চাকভ আদৌ মোমবাতি হাতে জলা পাড়ি দিয়েছিল কি না, মৃত্যুর আগে দোমেনিকো সে কথা ইউজেনিয়ার কাছে জানতেও চেয়েছিল। গর্চাকভ দোমেনিকোর কথা না রাখলেও ইউজেনিয়াকে মিথ্যা করে বলে, তার অনুরোধ সে রেখেছে।

এবার অপরাধবোধে আক্রান্ত আন্দ্রেই গর্চাকভের দোমেনিকোর অনুরোধ রাখার পালা। জলাটির এক প্রান্তে দোমেনিকোর দেওয়া মোমবাতি জ্বালিয়ে অন্য প্রান্তে পাড়ি দেয় সে। ৯ মিনিট ৬ সেকেন্ডের একটি অবিচ্ছিন্ন দীর্ঘ শটে এই জলা পাড়ি দেওয়ার দৃশ্যের চিত্রায়ণ করেছেন তারকভস্কি। বাতাসের ঝাপটায় বারবার মোমবাতি নিভে যাওয়ায়, কয়েকবার চেষ্টার শেষে জলার অপর প্রান্তে গর্চাকভ জ্বলন্ত মোমবাতি স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

বাতাসে বারবার মোমবাতি নিভে যাওয়ায়—একটি শটের ক্লান্তিকর ও সুদীর্ঘ এই মিজঁসিনে—দর্শক দেখতে পায় সত্যিকারের সময়ে। তারা ধৈর্যের প্রান্তসীমায় গিয়ে পৌঁছায়। একপর্যায়ে মনে মনে এই দৃশ্যের পরিসমাপ্তি কামনা করে। নইলে তো এই দৃশ্যের সমাপ্তি নেই। এ অর্থে, জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে জলার অন্য পাড়ে পৌঁছাতে পারার মনস্কামনায় গর্চাকভের সঙ্গে তারাও একাত্ম হয়ে অংশ নিতে থাকে। চলচ্চিত্রভাষার অমোঘ প্রয়োগে গর্চাকভ আর দর্শকের

মধ্যে ভেদরেখা মুছে যায়।

আন্দ্রেই তারকভস্কি মনে করতেন, শিল্প হিসেবে চলচ্চিত্রের কাজ সময়কে মূর্তিময় করে তোলা। সময় একটি ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়। ইন্দ্রিয়ের সীমার মধ্যে একে আত্মস্থ করা যায় না। *নস্টালজিয়া* ছবিতে জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে উপর্যুপরি ব্যর্থ হতে হতে শেষে জলাভূমি পার হওয়ার দীর্ঘ সিকোয়েন্স একটিমাত্র শটে ধারণ করায় এর ভার অবহনযোগ্য হয়ে ওঠে। দীর্ঘ এই সময়ের প্রতিটি অনুপলকে দর্শক তার স্নায়ুর ওপর চাপ হিসেবে অনুভব করে। সময় তার কাছে হয়ে ওঠে ইন্দ্রিয়গম্য। সময়ের এই ভার থেকে সে নিস্তার চায়।

অব্যক্তের ভার

অন দ্য ওয়ে টু ল্যাঙ্গুয়েজ বইয়ে মার্টিন হাইডেগার বলেছিলেন :

> যদি এ কথা সত্য হয় যে ভাষার মধ্যেই মানুষ তার যথার্থ বসতি খুঁজে পেয়েছে—এ ব্যাপারে সে সচেতন থাকুক বা না থাকুক—তাহলে এমন একটা সর্বগ্রাসী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা যাই যে ভাষা আমাদের অস্তিত্বের অন্তরতম কেন্দ্রস্থলকে স্পর্শ করছে।

ভাষাই মানুষের সীমানা। মানুষের সমস্ত ভাব প্রকাশিত হয়েছে তার ভাষার সীমানার মধ্যেই। আবার ভাষার সীমানা চিরস্থিরও নয়। মানুষ ও বিশ্বের সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে মানুষের ভাবজগতে বুদ্‌বুদ উঠছে, তার ভাষায় নিরন্তর বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে, আর মানুষও তার মধ্য দিয়ে অবিরামভাবে হয়ে উঠছে। ভাষার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যাচ্ছে মানুষেরও সীমানা।

সাহিত্য বা শিল্পে যে আমরা বারবার ভাষার বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই, তার পেছনে আছে ভাষার এই জঙ্গমতা।

সাদা চোখে সরল মনে হচ্ছে, কবিতার এমন চরণেও লুকিয়ে থাকে এই বিপর্যয়। নিজের অজান্তে আমরা তা মেনেও নিই। 'বনলতা সেন' কবিতাটির কথাই ধরা যাক। কবিতার শুরুতেই জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন, 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে।' 'হাজার বছর' বলতে ঠিক কী বোঝায়, তার ধারণা আমাদের সবার মধ্যে আছে। ধারণাটি সবার মধ্যে অভিন্ন। সেই ধারণা থেকে জানি, কারও পক্ষে এক হাজার বছর অব্দি বেঁচে থাকা অসম্ভব। জীবনানন্দ দাশের ওপর যত মহত্ত্বই আমরা আরোপ করি না কেন, তাঁর পক্ষেও নয়। আমরা এ-ও জানি, জীবনানন্দ বেঁচেছিলেন মাত্র ৫৫ বছর। তাহলে কবিতায় তাঁর এই উক্তি নিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলি না কেন? কেন আমরা বলি না,

এই উক্তি আপাদমস্তক গাঁজাখুরি। প্রশ্ন তুলি না, কারণ আমরা মেনেই নিয়েছি যে কবিতার মধ্যে ভাষার বাচ্যার্থ উবে যায়, অন্তত লঘু হয়ে যায়।

শিল্পকলায় ভাষার এই বিপর্যয়, বিচ্যুতি বা অভিজ্ঞতার সীমানা ছাপিয়ে যাওয়া অনেকান্ত দশার কারণ কী?

ভাষাতেই সত্তার বসতি, বলেছিলেন হাইডেগার। আবার কোনো ভাব যে পর্যন্ত স্থানে ও কালে দানা বাঁধতে না পারছে, সে অব্দি ভাষায় তার পক্ষে প্রকাশিত হওয়াও সম্ভব নয়। লালন সাঁই অসামান্য অন্তর্দৃষ্টির বলে তাঁর এক গানে এই রহস্যের কথা বেঁধে বলেছিলেন, 'অনামক অচিনায় বাগিন্দ্রিয় না সম্ভবে।' যে ভাবের কোনো নাম ভাষাব্যবস্থায় নেই, ভাষার চকখড়ি দিয়ে যার গায়ে আমরা কোনো চিহ্ন এঁকে দিইনি, আমাদের বাক্-ইন্দ্রিয় বা ভাষা সেটিকে প্রকাশ করতে অপারগ।

তাহলে নতুন যে ভাবের অঙ্কুর জেগে উঠছে মানুষের পৃথিবীতে কারও কারও মনে—স্থান-কালে দানা বাঁধেনি বলে এখনো যার কোনো নাম বা চিহ্ন নেই—যার মধ্যে আমরা পাব সত্তার নতুনতর দশা, যার মধ্য দিয়ে মানুষ আরও কিছুটা এগিয়ে যাবে তার পরমতার দিকে, তা আত্মপ্রকাশ করবে কীভাবে? তাকে আমরা ধরব কোন পাত্রে? ভাষার কোন দশায়? নতুন মানুষকে তাহলে পাব কোন পথে?

যেসব দার্শনিক মানুষের হাজির থাকা বা হয়ে ওঠাকে বুঝতে চান—সন্ধান করেন সত্তা, ভাব আর ভাষার সম্পর্ক—তাদের ফিরে ফিরে আসতে দেখা যায় কবিতার দিকে। মার্টিন হাইডেগার এই অনুসন্ধানের পথে হ্যোল্ডারলিন, স্টেফান গেয়র্গ, গেয়র্গ ট্রাকল বা গটফ্রিড বেনের মতো কবিদের কবিতার রহস্যভরা চন্দ্রালোকিত পথে ছুটে বেড়ান। আর ফ্রিডরিখ নিৎশের লেখা গদ্য মুহুর্মুহু বাঁধ ভেঙে হয়ে উঠতে থাকে কবিতা। মানবচেতনা বা মানুষি ভাবের সন্ধানে কবিতার শরণ নেওয়ার বা কবিতাময় হয়ে ওঠার এই ঝোঁকের পেছনে গভীরতর কারণ তাহলে রয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

ভাষার অভূতপূর্ব যোগে ভাবের উদ্গমের সঙ্গে মানুষের সৃষ্টিময় প্রসার নিয়ে জীবনানন্দ দাশ 'কয়েকটি লাইন' কবিতায় লিখেছিলেন :

কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী—
আমি বহে আনি;
একদিন শুনেছ যে-সুর—
ফুরায়েছে,—পুরানো তা—কোনো এক নতুন-

কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি,—আমার মতন
আর নাই কেউ!
সৃষ্টির সিন্ধুর বুকে আমি এক ঢেউ
আজিকার;—শেষ মুহূর্তের
আমি এক;—সকলের পায়ের শব্দের
সুর গেছে অন্ধকারে থেমে;
তারপর আসিয়াছি নেমে
আমি;
আমার পায়ের শব্দ শোনো...

কবি বয়ে আনছেন সবার অজানিত এক বাণী, ভাষায় ব্যক্ত এক ভাব। পুরোনো যত ভাব, মানুষ তা দিয়ে এত দূর এসে পৌঁছেছে। এখন তো সেসব অন্ধকারে সমাহিত, যদি আর সামনে এগোনো না যায়। অথচ মানুষের রূপায়ণের তো শেষ নেই। আবার নতুন ভাব ছাড়া পরমতার দিকে তার পক্ষে এক পা এগোনোও সম্ভব নয়। নতুন উদ্গত ভাব ঢেউয়ের মতো যত সামান্যই হোক, তার আবির্ভাব মানুষের সিন্ধুসম সৃষ্টিশীলতার ভেতর থেকে। এর মধ্য দিয়েই মানুষের প্রসার। এই ভাবের পদধ্বনির দিকে আমাদের তাই কান পাততে হবে। একে আত্মস্থ করতে হবে।

মানবচেতনার যে নবতর দশা, তার মধ্যে 'অনামক' ও 'অচিনা' যে ভাবের উদয় হচ্ছে—এখনো যা স্থানকালে জমাট বাঁধেনি—বিদ্যমান ভাষা এখনো তার জন্য প্রস্তুত নয়, আবার ভাষার বাইরে তো তার প্রকাশের অন্য কোনো পথও নেই। এখানেই কবিতার অনন্য ভূমিকা।

মানুষের ভাষার একটা কাঠামো আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে। শতকের পর শতক ধরে কোটি কোটি মানুষের ব্যবহারে পলি জমে জমে গড়ে উঠেছে ভাষার ধ্বনি, চিহ্ন আর অর্থ উৎপাদনের ইতিহাস। নানা প্রকার মানুষের ওপর সর্বগ্রাসী বিস্তার, সুদৃঢ় কাঠামো এবং জাদুকরি বোধগম্যতা না থাকলে ভাষার যৌথ ব্যবহার্যতা অমোঘ হয়ে উঠতে পারত না। তার চেয়ে বড় কথা, ভাষা মানুষের গর্ভগৃহও হয়ে উঠত না।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, পুরোনো ভাষার ছকে নতুন ভাবের আশ্রয় কীভাবে সম্ভব হবে? কোনো তরল—ধরা যাক পানি—আমরা যে আকারের পাত্রে রাখব, পানি

সেই আকারের মধ্যেই বিলীন হবে। এটাই আমাদের অভিজ্ঞতা। গ্লাসে ঢাললে গ্লাসের গড়ন, কাপে রাখলে কাপের। পানির স্বরাট কোনো আকার কি আদৌ কোনোভাবে পাওয়া সম্ভব! ভাষার তৈরি হয়ে থাকা কাঠামোয় অচিহ্নিত সেই ভাবের পরিণতিও তো হবে এই অন্যতর আকারে সমর্পিত পানিরই মতো।

এই নবচেতনা বা উদিত ভাব তাহলে কোন রহস্যে ভাষায় দানা বাঁধে, একটা কল্পিত পরিস্থিতি দিয়ে তা বোঝার চেষ্টা করি। ধরা যাক, অনেক উঁচু একটি ভবন থেকে এক বালতি পানি উপুড় করে ঢেলে ফেলে দেওয়া হলো। এক বালতি পানি পড়ছে আর ক্রমাগত স্বাধীনভাবে তার আকার বদলে যাচ্ছে। অলৌকিক ক্ষমতার বলে কোনো একটি মুহূর্তে আমরা যদি পানিকে বলি, থামো। আর পতনশীল সে তরল সত্যি সত্যি যদি থেমে যায়, তাহলে আমরা পাব শূন্যে স্তব্ধ হয়ে থাকা পানির ঠিক সেই মুহূর্তেরই সার্বভৌম আকার।

নতুন ভাবের অঙ্কুরও স্বাধীনভাবে ভাষার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করার সময় সেটিকে ভেঙেচুরে নিজের স্বভাবে আত্মস্থ করে নেয়—যেন কোনো মৃৎশিল্পে রূপ পাওয়ার আগে শিল্পীর হাতের কাদার মতো নরম করে তোলে—সেটিকে গড়ে নেয় একেবারে নিজের মতো করে। ভাষার চেনা শৃঙ্খলা তাই তখন লোপ পায়, অন্বয় ছিটকে পড়ে, অভিধান থেকে শব্দ উৎসাদিত হয়ে যায়। ভাষার এই দশাকেই আমরা কবিতা বলে চিনি; কিংবা অন্যতর ভাষার ক্ষেত্রে গান, চিত্রকলা বা চলচ্চিত্র বলে।

কবিতা ভাষাভূত মানবচেতনা। অথবা বলতে পারি অব্যক্ত ভাবের ভাষায় ব্যক্ত রূপ। কবিতা বা শিল্পকলা অনির্বচনীয় ভাবকে গ্রাহ্য রূপ দিয়ে আমাদের ধরাছোঁয়ার পৃথিবীতে হাজির করে, আমাদের অবধারণের বস্তু করে তোলে। হেগেল যে বলেছিলেন সাহিত্যে বা শিল্পে মানবচেতনা অবয়বগত রূপ পায়, কবিতা তেমনই একটি রূপ। এরপর ভাবগত রূপ হিসেবে তার মধ্যে যে অব্যক্তের প্রকাশ ঘটে, সে তো কোমল কাদার মতো ভাষায় ধরে রাখা প্রশ্নসংকুল সংসারে জীবন ও জগতে লিপ্ত মানুষেরই পরমতার দিকে যাত্রার পদচিহ্ন।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং অগ্রবীজ *পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত দুই দিনব্যাপী কর্মশালায় ২২ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে দেওয়া বক্তৃতার লিখিত ভাষ্য*

● **সাজ্জাদ শরিফ** কবি, শিল্পতাত্ত্বিক ও *প্রথম আলো*র ব্যবস্থাপনা সম্পাদক।

বই আলোচনা

যুদ্ধ সংবাদদাতার চোখে একাত্তরের ভিতর-বাহির

সোহরাব হাসান

বাংলাদেশ ওয়ার : রিপোর্ট ফ্রম গ্রাউন্ড জিরো—মানস ঘোষ
নিয়োগী বুকস, ২০২১, নয়াদিল্লি, ভারত

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ উপমহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে সারা বিশ্বেও চাঞ্চল্য তৈরি করেছিল। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান সরাসরি এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমাদের এখানে যেসব বই লেখা হয়েছে, বেশির ভাগই স্মৃতিচারণা। তুলনায় বিদেশে, বিশেষ করে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের গবেষকেরা বেশ কিছু গবেষণামূলক বই লিখেছেন, যাতে মুক্তিযুদ্ধের ভিতর-বাহিরের অনেক চিত্র উঠে এসেছে। যেমন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গ্যারি জে বাসের *দ্য ব্লাড টেলিগ্রাম : নিক্সন, কিসিঞ্জার অ্যান্ড দ্য ফরগটেন জেনোসাইড*-এর (২০১৩, আলফ্রেড এ নফ) কথা বলা যায়। সেই প্রথম উপমহাদেশের বাইরের একজন গবেষক একাত্তরে বাংলাদেশের জনগণের ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন। এর আগে মার্কিন কূটনীতিক আর্চার ব্লাড লিখেছিলেন *দ্য ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ* (২০০২)। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের গণহত্যা এখনো আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়নি। আবার এই গণহত্যা নিয়ে ভারতের বিদ্বৎসমাজেও একধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে, তার প্রমাণ গ্যারি বাসের বইটি সেখানে প্রকাশিত হয়েছে *ব্লাড টেলিগ্রাম : ইন্ডিয়ানস সিক্রেট ওয়ার ইন ইস্ট পাকিস্তান* (২০১৪, র‍্যান্ডম হাউস) নামে। এই নাম পরিবর্তনে লেখকের যে কোনো ভূমিকা ছিল না, তা জানা গেল *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত লেখক-গবেষক মফিদুল হকের সাম্প্রতিক নিবন্ধ থেকে।

(স্বাধীনতা দিবস বিশেষ ক্রোড়পত্র, *প্রথম আলো*, ২৬ মার্চ ২০২২)।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিদেশি সাংবাদিক, গবেষক, পণ্ডিতদের যেসব বই প্রকাশিত হয়েছে, তাতে তাঁদের আবেগ-অনুভূতি যেমন উঠে এসেছে, তেমনি নিজ দেশের দৃষ্টিভঙ্গিও প্রতিফলিত হয়েছে। সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিক মানস ঘোষের *বাংলাদেশ ওয়ার : রিপোর্ট ফ্রম গ্রাউন্ড জিরো* (২০২১, নিয়োগী বুকস) নামের বইটি। তিনি সেই সাংবাদিক, যিনি একাত্তরের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা চালানোর আগেই নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের স্পন্দন টের পেয়েছিলেন। ২৫ মার্চ ঢাকায় অবরুদ্ধ ও পরে বিতাড়িত বিদেশি সাংবাদিকদের বাদ দিলে মানস ঘোষই প্রথম 'গ্রাউন্ড জিরো' তথা ঘটনাস্থল থেকে সংবাদ তৈরি করেছেন।

মানস ঘোষ লিখেছেন, তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশের আত্মার বন্ধন রচিত হয় ১৯৭০ সালের ১৫ নভেম্বর, যখন তিনি জাতিসংঘের এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যবিষয়ক অর্থনৈতিক কমিশন (এসকাপ) আয়োজিত তেহরান-ঢাকা গাড়ি শোভাযাত্রার খবর সংগ্রহ করতে বেনাপোল-পেট্রাপোল সীমান্তে আসেন। তিনি সে সময় ইংরেজি দৈনিক *স্টেটসম্যান*-এর নবীন প্রতিবেদক। এর কিছুদিন আগে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায় এবং লাখো মানুষের প্রাণহানি ঘটে। যাহোক, সীমান্তে মানস ঘোষের সঙ্গে আলাপ হয় এপারের তিন বাঙালির—তাঁদের মধ্যে একজন সরকারি কর্মকর্তাও ছিলেন। মানস ঘোষের পরিচয় জানার পর তাঁরা অভিযোগ করেন, ১৯৬৯ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে এত রাজনৈতিক উথালপাতাল ঘটনা ঘটেছে কিন্তু আকাশবাণী ও অন্যান্য ভারতীয় গণমাধ্যম তা অগ্রাহ্য করেছে। তাঁরা ঘূর্ণিদুর্গত এলাকায় পাকিস্তান সরকারের ত্রাণসামগ্রীর অপ্রতুলতা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করতে অনেক দেশ হেলিকপ্টার পাঠালেও সরকার সেগুলো বসিয়ে রেখেছে। আসন্ন নির্বাচন (৭ ডিসেম্বর) সম্পর্কেও এই তিন বাঙালি মন্তব্য করেছেন। তাঁরা বলেছেন, সমগ্র জাতি আওয়ামী লীগ ও এর নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পেছনে এককাট্টা হয়েছে।

সাংবাদিক মানস ঘোষের কাছে এটি ছিল খুবই উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা। *স্টেটসম্যান*-এ তাঁর সেই অভিজ্ঞতা ও কথোপকথন ছাপা হয়েছিল 'হোয়েন ব্রাদার্স মিট ব্রাদার্স' (ভাই যখন ভাইয়ের সঙ্গে মিলল) শিরোনামে। এটা পড়ে কলকাতার রাজনৈতিক ও সাংবাদিক মহলে ব্যাপক হইচই পড়ে যায়। অনেকে বাংলাদেশের ঘটনাবলি সম্পর্কে কৌতূহলী হন।

মানস ঘোষ সেই 'ত্রয়ী'র উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, 'আমাদের গন্তব্য বদলে যাবে এবং আমরা দিবালোকের মতো তা দেখতে পাচ্ছি। যদি নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়, পাকিস্তানের রাজনৈতিক দিগন্তে বড় ধরনের ঝড় বইবে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঢেউ চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে।' তাঁরা বলেছিলেন, 'ভারতও এই ঢেউয়ের বাইরে থাকবে না।' প্রখ্যাত সাঁতারু ও ইংলিশ চ্যানেলজয়ী ব্রজেন দাশ সে সময়ে কলকাতায় ছিলেন, মানস ঘোষ তাঁর সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা জানতে চাইলে তিনিও একই কথা বলেন।

১৯৭১ সালে ভারতের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থাও ছিল টালমাটাল। প্রদেশজুড়ে নকশাল আন্দোলন চলছিল। নকশাল কর্মীরা জোতদার থেকে সরকারি কর্মকর্তা—সবাইকে হত্যার নিশানা করেছিল। আবার নকশালদের মোকাবিলা করতে সরকারও দমন-পীড়ন চালায়। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহ ইন্দিরা সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ও রাজনৈতিক সুযোগ—দুটোই এনে দেয়। ১৯৭১ সালের ৯ মার্চের নির্বাচনে এককভাবে সিপিএম বেশি আসন পেলেও কংগ্রেস ও সিপিআই, বাংলা কংগ্রেস প্রভৃতি দল নিয়ে জোট সরকার গঠিত হয়। সরকার টিকেছিল মাত্র ৮৭ দিন। এরপর রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হলে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব আরও বেড়ে যায়।

মানস ঘোষ লিখেছেন, কলকাতার মস্কোপন্থী বাম নেতারা পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলি সম্পর্কে সজাগ ছিলেন এবং আগ্রহী হয়ে ওঠেন। পিকিংপন্থী হিসেবে পরিচিত সিপিআইএম নেতারা প্রথম দিকে একে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে দায়িত্ব এড়িয়ে যান; যদিও শরণার্থী ঢেউ আসতে থাকে প্রবল বেগে।

প্রতিবেশী দেশটির এই উথালপাতাল দশা ভারতের গণমাধ্যম পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেছে, এ কথাও ঠিক নয়। বাচিকশিল্পী দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, '১৯৬৯ সাল থেকেই আকাশবাণী সীমান্তের ওপারের লেখক-শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান করত; তা থেকে আমরা বুঝতে পারতাম সেখানে কী পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে।' ১ মার্চ ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত ঘোষণা করলে বাংলাদেশে যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে, তার খবরও বিদেশি বার্তা সংস্থার মাধ্যমে ভারতে পৌঁছায়। ২৭ মার্চ আকাশবাণী থেকে সংবাদ বুলেটিনে প্রচার করা হলো, পূর্ব পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। এর কিছুক্ষণ পর বাজানো হলো, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'।

আগরতলা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক সংবাদ* বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকেই স্বাধীনতার ঘোষণা বলে অভিহিত করে। সংবাদমাধ্যমে পূর্ব বাংলার খবর আসুক

বা না আসুক, ভারতের প্রশাসন নির্বিকার ছিল না। আমরা শ্রীনাথ রাঘবনের বই (*১৯৭১ : আ গ্লোবাল হিস্ট্রি অব দ্য ক্রিয়েশন অব বাংলাদেশ*, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৩) থেকে জানতে পারি, ২৫ মার্চের আগেই শেখ মুজিব ভারতীয় কূটনীতিকের মাধ্যমে দিল্লিকে এই বার্তা দেন যে তারা যেন পশ্চিম সীমান্ত থেকে সেনাবাহিনী না সরায়। পশ্চিম সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধিক জনবল মোতায়েন থাকলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্বাংশে বেশি সেনা পাকিস্তান সরকার পাঠাতে পারবে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ও বাংলাদেশের সাবেক সাংসদ চিত্তরঞ্জন সুতারের (১৯২৮-২০০২) সঙ্গে যোগাযোগ করে বার্তা দেন যে মুজিবের অনুগামীরা বিপদে পড়লে ভারতীয়রা যেন সহায়তা করেন।

তবে ভারতের একটি ভয় ছিল। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার নাগা ও মিজো বিদ্রোহীদের সহায়তা করে আসছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের গহিন অরণ্যে তাদের ঘাঁটি ছিল। তারা পাকিস্তান ও চীন থেকে অস্ত্র পেত বলেও অভিযোগ আছে। মানস ঘোষ লিখেছেন, নাগা ও মিজো নেতারা ঢাকা থেকে ঘন ঘন ইসলামাবাদ যেতেন এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন।

মানস ঘোষ বাংলাদেশে ভারতের প্রথম হাইকমিশনার সুবিমল দত্তের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, নেহরুর নির্দেশনা অনুযায়ী পররাষ্ট্র দপ্তর ঢাকার ভারতীয় মিশনকে কম গুরুত্ব দিয়ে আসছিল। সেখানে লোকবলও কম ছিল। ফলে মিজো ও নাগা বিদ্রোহীদের তৎপরতার খোঁজখবর তাঁরা খুব একটা পেতেন না। ইসলামাবাদে অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মকর্তারাও কদাচিৎ ঢাকায় আসতেন।

মানস ঘোষের পর্যবেক্ষণ হলো, ষাটের দশক ও সত্তরের শুরুতে দিল্লিতে ভারতীয় গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করতেন মূলত ভাটিয়া, দাস, মালহোত্রা, নায়াররা—যাঁরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসেছেন। ফলে তাঁদের লাহোর, শিয়ালকোট ও পেশোয়ার সম্পর্কে স্মৃতিকাতরতা ছিল। এটা অস্বাভাবিক নয়। বাংলাদেশ থেকে যেসব লেখক-শিল্পী পশ্চিমবঙ্গে গেছেন, তাঁদের লেখায়ও এই স্মৃতিকাতরতা প্রবল। উদাহরণ হিসেবে আমরা তপন রায়চৌধুরীর *বাঙালনামা* ও মিহির সেনগুপ্তর *বিষাদবৃক্ষ*র কথা বলতে পারি।

মানস ঘোষ সাক্ষ্য দিচ্ছেন : ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে *স্টেটসম্যান*-এর তৎকালীন আবাসিক সম্পাদক কুলদীপ নায়ার পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে যে কলাম লিখলেন, তাতে জুলফিকার আলী ভুট্টো ও তাঁর পিপলস পার্টির

বিপুল জয়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়। কিন্তু শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগ সম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে যে সরকারি কর্মকর্তা ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, তিনি বিএসএফের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার গোলক মজুমদার। তাঁর (গোলক মজুমদার) ধারণা ছিল, শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়ী হবে। তবে তিনি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও পাকিস্তানি শাসক চক্র, বিশেষ করে সেনাবাহিনী ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। এরপর মানস ঘোষ লিখেছেন, সীমান্তে যেসব বাঙালি কর্মকর্তার সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে, তাঁরা প্রকাশ্যেই পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, যা স্বাভাবিক নয়।

২৬ মার্চ কলকাতার কোনো পত্রিকায় যে পাকিস্তানিদের গণহত্যার খবর ছাপা হয়নি, সেটাও অস্বাভাবিক নয়। পাকিস্তানিরা হত্যাযজ্ঞ চালায় মধ্যরাতে। তার আগে তারা বিদেশের সঙ্গে সব যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় এবং বিদেশি সাংবাদিকদের দেশত্যাগে বাধ্য করে। ভারতীয় গণমাধ্যমে ধীরে ধীরে গণহত্যার খবর আসতে থাকে। প্রথমে ইউএনআই আগরতলার সূত্রে খবর প্রচার করে। ২৭ মার্চ সিপিআই নেতা ও রাজ্যসভা সদস্য ভূপেষ গুপ্ত ও অধ্যাপক সুখময় চক্রবর্তীর সঙ্গে মানস ঘোষের দেখা হলে তিনি প্রথমেই জানতে চান, 'শেখ সাহেব কোথায় আছেন, কোনো খবর জানো কি?' মানস ঘোষ বলেন, তাঁর কাছে কোনো তথ্য নেই। ভূপেষ গুপ্ত উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, 'তুমি কেমন রিপোর্টার?'

তাঁর এই কথা মানস ঘোষকে চিন্তায় ফেলে। তিনি রাতে ঘুমাতে পারেননি। এরপর সিদ্ধান্ত নেন, যে করেই হোক বাংলাদেশের খবর বের করতে হবে। মানস ঘোষ তাঁর চিফ রিপোর্টারকে টেলিফোন করে সীমান্তে যাওয়ার কথা বললে তিনি রাজি হননি। বললেন, 'এই দায়িত্ব পালনের জন্য তুমি খুবই জুনিয়র।'

এরপর মানস ঘোষ সাপ্তাহিক ছুটির দিন পকেটে ৫০ টাকা নিয়ে পেট্রাপোল যান এবং বিএসএফ কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করেন, ওপার থেকে কেউ এসেছেন কি না? তাঁর জবাব ছিল, 'গত তিন দিনে কেউ আসেনি। আমরা যা শুনতে পেয়েছি, পাকিস্তানিরা ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছে। ফলে আজও সীমান্ত দিয়ে কারও আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ।' আসলে ওই বিএসএফ কর্মকর্তা চাইছিলেন না কোনো সাংবাদিক সেখানে থাকুন। চুয়াডাঙ্গার এসডিও তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন আহমদ ওই বিএসএফ কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তৌফিক সীমান্তে বিএসএফ কর্মকর্তার বাংলোয় বৈঠকও করেন। এ কারণে তিনি চাইছিলেন না

কোনো সাংবাদিক সেখানে থাকুন।

বিএসএফ কর্মকর্তার পরামর্শ অগ্রাহ্য করে মানস ঘোষ সন্ধ্যা পর্যন্ত রাস্তার পাশে অপেক্ষা করেন এবং দেখতে পান, বেনাপোল থেকে এক ব্যক্তি দুটি স্যুটকেস নিয়ে এপারে আসছেন। তিনি একজন ইউরোপীয়, একটি ইতালীয় কোম্পানির নির্বাহী। ভদ্রলোক ট্রাক, অটোরিকশা, নৌকা, ব্যক্তিগত গাড়ি, মোটরসাইকেলযোগে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন। তিনি হোটেল থেকে ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ নিজের চোখে দেখেছেন। ২৬ মার্চ হোটেল ম্যানেজার তাঁকে সীমান্তে আসার ব্যাপারে সহায়তা করেন। এরপর মি. ফ্যালাসিট্টি নামের সেই ইতালিয়ান নাগরিক মানস ঘোষের সঙ্গেই কলকাতা ফেরেন। তিনি জানান, ঢাকা থেকে আসার পথে ঘাটে ঘাটে তাঁকে মিছিলের সামনে পড়তে হয়েছে। সর্বত্র মানুষ মুজিবের ছবি নিয়ে জয় বাংলা স্লোগান দিচ্ছিল।

স্টেটসম্যান-এ মানস ঘোষের এই রিপোর্ট ছাপার পর *স্টেটসম্যান*-এরও কাটতি বেড়ে যায়, তিনিও উৎসাহিত হন। কর্তৃপক্ষ ঠিক করে, মানস ঘোষই যুদ্ধ সংবাদদাতার দায়িত্ব পালন করবেন। মানস ঘোষ সিদ্ধান্ত নেন, বাংলাদেশে যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, তার ভেতরে গিয়েই রিপোর্ট করবেন। ৩০ মার্চ তিনি ভোমরা বন্দর দিয়ে সাতক্ষীরায় প্রবেশ করেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন *স্টেটসম্যান*-এর আলোকচিত্রী চন্দ্র শেখর রায় ও আরএএফের সাবেক আলোকচিত্রী সুধীন রায়। বিএসএফ তাঁদের বাংলাদেশের ভেতরে এই শর্তে যাওয়ার অনুমতি দেয় যে কোনো দুর্ঘটনার দায় তারা নেবে না। তিনি লিখেছেন, সাতক্ষীরায় ঢুকে তিনি দেখতে পান, রাজাকাররা স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের হত্যা করেছে। কিন্তু তখনো তো রাজাকার নামে কোনো বাহিনী গঠিত হয়নি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী কিংবা তাদের সমর্থক বিহারি কিংবা মুসলিম লীগার ও জামায়াতের কর্মীদের হাতে তাঁরা খুন হয়ে থাকতে পারেন।

মানস ঘোষের চতুর্থ ও সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অ্যাসাইনমেন্ট ছিল চুয়াডাঙ্গায়, যেখানে মেজর ওসমান ও পাবনার ডিসি নুরুল কাদের খানের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। নুরুল কাদের খান পাবনা থেকে চুয়াডাঙ্গা এসেছেন অস্ত্র সংগ্রহ করতে। ২৯ মার্চ পর্যন্ত তিনি পাবনা মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। মানস ঘোষ ও তাঁর সহযাত্রীরা যেখানে গেছেন; ছাত্র, তরুণ ও রাজনৈতিক কর্মীদের দেখেছেন বঙ্গবন্ধুর ছবি নিয়ে জয় বাংলা স্লোগান দিচ্ছেন। তাঁদের আকুতি ছিল, 'আমাদের পাশে কেউ নেই। এ অবস্থায় ভারতই আমাদের বাঁচাতে পারে।' সাংবাদিক

পরিচয় পেয়ে অনেকে কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন।

মানস ঘোষ যশোরে রাস্তার পাশে সেনাবাহিনীর অগ্নিদগ্ধ গাড়ি দেখে বুঝতে পারেন, সেখানে প্রতিরোধ হয়েছে। সড়কের মাঝখানে পাকিস্তানি সেনাদের লাশসহ তিনটি ট্রাক পড়ে ছিল। তাঁরা যখন যশোর কালেক্টরেট ভবনে পৌঁছান, তখন বিভিন্ন ভবনে বাংলাদেশের পতাকা উড়তে দেখেন। সেনাবাহিনী শহর ছেড়ে ক্যান্টনমেন্টে আশ্রয় নিয়েছিল।

মানস ঘোষ তাঁর বইয়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে ঈশ্বরদী ও পাবনায় যাওয়ার সময় কী কী লোমহর্ষক ঘটনা দেখেছেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন। পাবনায় তাঁদের সঙ্গে দেখা হয় আওয়ামী লীগ নেতা ও জাতীয় পরিষদ সদস্য বগা মিয়া, মুক্তিযোদ্ধা বদরুল ইসলাম বকুল ও ইকবালের সঙ্গি কিশোরী মুক্তিযোদ্ধা শিরিন বানুর। ততক্ষণে নগরবাড়ী ফেরিঘাট পার হয়ে পাকিস্তানি সেনারা পাবনায় ঢুকে পড়েছে। মিছিলের ছবিসহ মানস ঘোষের রিপোর্ট *স্টেটসম্যান*-এ ছাপা হয় ১১ এপ্রিল। *স্টেটসম্যান*-এ এই খবর পড়ে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ মানস ঘোষের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি থিয়েটার রোডে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। তাজউদ্দীন আহমদের প্রথম প্রশ্ন ছিল, শহর ও গ্রামাঞ্চলে মানুষের মনোবল কেমন দেখলেন? পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কি জোরদার হয়েছে ও দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে? বাঙালি পুলিশ, সেনাবাহিনী ও ইপিআরের কর্মরত বাঙালিরা কি পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে?

এরপর মানস ঘোষ লিখেছেন, 'আমার প্রায় সব উত্তর ছিল ইতিবাচক।' তাজউদ্দীন তাঁর কথা শুনে খুশি হলেন এবং বললেন, 'আপনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন।'

মানস ঘোষ তাঁর বইয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা লিখতে গিয়ে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির টানাপোড়েনও তুলে ধরেছেন। কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যেও বাংলাদেশ নিয়ে দ্বিধা ছিল। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একাংশ চায়নি যুদ্ধে ভারত কোনোভাবে সম্পৃক্ত হোক। বিশ্বরাজনীতিতে ভারত তখন বেশ চ্যালেঞ্জের মুখে। নিক্সন প্রশাসন ইয়াহিয়ার পক্ষ নিয়েছে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব করিয়ে দেওয়ার জন্য। উল্লেখ্য, নিক্সনের নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার দিল্লি ও ইসলামাবাদ সফর করেন। এরপর তিনি পাকিস্তান থেকে গোপনে চীন সফরে যান।

এদিকে চীন শুরু থেকে বাঙালিদের ওপর সেনাবাহিনীর গণহত্যাকে পাকিস্তানের 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' বলে দাবি করে আসছিল। একই সঙ্গে ভারতকে

হুঁশিয়ার করে দিতে থাকে যে পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়, ভারত এমন পদক্ষেপ নিলে চীন তা মেনে নেবে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব বাংলায় সেনা অভিযানে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও তারা চাইছিল আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হোক। এদিকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ভেতরেও মতভেদ ছিল। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ যেকোনো মূল্যে বাংলাদেশকে স্বাধীন করা এবং শেখ মুজিবকে মুক্ত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ তখনো পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় আসার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর সহযোগীরা আগস্টে কলকাতায় মার্কিন মিশনের প্রধান ও অন্য কূটনীতিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের শিবিরে গিয়ে তিনি এ কথাও বলেছেন যে আপনারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা না শেখ মুজিবের মুক্তি চান?

তখনো শেখ মুজিবের প্রতি ছাত্র-তরুণদের প্রচণ্ড আবেগ ছিল। মোশতাক চক্র মুজিবের মুক্তির বিনিময়ে যেকোনো সমঝোতা মানতে প্রস্তুত ছিল। এই উদ্যোগের পেছনে তাজউদ্দীনকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্য ছিল। আর এই ষড়যন্ত্রে মুজিব বাহিনী ও আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতাও জড়িত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা সফল হননি।

মানস ঘোষ সরেজমিন রিপোর্টের পাশাপাশি সেই সময়ের ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও বিশ্বরাজনীতিও বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর সব মতের সঙ্গে সবাই একমত হবেন না, তবে স্বীকার করতে হবে, একজন যুদ্ধ সংবাদদাতা হিসেবে মানস ঘোষ সে সময়ে চোখ কান খোলা রেখেছিলেন।

১ আগস্ট নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ারে পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও জর্জ হ্যারিসনের উদ্যোগে বাংলাদেশ কনসার্ট হয়েছিল, তা আমরা সবাই জানি। মানস ঘোষ এই কনসার্টের পটভূমি সম্পর্কে লিখেছেন: জুলাইয়ের শুরুতে রবিশঙ্কর কলকাতায় এসে তাঁর পৈতৃক বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার খবর শুনে সিদ্ধান্ত নেন, বাংলাদেশ নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক কনসার্ট করবেন। তিনি জর্জ হ্যারিসনকে ফোন করে বিষয়টি জানালে গুরুর প্রস্তাব শিষ্য লুফে নেন। এরপর তাঁরা এরিক ক্ল্যাপটন, বব ডিলান, জোয়ান বায়েজের সঙ্গে মিলে হাজার হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে কনসার্ট করেন। মানস ঘোষের বিশ্লেষণ হলো, এর আগের চার মাসে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে বাংলাদেশ যা পারেনি, এক রাতের কনসার্ট তা অর্জন করল। একই দিন লন্ডনের ট্রাফালগার স্কয়ারে 'অ্যাকশন বাংলাদেশ' গণহত্যা বন্ধের দাবিতে বিশাল আয়োজন করে।

এরপর বাংলাদেশ ইস্যুটি কেবল রাজনৈতিক নয়, বিশ্বব্যাপী লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মার্কিন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করলেও দেশটির সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিরাও পাকিস্তানি বর্বরতার নিন্দা করেন। নিক্সন-কিসিঞ্জার চক্র পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহের প্রস্তাব দিয়েও কংগ্রেসে পাস করাতে পারেনি।

মানস ঘোষের বইয়ের একটি অধ্যায় হলো ইন্ডিয়ান মুসলিমস : অ্যামবিভ্যালেন্ট, অ্যান্টাগনিস্টিক (ভারতীয় মুসলমান : দোদুল্যমান ও বিরোধী)। তিনি লিখেছেন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতীয় মুসলমানদের বড় অংশ বাংলাদেশের বিরোধিতা করেছে। তাদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা ও মন্ত্রী ফখরুদ্দিন আলী আহমদ, মইনুল হক চৌধুরী প্রমুখ ইন্দিরা গান্ধীকে পাকিস্তান ভাঙা থেকে বিরত রাখারও চেষ্টা করেছেন। এমনকি পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের মন্ত্রিসভার দুই সদস্য আবদুস সাত্তার ও জয়নুল আবেদিনও একই অবস্থান নিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতে থেকেও কেন তাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন, সেই ব্যাখ্যা তাঁরা দেননি। এর অর্থ কি ভারতের রাজনীতির মূলধারায় থেকেও তাঁরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন ও বিপন্ন মনে করেছিলেন? তবে এ-ও মনে রাখতে হবে, পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান লেখক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আবু সাঈদ আইয়ুব, বিচারপতি আবু সাদাত মাসুদ, কমিউনিস্ট নেতা আবদুর রাজ্জাক, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এম ও গনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছেন।

মানস ঘোষ এ বইয়ে প্রচলিত ধারণার বিপরীত কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন। আমরা এত দিন জেনে এসেছি, পাকিস্তান সরকার বরাবর মুজিবের মুক্তির বিরোধিতা করেছে। কিন্তু ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একাংশও এতে সায় দিয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কলকাতা অফিসের প্রধান ও সাবেক পররাষ্ট্রসচিব অশোক রায়ের বরাত দিয়ে মানস ঘোষ লিখেছেন, 'পাকিস্তানে তৎকালীন ভারতীয় হাইকমিশনার জে কে অটল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে এই বার্তা দিয়েছেন যে সমঝোতার জন্য মুজিবের মুক্তি অপরিহার্য নয়। অশোক রায় এ বিষয়ে রিপোর্ট না করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, তাতে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হবে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইন্দিরা গান্ধী অনেক সিদ্ধান্ত নিতেন তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে আলোচনা করে, যা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দু-চারজন বিশ্বস্ত কর্মকর্তা ছাড়া কেউ জানতেন না।'

মানস ঘোষ আরেকটা পিলে চমকানো তথ্য দিয়েছেন থিয়েটার রোডের পাশে একদল বিদেশি গুপ্তচরের সন্দেহভাজন ঘোরাফেরার বিষয়ে। ওই গুপ্তচরেরা

নাকি তাজউদ্দীন আহমদকে অপহরণ করে হেলিকপ্টারযোগে ভারতের বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তাঁরা একটি হোটেল থেকে তাজউদ্দীনের চলাফেরা নজরদারি করছিলেন। গোলক মজুমদার ত্বরিত হোটেলে তাঁর টিম পাঠালে দেখতে পান, গুপ্তচরেরা আগেই চম্পট দিয়েছেন। তাঁদের অভিসন্ধি সফল হলে বাংলাদেশ সরকার মাথাহীন ধড়ে পরিণত হতো—মন্তব্য মানস ঘোষের।

মানস ঘোষ মুক্তিযুদ্ধের পুরোটাই যে দেখে লিখেছেন, তা নয়। অন্যান্য বই, পত্রিকা, মহাফেজখানা থেকেও তথ্য-উপাত্ত নিয়েছেন, যার দালিলিক প্রমাণ পাওয়া যাবে না। সে ক্ষেত্রে এই বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাঁর অভিজ্ঞতা ও নিজের দেখা। লম্বা-চওড়া শারীরিক গঠনের জন্য তিনি একবার বিপদেও পড়তে যাচ্ছিলেন। অনেকে তাঁকে পাঞ্জাবি ভেবে সন্দেহ করছিলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর প্রকৃত পরিচয় পেয়ে গাছ থেকে পেড়ে ডাব খাইয়েছেন। সম্মান দেখিয়েছেন।

মানস ঘোষ যুদ্ধ সংবাদদাতা হিসেবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের খবর গ্রাউন্ড জিরো থেকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে অতৃপ্তি হলো তিনি নিজের অভিজ্ঞতা শুনিয়েছেন কিন্তু সেই অভিজ্ঞতাজাত যুদ্ধ—সাংবাদিকতার রূপ কী ছিল, তার বিবরণ দেননি। সেই সময় *স্টেটসম্যান*-এ মানস ঘোষ যেসব প্রতিবেদন তৈরি করেছেন, পুরোটা না হলেও উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধৃত করলে পাঠক আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অনেক মূল্যবান উপাদান পেতে পারতেন।

● **সোহরাব হাসান** *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক এবং কবি ও প্রাবন্ধিক। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও রাজনীতি তাঁর অন্যতম আগ্রহের বিষয়।

বই আলোচনা

মাহমুদ মামদানির ‘চিরস্থায়ী সংখ্যালঘু’ ও জাতিরাষ্ট্রের অভিশাপ

মো. আদনান আরিফ সালিম

নেইদার সেটেলার নর নেটিভ : দ্য মেকিং অ্যান্ড আনমেকিং অব পারমানেন্ট মাইনরিটিজ—মাহমুদ মামদানি, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস (২০২০)।

শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতগুলো চিরস্থায়ী কিছু দাগ রেখে যায় শরীরে। ঠিক যেমন স্কুলজীবনে কাঠের বেঞ্চে স্টিলের স্কেল দিয়ে কাটা আঁচড়গুলো শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পরও দগদগে অতীত হিসেবে মুখব্যাদান করে টিকে থাকে। বিশ্বসভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানবতার প্রশ্নে উপনিবেশ অনেকটা শরীরের ক্ষত কিংবা বেঞ্চে কাটা আঁচড়ের মতো। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তীব্রতা, বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ও ইউরোপের নানা দেশের সামরিক দুর্বলতার কারণে কাগজে-কলমে ইতিহাসের পাতায় বর্ণিত উপনিবেশকাল শেষ হয়েছে। তবে বাস্তবতার নিরিখে দেখতে গেলে, পরিস্থিতি অনেকটা রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মতো, অর্থাৎ ‘শেষ হয়ে হইল না শেষ’।

উপনিবেশবাদও বিভিন্ন ধাপ পার হয়ে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে পরিণতি পেয়েছে। তবে উপনিবেশবাদের ইতিহাসচর্চায় জাতিরাষ্ট্রকে উপনিবেশের পরবর্তী ধাপ হিসেবে দেখার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছেন মাহমুদ মামদানি। তিনি দেখাচ্ছেন, এই দুটি রাজনৈতিক মডেলকে আগে-পরে দিয়ে বোঝা যাবে না। বরং তারা একই সময়ে রূপ লাভ করেছে এবং একটি অপরটিকে গড়ে দিয়েছে। এই মডেল হলো সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ। মাহমুদ মামদানি একেই বলছেন রাজনৈতিক আধুনিকতার আদি পাপ।

বিশ্বের নানা স্থানে চলমান জাতিগত সংঘাত ও জাতিবিদ্বেষের বাস্তবতায় এডওয়ার্ড সাঈদ উত্তরকালে নির্যাতিতের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত উগান্ডার তাত্ত্বিক মাহমুদ মামদানি (১৯৪৩-)। উগান্ডার ইদি আমিনের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের কর্মী, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের সহযাত্রী এবং উপনিবেশবাদবিরোধী তাত্ত্বিক হিসেবে মামদানি সেই সারিতে অবস্থান করেন, যেখানে ছিলেন আলজেরিয়ার ফ্রাঞ্জ ফানো, ফিলিস্তিনের এডওয়ার্ড সাঈদ, পাকিস্তানের একবাল আহমদ। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অব আফ্রিকান স্টাডিজের পরিচালক, উগান্ডার কাম্পালা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। উগান্ডার সমাজবিজ্ঞান গবেষণার প্রথম প্রতিষ্ঠানটি তাঁরই হাতে গড়া। বিভিন্ন সময়ে তিনি দেশটি থেকে বহিষ্কৃতও হয়েছেন। আবার গণতান্ত্রিক শাসনে ফিরে গেছেন জন্মভূমিতে। ১৩টি মৌলিক গ্রন্থ ও সম্পাদিত প্রকাশনায় তিনি উপনিবেশোত্তর অধ্যয়নের বিদ্যাজগতেও এক উজ্জ্বল নাম। যুক্তরাজ্যভিত্তিক *প্রসপেক্ট* ম্যাগাজিন ২০২১ সালে সমকালীন বিশ্বের শীর্ষ ৫০ চিন্তাবিদের অন্যতম বলেছে মামদানিকে। তাঁর আলোচিত বইগুলোর মধ্যে রয়েছে *The Myth of Population Control : Family, Class and Caste in an Indian Village* (1972), *Good Muslim, Bad Muslim : America, the Cold War and the Roots of Terror* (2004), *Define and Rule : Native as Political Identity* (The W.E.B. DuBois Lectures) (2012) এবং সর্বশেষ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে প্রকাশিত *Neither Settler nor Native : The Making and Unmaking of Permanent Minorities* (2020)। শেষ বইটিতে তিনি জাতিরাষ্ট্র গঠনের আদর্শ ও তার ইতিহাস এবং উপনিবেশবাদ ও দখলদার প্রশ্নে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিতর্ক উত্থাপন করেছেন। আধুনিক রাজনীতি, নাগরিকত্ব, সার্বভৌমত্ব, মানবাধিকার ইত্যাকার প্রশ্নে তাঁর গবেষণালব্ধ অন্তর্দৃষ্টি বর্তমানকালের রাজনৈতিক জটিলতা ও মানবিক দুরবস্থা বুঝতে সাহায্য করতে পারে।

১.

প্রচলিত ইতিহাসে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের সূচনা ধরা হয় ইউরোপের ১৬৪৮ সালের ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তিকে। ৩০ বছরের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে তার জায়গা নেয় তিনটি ইউরোপীয় সাম্রাজ্য। এরা নিজেদের মধ্যে এই চুক্তি করে যুদ্ধের অবসান ঘটায় যে পরস্পরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক

গলাবে না এবং ইউরোপজুড়ে সংখ্যালঘু ধর্মমতকে ততক্ষণ পর্যন্ত নিজ নিজ ধর্মচর্চা করতে দেবে, যতক্ষণ না তারা সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক বিষয়ে কথা বলে। তবে এই অপর ধর্মমত বলতে খ্রিষ্টধর্মের ভেতরের তিনটি সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়—ক্যাথলিক, লুথেরান ও ক্যালভিনিস্ট। প্রটেস্ট্যান্ট সাম্রাজ্যে এরা হয়ে পড়ে জাতীয় সংখ্যালঘু। জাতীয় সংখ্যালঘুর কোনো সার্বভৌম অধিকার থাকবে না। এভাবে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও ধর্মীয় সহনশীলতাকে আধুনিক রাষ্ট্রের মূল দুই সূত্র হিসেবে নেওয়া হয়। মামদানি বলছেন, ১৬৪৮ সালের ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তি আসলে আরও আগের আরেকটি যুগান্তকারী চুক্তিরই উত্তরাধিকারী। তৎকালীন আইবেরিয়া তথা আধুনিক স্পেনের কাস্টাইল ও আরাগঁ রাজ্যের দুই রাজন্য রানি ইসাবেলা ও রাজা ফার্দিনান্দ আন্দালুসিয়ার দ্বিতীয় উমাইয়া খেলাফত উচ্ছেদ করার পর মুসলমান ও ইহুদিদের ওপর গণহত্যা চালান, বাকিদের বিতাড়ন করেন। এটাই জাতিরাষ্ট্র গঠনের পথে জাতিগত শুদ্ধি বা এথনিক ক্লিনজিং, যার চরিত্র হলো গণহত্যা। গণহত্যার পরও থেকে যাওয়া অখ্রিষ্টানদের বাধ্যতামূলক ধর্মান্তরের 'সুযোগ' দেন। ১৪৯২ সালে আলহামরা ডিক্রি জারি করে ঘোষণা করা হয় 'এক দেশ, এক ধর্ম, এক রাজ্য'। এই ডিক্রির মাধ্যমে নতুন স্পেনীয় জাতি গঠন শুরু হয়। তখন দেখা গেল, রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে কিন্তু জাতির বদলে পাওয়া যাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়। সুতরাং জাতি গঠন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় ওই এক দেশ এক ধর্ম কায়েম করার মাধ্যমে। ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাষার চিহ্ন মুছে ফেলা হয়। এর মাধ্যমে শুদ্ধ জাতি গঠনের চেষ্টা হয়। শুদ্ধ জাতির সদস্যরাই কেবল 'সার্বভৌম'। তারপরও যারা জাতির সংজ্ঞার বাইরে রয়ে যায়, তারা হয়ে পড়ে 'পারমানেন্ট মাইনরিটি' বা 'স্থায়ী সংখ্যালঘু'। ১৬৪৮ সালের ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তির নতুনত্ব হলো এই সংখ্যালঘুদের সহ্যকরণ।

সংখ্যালঘুকরণ চালাতে হলে আগে 'সংখ্যাগরিষ্ঠ' বানাতে হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠদের এক সম্প্রদায়ের হতে হবে, বিধায় পাল্টা সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে চাওয়াদের সেই রাষ্ট্রের সীমানার বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। তারপরও যারা রয়ে যায়, তারাই হলো 'স্থায়ী সংখ্যালঘু'। ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তিতে সংখ্যালঘুদের নাগরিক অধিকার ছিল না। কেবল নিজস্ব পরিমণ্ডলে ধর্ম পালনের অধিকার ছিল। যে বছরে আইবেরীয় চুক্তি হয়, সেই ১৪৯২ সালে কলম্বাস আমেরিকা মহাদেশে পা রাখেন। ইউরোপের প্রথম উপনিবেশে চলে প্রথম ইউরোপীয় জাতিরাষ্ট্র গঠন কর্মসূচির অনুকরণ। এখানেও গণহত্যার মাধ্যমে 'সেটলার'রা নেশন গঠন করে। বেঁচে যাওয়া আদিবাসীদের ছোট্ট জায়গায় আটকে রেখে তৈরি করা হয় জাতীয় সংখ্যালঘু।

কিন্তু ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তিতে সংখ্যালঘুর যে অধিকার দেওয়া হয়, সেটা উপনিবেশে দেওয়া হয় না। এই উপনিবেশকরণকে ইউরোপের 'সিভিলাইজিং মিশন' বলে কর্তব্যের মর্যাদা দেওয়া হয়; দার্শনিক, আইনবিদ, ধর্মবেত্তারা এর বৈধতাও দেন।

মামদানি জাতিরাষ্ট্রের উত্থানপর্ব থেকে স্থানীয় (Native) আর বহিরাগত প্রশ্নের বিভিন্ন অভিমুখ পর্যালোচনা করেছেন। স্থানীয় ও বহিরাগত প্রশ্নে স্পেনের এই ধরনের মতবাদ আবার উল্টে যায় বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তাদের উপনিবেশগুলোতে। একই কাস্টিলিয়ান রাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা যখন আমেরিকা কিংবা আফ্রিকার নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, সেখানেও তারা চেয়েছিল একক জাতিসত্তার দাপট। ফলে আদিবাসী আফ্রিকান কিংবা আমেরিকানদের তারা গণহত্যার মাধ্যমে জাতিগতভাবে নির্মূল করার প্রচেষ্টা চালায়। একই সঙ্গে বিভিন্ন আদিবাসী গ্রামে আক্রমণ করে তাদের পুরুষদের হত্যা করা হয়। গণধর্ষণের শিকার হন আদিবাসী নারীরা। কারণ, এর মাধ্যমে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাকারীরা মনে করেছিল, আফ্রিকা কিংবা আমেরিকার স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর জাতিগতভাবে আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব হবে।

মামদানি মনে করেন, প্রত্যক্ষ উপনিবেশ উচ্ছেদের পর জাতীয়তাবাদী শক্তির ক্ষমতায়ন অনেক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বিপন্ন করেছে। তারা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখে পড়ে নিজ নিজ সত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পুরোপুরি ব্যর্থ। অনেক জাতিগোষ্ঠী নামমাত্র টিকে থাকলেও তাদের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি শাসনক্ষমতায় থাকা বৃহৎ জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে পুরোপুরি একীভূত হয়ে গেছে। অর্থাৎ বহিঃশক্তির উপনিবেশ থেকে মুক্তি মিললেও উপনিবেশের আদলে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা তাদের অজগরের বেষ্টনীর মতো জড়িয়ে ধরেছে। এভাবে আত্মপরিচয়ের সংকট আর সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বিচারে তাদের জন্য নিশ্বাস আর নাভিশ্বাস হয়ে গেছে সমার্থক। এসব দেশ কেন উত্তর ঔপনিবেশিক আধুনিকতার জন্য স্বজাতির রক্ত ঝরাচ্ছে, কীভাবে লাগাতার ভয়ের মধ্যে তাদের দিনাতিপাত করতে হয়; সে বিষয়ের আলোচনাটা এখন খুব জরুরি। আর জাতিগত নির্মূলকরণের স্থানীয় মডেল দাঙ্গা আর গৃহযুদ্ধ এসব দেশকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক—প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিপর্যস্ত ও বিভক্ত করে রেখেছে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে উপনিবেশ উচ্ছেদ হলে সেখানে সিন্দবাদের ভূতের মতো চেপে বসতে দেখা গেছে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী জনগোষ্ঠীর আধিপত্য।

ভিন্নধর্মী জনগণের যে কাউকে তাঁর পিতৃপ্রদত্ত প্রাণটা নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট জাতিরাষ্ট্রের ভৌগোলিক পরিসীমায় উপযুক্ত রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে টিকে থাকার পথ ছিল তিনটি : ক. ধর্মান্তর খ. অভিবাসন গ. মৃত্যু। কিন্তু যখন স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান বা লাল জাতির মতো গণহত্যার মাধ্যমে সংখ্যালঘু করে দেওয়া যায় না, তখন কী করা হয়? মামদানি দেখাচ্ছেন, তখন তাদের মধ্যে চলে 'ডিফাইন অ্যান্ড রুল', অর্থাৎ শাসনের সুবিধার্থে আগে সংজ্ঞায়িত করো। রোমান সাম্রাজ্য উপনিবেশ চালাত ভাগ করো শাসন করো নীতির ভিত্তিতে। আধুনিক ইউরোপীয় সাম্রাজ্য চালায় 'নাম দাও শাসন করো' নীতি। ভাগ করার জন্য আগে তো নাম দিতে হয়। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্থায়ী শত্রুতামূলক পরিচয়ে সংজ্ঞায়িত করা হয়। আদমশুমারি, আইন ও শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিটি জনগোষ্ঠীকে আত্মসচেতন করে তোলা হয় অপর জনগোষ্ঠীর বিপক্ষে। এদেরকেই আবার 'নেশন' বা জাতি হয়ে ওঠার প্রেরণা দেওয়া হয়। এভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি নির্মাণ করে সংখ্যালঘু বলে কাউকে দাগিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে বোনা হয় স্থায়ী শত্রুতার পরিচয়ের রাজনীতি। সংঘাতে বিপর্যস্ত আধুনিক বিশ্ব এই ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয়।

ইতিহাসে জন্ম নেওয়া ঔপনিবেশিক সংকটের এই দীর্ঘ ফিরিস্তি মামদানি দেন দীর্ঘ ভূমিকায়। এখানে এসে তিনি ৪৩৬ পৃষ্ঠার দীর্ঘ বইটিকে ৫টি অধ্যায়ে ভাগ করে ফেলেন। ঔপনিবেশিক ঔরসে জন্ম নেওয়া স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের ভেতরে স্থায়ীভাবে সংখ্যালঘু হয়ে পড়া স্থানীয় অধিবাসীদের 'সার্বভৌমত্ব' যে রাজনৈতিক আধুনিকতা কেড়ে নিয়েছে বা নামমাত্র করে রেখেছে, সেসব জাতিরাষ্ট্রের গড়নের বিকৃতি তিনি একে একে দেখান।

২.

আদতে নিজ দেশে পরবাসী হয়ে থাকা কিছু মানুষের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্ন মামদানির কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। তিনি আফ্রিকার বিভিন্ন স্বাধীন দেশে বাস করেও সার্বভৌমত্ব প্রশ্নের বাইরে থাকা মানুষগুলোকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। পাশাপাশি খেয়াল করে দেখেছেন মার্কিন মুলুকের আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের। তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেন, যাদের ওপর গণহত্যা ও নিপীড়নের স্টিমরোলার চালিয়ে তাদের ভূখণ্ড দখলে নেওয়া হয়েছিল, তারা আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দাসদের থেকেও বেশি নিগৃহীত, উপেক্ষিত ও বঞ্চিত।

সংকট প্রশ্নে শুধুই কি ইউরোপের ইহুদি আর মুসলিম কিংবা রেড ইন্ডিয়ান আর আফ্রিকান-আমেরিকান কালো মানুষের কথা বললে হবে? খেয়াল করলে দেখা যায়, চীনের উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়, সম্প্রতি আরাকানের রোহিঙ্গা, কম্বোডিয়া এবং সোমালিয়ার কিছু আদিবাসী গোষ্ঠী—এরা কেউই এই উত্তর-উপনিবেশকালের সংকট থেকে মুক্ত নয়। এমনকি ভারতে সম্প্রতি এনআরসির মাধ্যমে সৃষ্ট সংকট আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুর, মেঘালয়, অরুণাচল ও নাগাল্যান্ডে যে জাতিগত সংকট তৈরি করেছে, তা এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।

মামদানির তত্ত্বায়ন থেকে বিশ্লেষণ করলে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে ইসরায়েলের সম্প্রসারণবাদ, কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের ঠান্ডা লড়াই, আরাকানের রোহিঙ্গা গণহত্যা, চীনের উইঘুরে মুসলিম নির্মূল অভিযান—এগুলো একই সুতায় গাঁথা। এখানেও শুরুতে নৃতাত্ত্বিক ও জাতিগত দিক থেকে স্বতন্ত্রদের আলাদাভাবে চিহ্নিত (Define and Rule) করা হয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে সুপরিকল্পিতভাবে তাদের নির্মূল করা হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার কথাই ধরা যাক। সাদা চামড়ার লোকের আধিপত্য বিস্তার করতে গিয়ে শহর থেকে সব কালো মানুষকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তারা শহর থেকে তাড়া খেয়ে অপেক্ষাকৃত গ্রাম এলাকা তথা বান্টুস্থানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ঠিক এভাবেই ব্রিটিশরা সুদানে আরব ও আফ্রিকান বলে দুটি আলাদা পরিচয় তৈরিতে মদদ দিয়ে তাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের রসদ তৈরি করে রেখেছিল। তাদের আলাদা জাতিসত্তা হিসেবে না দেখালে তো তা সম্ভব হতো না। একইভাবে ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলিম পরিচয় নির্মাণে ভূমিকা রেখেছিল ব্রিটিশ আদমশুমারি, শিক্ষাব্যবস্থা, ইতিহাসলিখন এবং ভিন্ন ভিন্ন নির্বাচনব্যবস্থা।

সম্প্রতি ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে জায়নবাদী বসতি স্থাপনকারী দখলদারেরা আদিবাসী ফিলিস্তিনিদের তাদের বসতিস্থল থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। আবার দখলদারির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত ইসরায়েল রাষ্ট্রে একজন ফিলিস্তিনির জন্য 'নাগরিক' হয়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব। অর্থাৎ ইসরায়েলি জাতি গঠন প্রকল্পে প্রথম ধাপে চলে নির্মূলকরণ ও শরণার্থীকরণ। পরের ধাপে চলতে থাকে স্থানীয়দের জমি দখলের মাধ্যমে তাদেরকে গাজা ও পশ্চিম তীর নামক বান্টুস্থানে আটকে ফেলা। যারা খোদ ইসরায়েলি রাষ্ট্রের ভেতর রয়ে গেল, তাদের জন্য বরাদ্দ সার্বভৌমত্বহীনতা। তারা কখনোই পূর্ণ নাগরিক অধিকার পাবে না। এভাবে সংখ্যালঘু ইহুদিদের ফিলিস্তিনি ভূমিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ওঠার যাত্রায় চলে সেই আদি জাতিরাষ্ট্র গঠনের নকশারই বাস্তবায়ন, যা দেখা গিয়েছিল

আন্দালুসিয়ায়, আমেরিকায়, জার্মানিতে।

মাহমুদ মামদানি মনে করেন, 'সব ধরনের রাজনৈতিক সংকট ও সংঘাতের মোকাবিলা রাজনৈতিকভাবেই করতে হবে, সংঘটিত অপরাধের লোকদেখানো বিচার কিংবা অপর্যাপ্ত আদালতের রায় এর কোনো সমাধান দিতে পারবে না।' বিশেষজ্ঞ হিসেবে মামদানি মনে করেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের সব কর্মের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি রাষ্ট্রকে দুর্বল করে দেয়। আর এই দুর্বল রাষ্ট্রে অপেক্ষাকৃত সবল ব্যক্তিরা দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য যমদূত হিসেবে আবির্ভূত হন। উপনিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম একটি জাতিরাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠাকালীন পর্ব থেকেই দুই ভাগে ভাগ করে দেয়। উপনিবেশের শিকল ছিঁড়ে বের হওয়া দেশগুলোর জনশক্তি দুভাবে সদা বিভক্ত থাকে। একটি দল তাদের স্বাধীনতার পক্ষে লড়াইকারী বলে দাবিদারদের বাইরে অন্যদের হঠকারী, ঠগ ও জোচ্চোর হিসেবে চিহ্নিত করে। অন্যদিকে পরোক্ষভাবে দুর্বল চিহ্নিত দলও ইনিয়ে-বিনিয়ে নানা কথা বলতে পারে। তবে বেলা শেষে সবাই কমবেশি দুটি রাজনৈতিক বর্গে ভাগ হয়ে পড়ে। এখানেও দেখা যেতে পারে যে একদল হয়ে পড়ছে রাজনৈতিকভাবে স্থায়ী সংখ্যালঘু।

ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের অন্তিম লগ্নে ভারতবর্ষের পরিণতি নিয়ে ভাবা যাক। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সঙ্গে পায়ে-পায়ে এগিয়ে যাওয়া দ্বিজাতিতত্ত্ব তথা হিন্দুর দেশ, মুসলমানের দেশ নিয়ে যত গল্প, তার শুরুটাও এখানে কি না, কে জানে? একইভাবে বঙ্গভঙ্গ-উত্তরকালের খায়-খতিয়ানে এপারে লেখা ইতিহাসে শুধুই মুসলমানদের উপকার কিংবা বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে ক্ষতি আর ওপারে হিন্দুদের সব হারানোর হাহাকার! এগুলো বুঝতে গেলে আশার আলো হয়ে উঠতে পারে মামদানির স্থানীয়তা ও বহিরাগত প্রশ্নের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। অভিবাসী এবং দখলদারত্বের প্রশ্নকে নানা দিক থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন মামদানি। এনআরআই তথা নন রেসিডেন্ট ভারতীয়দের অবস্থা তাঁর গবেষণায় গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি ছয় ভাগে বিভক্ত গ্রন্থের গোড়ার দিকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত ভারতীয়দের বর্তমান অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। উচ্চ বেতনে চাকরির শান্তির বিপরীতে জাতিগত পরিচয়ের জ্বালা কীভাবে মানুষকে পুড়িয়ে খাক করে যায়, তিনি সেটা ধারাবাহিক বর্ণনার মাধ্যমে তত্ত্বায়নের চেষ্টা করেছেন।

পশ্চিমের চোখে 'প্রফেসর অব টেরর' নামে পরিচিত এডওয়ার্ড সাঈদ জাতিগত বিদ্বেষ ও নির্মূলকরণ প্রকল্পের ভয়াবহতা প্রসঙ্গে উত্থাপন করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত তত্ত্ব 'ফিলিস্তিন প্রশ্ন'। আর মামদানি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন 'এমনি হাজারো রাষ্ট্র কীভাবে এক উপনিবেশ থেকে মুক্তিপ্রাপ্তির পর ধীরে ধীরে

আরেক জাতের দাসে পরিণত হচ্ছে'। জাতিবিদ্বেষ এবং জাতিগত সংকট তিনি তুলে ধরেছেন আমেরিকার নানা স্থানে গণতন্ত্রের টিকে থাকা এবং ভোটের রাজনীতির উপসংহার সামনে এনে। তিনি দেখিয়েছেন, ভোটের দিন উৎসব করে ভোট দিতে গেলেও স্থানীয় আদিবাসী আমেরিকানদের ব্যাপারে অভিবাসী সাদারা কতটা নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে।

সুনির্দিষ্ট আমেরিকান অঞ্চলে কারা বাস করবে, এটা নিয়েই গোলযোগ চলমান। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করতে গিয়ে নেটিভ আমেরিকানদের বর্তমানে উল্টো নানামুখী হেনস্তার শিকার হতে হয়। তাই আদিবাসী হলেই কেউ তার ভূখণ্ডে নিরাপদ কিংবা অধিপতিশীল হবে, তেমন চিন্তার সুযোগ নেই। মার্কিন মুলুকের সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে নেটিভ আমেরিকানদের থেকে বহিরাগত অনেকের দাপট বেশি। এমনকি আফ্রিকা থেকে দাস হিসেবে বাধ্যতামূলক অভিবাসী হওয়া মানুষের চেয়েও তাদের অবস্থা করুণ। আমেরিকার কালো মানুষদের তিনি দেখান জাতিবিদ্বেষের শিকার হিসেবে আর রেড ইন্ডিয়ানদের বলেন 'কলোনাইজড'। কারণ, সিংহভাগ সাদা চামড়ার বহিরাগতদের হাতে গড়ে ওঠা মার্কিন জাতিরাষ্ট্রের একপর্যায়ে কালো মানুষের দাসশ্রম শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় হলেও লাল জাতির মানুষেরা ছিল অনাহূত ও পরিত্যক্ত।

মার্কিন সংবিধানে উল্লিখিত 'ইন্ডিয়ান' শব্দটিও অনেক জটিলতার জন্ম দিয়েছে। একটি জাতিসত্তার প্রত্যেকটি মানুষ কোন অঞ্চল থেকে আগত, তা নিয়ে তীব্র বিতর্কের জন্ম দিচ্ছে এই প্রস্তাব। আদতে তারা আমেরিকার আদিবাসী কিন্তু তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে 'ইন্ডিয়ান' হিসেবে। অন্তত পরিচয়গত দিক থেকে ধরলে এটা বিরাট জটিলতা। তাই নাগরিক হিসেবে অনেক অঞ্চলে এই 'ইন্ডিয়ান' আমেরিকানদের নথিভুক্তকরণ পর্যন্ত ঘটেনি। ক্ষেত্রবিশেষে তাদের অবস্থান এ জন্যই আফ্রিকা থেকে আগত আফ্রিকান-আমেরিকান দাসবংশীয় মানুষের চেয়েও করুণ।

মামদানি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, হিটলারের সেই আর্যতত্ত্ব তথা জাতিভিত্তিক সর্বেসর্বা মতবাদ আমেরিকাতেও প্রবল। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সাদা বর্ণের মানুষেরা আমেরিকায় যে আধিপত্য বিস্তার করছে, খোদ হিটলারেরও সেটা পছন্দ। আর সে জন্যই তাঁর আত্মজীবনী *মেইন ক্যাম্প* তথা *মাই স্ট্রাগল* লিখতে গিয়ে হিটলার বর্ণবাদের আমেরিকান মডেলের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এমনকি জার্মান ভূখণ্ডে ইহুদিদের জাতিগত নির্মূলকরণ অনেকাংশে আমেরিকান মডেলেই চালানো হয়।

আমেরিকায় সাদা চামড়ার বহিরাগতদের হাতে জাতিরাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল বেশ আগে। তারপর আমেরিকান ইন্ডিয়ান মানুষেরা কোনো ভূখণ্ডে থিতু হতে পারেনি। আদিবাসী হিসেবে তাদের মর্যাদা প্রদান অনেক পরের প্রশ্ন, উল্টো তাদেরকে নানা রকম নিপীড়ন, বাধ্যতামূলক নির্বাসন ও বসতি স্থানান্তর, এমনকি বিভিন্ন সময়ে গণহত্যার শিকার হতে হয়েছে। ঠিক এভাবেই হিটলারের জার্মানিতে অত্যাচার করা হয়েছিল ইহুদিদের ওপরে। সম্প্রতি ইউক্রেনের দনবাসে সেই কাজ করছে খোদ ইউক্রেনের মদদপুষ্ট জাতীয়তাবাদী বাহিনী অ্যাজোভ। উল্টো দিকে ইউক্রেনীয়দের প্রাধান্য রয়েছে, এমন এলাকায় সেই কাজই করছে রাশিয়া।

অর্থনৈতিক নানা ক্ষেত্র থেকে শুরু করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে আধিপত্য, তার বিশ্লেষণ না করলে উপনিবেশের প্রভাব বোঝা কঠিন। এডওয়ার্ড সাঈদ তাঁর 'সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্য' শীর্ষক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এর নানা দিক তুলে ধরলেও উপনিবেশের রাজনৈতিক আধুনিকতার আলোচনায় মামদানি জরুরি। জাতিগত নির্মূলের হীন চিন্তার শিকড়টা অনেকটাই যে সাংস্কৃতিক বিপত্তি সৃষ্টির মধ্যে পোঁতা, এই দেখাটাই তাঁর অবদান।

উপনিবেশকালের মনোদৈহিক আধিপত্যবাদ আরও চূড়ান্ত ভয়াবহতা দেখাতে শুরু করেছে উগ্র জাতীয়তাবাদ বিকাশের পথে। উপনিবেশ প্রতিরোধ করতে গিয়ে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্থান, তার মাধ্যমে বিপন্ন ও বিলুপ্ত হয়েছে আরও অনেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র 'সামাজিক কাঠামোর অভ্যন্তরস্থ সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চ'।

৩.

এত সব সংকটের ইতিহাস আলোচনা করে মামদানি সমস্যার কারণ চিহ্নিত করেন জাতি ও রাষ্ট্রকে এক ভাবার ভেতরে। রাষ্ট্র হতে হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হয়ে উঠতে হবে, এই ইউরোপীয় রাজনৈতিক বিশ্বাসের দাম দিতে হয়েছে পাশাপাশি থাকা ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ের সমাজকে। উপনিবেশের সর্বনাশা শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে 'এক জাতি হয়ে ওঠা' জরুরি হয়ে উঠেছিল বিপ্লবীদের চোখে। এক হতে গিয়ে বলা হয়েছিল, তোমরা ভারতীয় হয়ে যাও, তোমরা পাকিস্তানি হয়ে যাও কিংবা তোমরা বাঙালি হয়ে যাও। ভারতের হিন্দুত্ব প্রকল্পও সেই আদি পাপেরই অনুকরণমাত্র। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইউটোপিয়ান একত্রীকরণ প্রশ্নে বাধ্যতামূলকভাবেই হারিয়ে যেতে হয়েছে

অপেক্ষাকৃত কম জনশক্তির প্রতিটি সত্তাকে। এই একত্রীকরণের জন্য বিপজ্জনক প্রতিপক্ষের ভয় দেখাতে হয়। এই কথিত 'বিপজ্জনক প্রতিপক্ষ'কে নির্মূল নাহয় বিতাড়ন ছাড়া জাতীয়তাবাদ স্বস্তি পায় না। জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও জাতিগত বিশুদ্ধতার মতো অলীক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক রাষ্ট্রের 'ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমারেখার মধ্যে' চলেছে এই 'ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জাতি বিনাশ ও নির্মূলকরণের ধ্বংসাত্মক প্রকল্প'।

চিহ্নিত নানা ঔপনিবেশিক সংকট থেকে উত্তরণে কিছু অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন মামদানি। অনেক ক্ষেত্রে মামদানির এই বর্ণনা ইউটোপিয়া মনে হতে পারে। মামদানি ঔপনিবেশিক দেশগুলোকে ক্ষমাপ্রার্থনা ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মাধ্যমে সংকট নিরসনের যে কল্পনা করেছেন, তা অসম্ভব বলেও প্রতীয়মান। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শাসন অবসানের সময় এর কাছাকাছিই করা হয়েছিল। সাবেক প্রভুরা ক্ষমা চেয়েছিল এবং নির্যাতক ও নির্যাতিতের পরিচয় সরিয়ে তারা উভয়েই নিজেদের সংজ্ঞায়িত করেছিল 'সারভাইবর' হিসেবে। দখলদার ও দখলি হিসেবে সাবেক যে রাজনৈতিক পরিচয়, তার জায়গায় এসেছে এই নতুন রাজনৈতিক পরিচয়।

তবে তাঁর প্রস্তাবটা আরও মৌলিক। ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক আধুনিকতার শুরুতে জাতি ও রাষ্ট্রের যে জোড়, তিনি তাকে বিজোড় করার মধ্যে সমাধান দেখেন। রাষ্ট্রের সার্বভৌম নাগরিক হতে গেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিভুক্ত হওয়ার যে বাধ্যবাধকতার অলিখিত বিধান, তাকে নাকচ করার এটাই নিদান। জাতি হয়ে উঠতে গেলে রাষ্ট্রের অনিবার্যতা কিংবা রাষ্ট্র হওয়ার দরকারে একটা জাতিগত সংখ্যাগরিষ্ঠতার যে জরুরত এবং তা থেকে তৈরি হওয়া 'চিরস্থায়ী সংখ্যালঘুত্ব' থেকে বের হয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ নাগরিক সমাজ গড়ে তোলার এই প্রস্তাব; ভেবে দেখা দরকার।

● **ড. মো. আদনান আরিফ সালিম** সহকারী অধ্যাপক (ইতিহাস), ওপেন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

লে খ ক প রি চি তি

ড. হেলাল মহিউদ্দীন

অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।

ল্যারি জে ডায়মন্ড

আমেরিকান রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানী ও সাবেক মার্কিন সরকারি কর্মকর্তা। তিন দশক ধরে আমেরিকার ন্যাশনাল এনডাউমেন্ট সংস্থা থেকে প্রকাশিত *জার্নাল অব ডেমোক্রেসির* প্রতিষ্ঠাতা সহসম্পাদক। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর, জাতিসংঘ প্রভৃতিতে কাজ করেছেন।

শুভ বসু

কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও ক্ল্যাসিক্যাল স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। তাঁর আসন্ন গ্রন্থ *ইমার্জেন্স অব ইনডিপেনডেন্ট বাংলাদেশ*।

ইফতেখারুল ইসলাম

'জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক ফাউন্ডেশন'-এর গবেষণা ও প্রশাসন বিভাগের নির্বাহী। আগ্রহের বিষয় ইতিহাস, দর্শন ও রাজনীতি।

মোহাম্মদ এজাজ

চেয়ারম্যান, রিভার অ্যান্ড ডেলটা রিসার্চ সেন্টার, নদীবিষয়ক পত্রিকা *অববাহিকার* সম্পাদক।

আইনুন নিশাত

পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক

সাজ্জাদ শরিফ

কবি, শিল্পতাত্ত্বিক ও *প্রথম আলোর* ব্যবস্থাপনা সম্পাদক।

সোহরাব হাসান

প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক এবং কবি ও প্রাবন্ধিক। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও রাজনীতি তাঁর আগ্রহের বিষয়।

ড. মো. আদনান আরিফ সালিম

সহকারী অধ্যাপক (ইতিহাস), ওপেন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

অনুবাদক

ড. হাসান আল জায়েদ ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের ইংরেজি সাহিত্যের সহযোগী অধ্যাপক। **রায়হান রহমান** ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (বুয়েট)। **প্রতীক বর্ধন** সাংবাদিক। **ধ্রুব সাদিক** সাংবাদিক ও গদ্যকার।

সরকারি কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা সমাধানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগান্তকারী উদ্যোগ

সরকারি কর্মচারীদের গৃহনির্মাণ ঋণ

ব্যাংক রেটের সমহার

৪% সুদে আবাসন ঋণের সুবিধা

www.rupalibank.org

সরকারি কর্মচারীদের বহুল প্রত্যাশিত আবাসন ঋণ এখন আপনার সুবিধামত রূপালী ব্যাংকের যে কোন শাখা হতে গ্রহণ করতে পারেন।

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ সিলিং

ক্র.নং	বেতন গ্রেড / স্কেল	ঢাকা মহানগরী/ সকল সিটি কর্পোঃ/ বিভাগীয় সদর	জেলা সদর	অন্যান্য এলাকা
০১	৫ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব (৪৩,০০০/- ও তদূর্ধ্ব)	৭৫ লক্ষ	৬০ লক্ষ	৫০ লক্ষ
০২	৯ম গ্রেড হতে ৬ষ্ঠ গ্রেড (২২,০০০/- হতে ৩৫,৫০০/-)	৬৫ লক্ষ	৫৫ লক্ষ	৪৫ লক্ষ
০৩	১৩তম গ্রেড হতে ১০ম গ্রেড (১১,০০০/- হতে ১৬,০০০/-)	৫৫ লক্ষ	৪০ লক্ষ	৩০ লক্ষ
০৪	১৭তম গ্রেড হতে ১৪তম গ্রেড (৯,০০০/- হতে ১০,২০০/-)	৪০ লক্ষ	৩০ লক্ষ	২৫ লক্ষ
০৫	২০তম গ্রেড হতে ১৮তম গ্রেড (৮,২৫০/- হতে ৮,৮০০/-)	৩৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ	২০ লক্ষ

*ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের জন্য ডেট ইকুইটি রেশিও হবে ৯০ঃ১০

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

উত্তম সেবার নিশ্চয়তা

www.rupalibank.org

www.fsiblbd.com
সবার জন্যে সবসময়
করোনাকালীন সময়ে
হিসাব খুলুন ফ্রিডমে
ব্যাংকিং করুন ক্লাউডে
ঘরে বসেই উপভোগ করুন সকল প্রকার
ব্যাংকিং সেবা
DESCO
DPDC
ওয়াসা
টেলিটক
রবি
নগদ
FSIB ISLAMI BANK CLOUD
FREEDOM
স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন, ডিজিটাল ব্যাংকিং-এ আস্থা রাখুন, করোনা ঝুঁকিমুক্ত থাকুন।
Downlord FSIBL Cloud
ANDROID APP ON Google play
Download on the App Store
Call Center 16257 24/7
FSIB ISLAMI BANK
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ
فارست سيكيوريتى اسلامى بنك ليميتد FIRST SECURITY ISLAMI BANK LTD.

সরকারি কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা সমাধানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগান্তকারী উদ্যোগ

সরকারি কর্মচারীদের গৃহনির্মাণ ঋণ

ব্যাংক রেটের সমহার

৪% সুদে আবাসন ঋণের সুবিধা

www.rupalibank.org

সরকারি কর্মচারীদের বহুল প্রত্যাশিত আবাসন ঋণ এখন আপনার সুবিধামত রূপালী ব্যাংকের যে কোন শাখা হতে গ্রহণ করতে পারেন।

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ সিলিং

ক্র.নং	বেতন গ্রেড / স্কেল	ঢাকা মহানগরী/ সকল সিটি কর্পোঃ/ বিভাগীয় সদর	জেলা সদর	অন্যান্য এলাকা
০১	৫ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব (৪৩,০০০/- ও তদূর্ধ্ব)	৭৫ লক্ষ	৬০ লক্ষ	৫০ লক্ষ
০২	৯ম গ্রেড হতে ৬ষ্ঠ গ্রেড (২২,০০০/- হতে ৩৫,৫০০/-)	৬৫ লক্ষ	৫৫ লক্ষ	৪৫ লক্ষ
০৩	১৩তম গ্রেড হতে ১০ম গ্রেড (১১,০০০/- হতে ১৬,০০০/-)	৫৫ লক্ষ	৪০ লক্ষ	৩০ লক্ষ
০৪	১৭তম গ্রেড হতে ১৪তম গ্রেড (৯,০০০/- হতে ১০,২০০/-)	৪০ লক্ষ	৩০ লক্ষ	২৫ লক্ষ
০৫	২০তম গ্রেড হতে ১৮তম গ্রেড (৮,২৫০/- হতে ৮,৮০০/-)	৩৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ	২০ লক্ষ

*ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের জন্য ডেট ইকুইটি রেশিও হবে ৯০ঃ১০

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

উত্তম সেবার নিশ্চয়তা

www.rupalibank.org

YAMAHA
Revs Your Heart

ACI Motors

ALL-ROUNDER IN 125CC

MILEAGE. POWER. STYLE

SALUTO
125CC

MILEAGE
78
KM/L
* On Standard Test Condition

AVAILABLE IN
ARMADA BLUE | MATT GREEN

Features

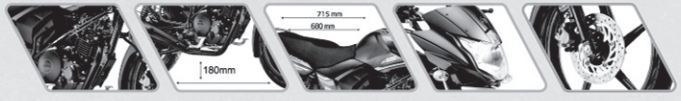

125cc Blue Core Engine | High Ground Clearance | Wide & Comfortable Seat | Stylish Front Parking Light | 245mm Disc Brake

HOT LINE 16533

BLUE CORE FUN & ECO

/yamahabd

সরকারি কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা সমাধানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগান্তকারী উদ্যোগ

সরকারি কর্মচারীদের গৃহনির্মাণ ঋণ

ব্যাংক রেটের সমহার

৪% সুদে আবাসন ঋণের সুবিধা

www.rupalibank.org

সরকারি কর্মচারীদের বহুল প্রত্যাশিত আবাসন ঋণ এখন আপনার সুবিধামত রূপালী ব্যাংকের যে কোন শাখা হতে গ্রহণ করতে পারেন।

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ সিলিং

ক্র.নং	বেতন গ্রেড / স্কেল	ঢাকা মহানগরী/ সকল সিটি কর্পোঃ/ বিভাগীয় সদর	জেলা সদর	অন্যান্য এলাকা
০১	৫ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব (৪৩,০০০/- ও তদূর্ধ্ব)	৭৫ লক্ষ	৬০ লক্ষ	৫০ লক্ষ
০২	৯ম গ্রেড হতে ৬ষ্ঠ গ্রেড (২২,০০০/- হতে ৩৫,৫০০/-)	৬৫ লক্ষ	৫৫ লক্ষ	৪৫ লক্ষ
০৩	১৩তম গ্রেড হতে ১০ম গ্রেড (১১,০০০/- হতে ১৬,০০০/-)	৫৫ লক্ষ	৪০ লক্ষ	৩০ লক্ষ
০৪	১৭তম গ্রেড হতে ১৪তম গ্রেড (৯,০০০/- হতে ১০,২০০/-)	৪০ লক্ষ	৩০ লক্ষ	২৫ লক্ষ
০৫	২০তম গ্রেড হতে ১৮তম গ্রেড (৮,২৫০/- হতে ৮,৮০০/-)	৩৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ	২০ লক্ষ

*ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের জন্য ডেট ইকুইটি রেশিও হবে ৯০ঃ১০

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

উত্তম সেবার নিশ্চয়তা

www.rupalibank.org

YAMAHA
Revs Your Heart

ACI Motors

ALL-ROUNDER IN 125CC

MILEAGE. POWER. STYLE

SALUTO
125CC

MILEAGE
78
KM/L
* On Standard Test Condition

AVAILABLE IN
ARMADA BLUE | MATT GREEN

Features

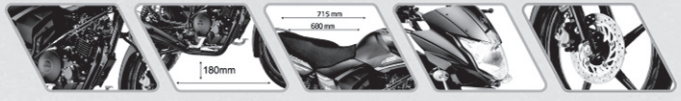

125cc Blue Core Engine | High Ground Clearance | Wide & Comfortable Seat | Stylish Front Parking Light | 245mm Disc Brake

HOT LINE 16533

BLUE CORE FUN & ECO

/yamahabd

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে প্রতিচিন্তার গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। এ ছাড়া বিকাশের মাধ্যমেও গ্রাহক হওয়া যাবে (বিকাশ নম্বর : ০১৯৫৫৫৫২০৬৯)। ডাকযোগে নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যাবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ৪০০ (চার শ) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের বেলায় যথাক্রমে ৮০০ (আট শ) টাকা ও ৬৫ (পঁয়ষট্টি) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি রসিদ দেওয়া হবে।

সরাসরি পাওয়া যাবে প্রথমা প্রকাশনের সব বিক্রয়কেন্দ্রসহ প্রচলিত বইয়ের দোকানে। এ ছাড়া অনলাইনে কেনা যাবে www.Prothoma.com থেকে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬